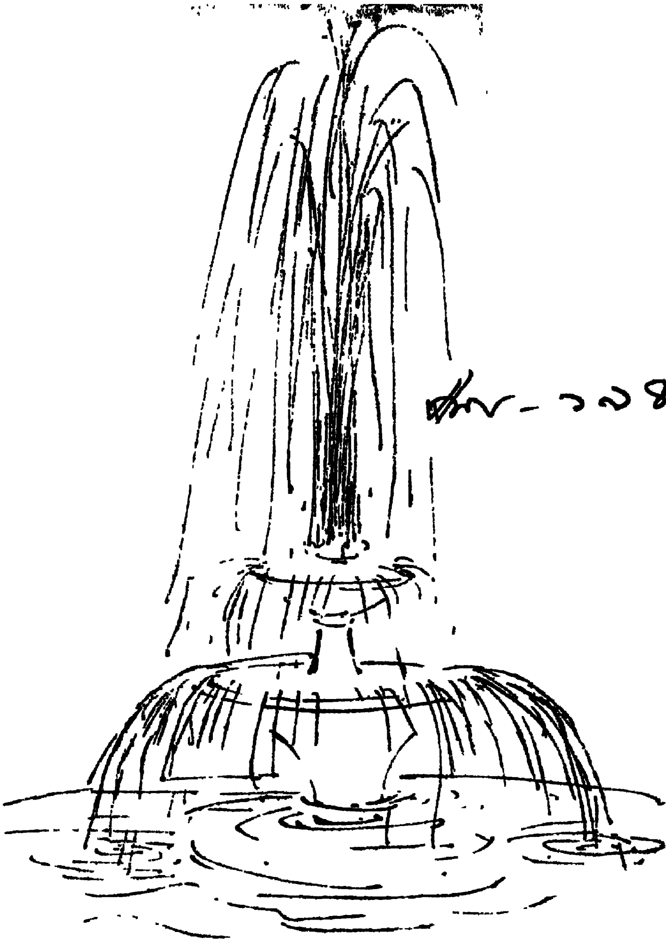
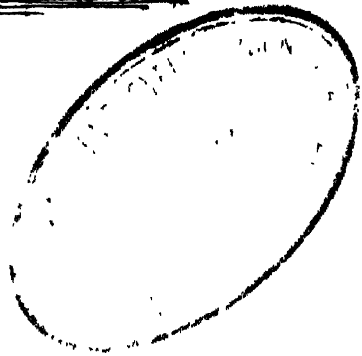
মৃগনয়নী + বনবিহারী



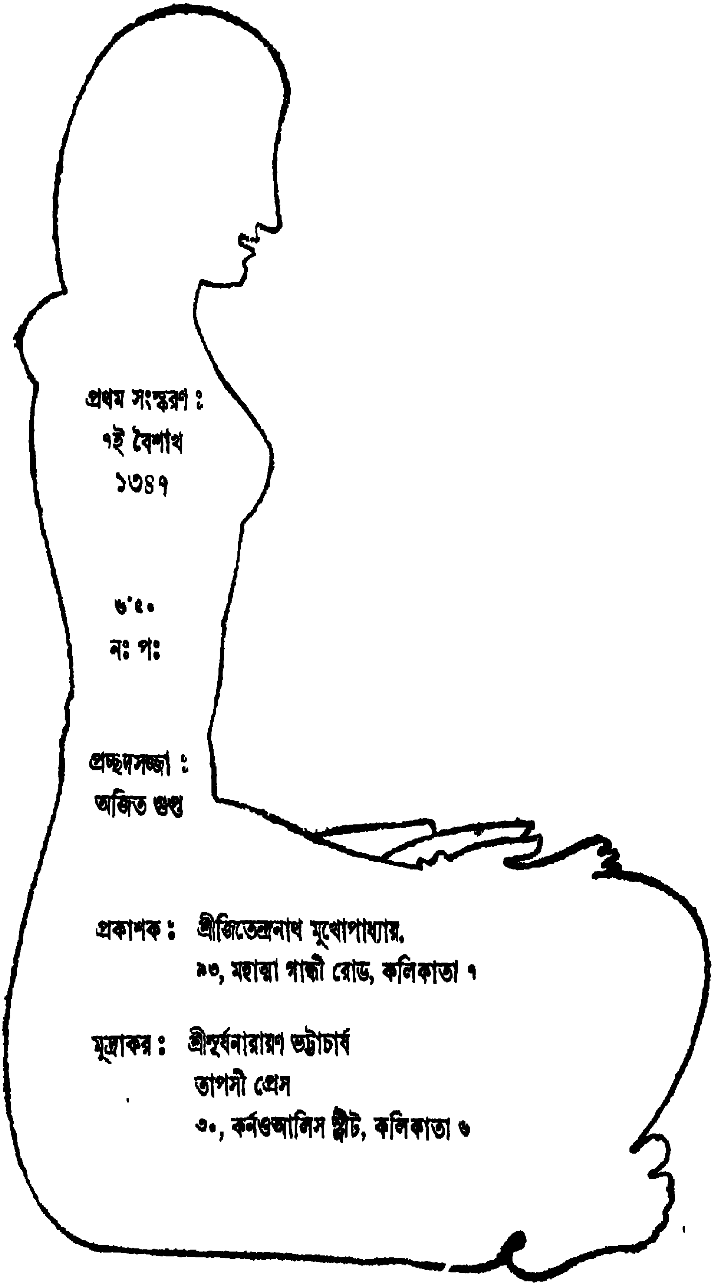
এক ছিল কন্যা

এক ছিল কন্যা



স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৭



প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই বৈশাখ
১৩৪৭

৬'৫০
নঃ পঃ

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

এক

পড়ছিলাম সেদিন সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী। শাহাজাদা সেলিমের খামখেয়ালের কথা ছাড়া আর বেশী কিছু নেই। আছে সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্যের অসামান্য ঐশ্বর্যের আর যুদ্ধের কথা। এক জায়গায় এসে থেমে গেলাম। চুপ করে বসে ভাবছিলাম।

একবার সম্রাট জাহাঙ্গীর এক ফকিরের কাছে গিয়েছিলেন। সেই ফকিরের আশ্চর্য শক্তিতে আকাশ থেকে মোহরের বৃষ্টি হোত। জাহাঙ্গীর তাঁকে সম্মান করে হাজার সেলাম জানিয়ে চলে এলেন। শুনলেন এক অর্বাচীন যুবক ফকিরের ওপর তাঁর ভক্তি দেখে ঠাট্টা করেছে। জ্বলে উঠলেন জাহাঙ্গীর। হুকুম দিলেন, যে মুখে সে ফকিরের নিন্দা করেছে, সম্রাটের নিন্দা করেছে, সেই মুখের চামড়া ছাড়িয়ে তাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে শহরে ঘুরিয়ে আনা হোক।

স্তব্ধ হয়ে গেলাম। চুপ করে বসে ভাবছিলাম পড়তে পড়তে। এই সাহসী সত্যবাদী যুবকটির কাহিনী আজ আর জানবার উপায় নেই। সেদিনের কোনো সাহিত্যিক কেন এই যুবকটির কথা ভাবেনি, তার কাহিনী লিখে যায় নি? বোধ হয় উপায় ছিল না। সাহিত্যিক আর কবিদেরও জাহাঁপনার গুণগান করতে হোত।

সাধারণ মানুষের কাহিনী বড়ই তুচ্ছ, বড়ই একঘেয়ে। জাঁকজমকে জমকালো হয় না। পড়তে লিখতে স্নায়ুতে উত্তেজনার শিহরণ আনে না। কি হবে ওদের কথা লিখে।

ভাবছি লিখব কি না। এক অতি সাধারণ মেয়ে মৃগনয়নীর কাহিনী লিখব কিনা ভাবছি বসে বসে।

এমন করুণ এত মধুর এমন বিষাক্ত এত অমৃত ভাবাবেশের কাহিনী শোনাতে ভাল লাগতেও পারে কারো কারো। তাছাড়া মৃগনয়নীর কথাটাও বারে বারেই মনের তলায় শুনছি, ও বলেছিলো—তুমি তো লেখো? আমার কথা একটু লিখো।

চুপ করে থাকতাম। ওর করুণ চোখ দুটো দেখে বলতাম,—হবে হবে।

ভাবি বসে বসে কিই বা লিখব।

ও যদি রাণী বা শাহাজাদী হোত, জমত।

ডাইনী শাকচুন্নী হলেও ভূতুড়ে কিছু একটা করে পাঠকের চোখ বিস্ফারিত করে দেয়া যেত। কিন্তু নেহাতই সাধারণ এক মেয়ে।

বলতে গেলে বলতে হয়—এক যে ছিল কন্যা, নাম তার মৃগনয়নী।

এক স্বনামধন্য জমিদার বংশের ভালো মানুষ রামতারণ ওর বাবা। দু-ভাই দু-বোন। জ্যাঠামশাই, যাকে ওরা বলত কর্তাবাবা, তিনিই জমিদারী দেখতেন।

বিশাল জমিদারীতে বিরাট পরিবারের এক ঘরের কোণে মানুষ হয়ে উঠেছিলো মৃগনয়নী। খুব ছোট বয়সের কথা ওর আবছা আবছা মনে আছে।

মানে ছ সাতমাসের কথা।

ঠিক মনে থাকা নয়। অস্পষ্ট আলোর ছবি ভাসে মনের ওপর।

বেশ মনে পড়ে তখন কোনো আলো দেখলেই মনটা ভরে উঠত কৌতুকে।

ছোট ছোট নরম হাত পা ছুঁড়ে খেলতো প্রদীপের পলতের আলোর দিকে তাকিয়ে।

আলোটা নিভু নিভু হয়ে এলে পাশে বসে উসকে দিত তরঙ্গিণী।

তরঙ্গিণী ওর দিদি। বছর পাচেক বয়েস তখন।

কখনো কখনো তরঙ্গিণী ওর ফুলো ফুলো গাল দুটো টিপে দিত সজোরে।

তবুও কি কাঁদত না মৃগনয়নী?

মা বলতো, মেয়েটা যেন এক রাশ ভিজে তুলো।

যেমন নরম তেমনি নীরব।

মুখের ভেতর চোখদুটো বড্ড বেশী ডাগর। আর চাউনিটা ট্যালা-ট্যালা।

হাবা-টাবা হবে নাকি?

কে জানে! মাঝে মাঝে পিসি খুড়ীদের মুখে শোনা যেত।

মেয়ে বলতে তরঙ্গিণী। যেমন চটপটে, তেমনি চতুর। কথায় কাজে পাখোয়াজ।

দুধে ধোয়া গায়ের রঙ। কাঁচপোকার টিপ। ছোট একখানি লাল টুকটুকে শাড়ী পরে ঠোটে আলতা মেখে ঘুরে বেড়াত।

মা ঘাটে যাবার আগে হয়তো বলে গেল—মেয়েটাকে দেখিস।

তরঙ্গিণী কিছুক্ষণ হয়তো তালি দিত, ছোট রাঙা শাড়ীর আঁচলটা গুঁজে দিত মুখে। রাঙা শাড়ীর আঁচল নিয়ে খেলা করতো মৃগনয়নী।

তরঙ্গিণী উলটো দুপাক ঘুরে কাপড়ের পাক খুলে সটান চলে যেত ছোটতরফের

পাচিলের পাশে কামরাঙা গাছের তলায়। এসে দেখে ততক্ষণে পুঁটি আর সরমা এসে জুটেছে। পুঁটির গালে একটা চিমটি কাটে তরঙ্গিণী।

রোগা নিরীহ পুঁটি চোখ পিটপিট করে ওর হাতে দুটো কামরাঙা দেয়—নে খা। বড্ড কাঁচা ভাই।

পুঁটি মেজ জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে।

তরঙ্গিণী কামরাঙা দুটো একবার কামড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

মুখটা বেঁকিয়ে বলে, দূর দূর কাঁচা!

তারপর পুঁটিকে ডাকে—চ' বেতুল খাবি।

বেতুল মানে বেতফল। বেতের কাঁটা ঝোপে ঢুকে ছোট ছোট ফলগুলো তুলতে হবে পুঁটিকেই। ঝোপের বাইরে থেকে ধমকাবে তরঙ্গিণী।

মৃগনয়নী একা একা শুয়ে থাকে। বড় বড় চোখে আলোর ঝলক নেচে ওঠে। সকালের নরম সূর্যের আলো। সবাঙ্গে আলো মেখে পড়ে থাকে আর অকারণেই হাসে।

অবুঝ আনন্দে মন ভরা। বোঝবার বোঝাবার মন তার নয়। শুধু খুশী। শুধু শুধু।

জীবনের এমন সময়টা চিরদিন কেন থাকে না।

বিশেষ কিছু মনে নেই, মনে আছে শুধু মায়ের পরম আরামের গরমটুকু। আর তাকিয়ে তাকিয়ে আলোর সন্ধান।

কাঁদতে জানত না মৃগনয়নী।

জীবনের ভোরেও নয়, ম্লান সন্ধ্যায়ও নয়।

তবু যদি বা এক আধ সময় একটু কাঁদবার চেষ্টা করে কোঁকাত। ওকে কোলে তুলে নিত একজন। সে হৃদয়দা।

হৃদয় বারিক।

হৃদয় বারিকের ইতিকথা পরে শুনেছিল মৃগনয়নী। বিস্ময়ে ভয়ে বড় বড় চোখ দুটো ওর বিস্ফারিত হয়েছিল আরও।

মধুগঞ্জের রাজার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের একটা চর নিয়ে দাঙ্গা হয়।

মৃগনয়নীর জ্যাঠামশাই কর্তাবাবু ছিলেন বজরায়। মাঝ নদীতে নোঙর করেছিলেন।

খান পাঁচেক ছিপ নৌকো। কালো সাপের মত সরু লম্বা। বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চরে গিয়ে ঠেকল।

রামদা আর বর্শা নিয়ে নেমে পড়ল ময়রাবাড়ীর কুখ্যাত ডাকাত প্রজার দল। প্রায় তিরিশ জন।

চরের ওপর থেকে কাশবনের পেছন থেকে বিকট আওয়াজ এলো মধুগঞ্জের দাঙ্গাবাজদের। এরাও প্রত্যুত্তর দিল।

তিনটে বর্শা চোখের পলকে এসে বিঁধল। একটা মানুষের বুকে আর দুটো বালির ঢিপির ওপর।

দাঙ্গা হোল।

ওদের জখম হোল তিনটে। মরল গোটা ছয়েক।

মরা মানুষ কটিকে ভাসিয়ে দেওয়া হল ব্রহ্মপুত্রের জলে।

জখম তিনটেকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে এলো কর্তাবাবুর বজরায়।

—তিনটে জখম হুজুর।

জখম ছেড়ে দিলে মোকদ্দমায় জেতা যাবে না। নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। কোন মামলা যাতে না হয়।

হুকুম দিলেন কর্তাবাবু—টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দাও।

রামদা হাতে জন আষ্টেক কুঁচো কুঁচো কেটে ভাসিয়ে দিল দুটোকে।

আর একটা। অল্প বয়েস। বছর ষোল। বড় বুকের ছাতি, জোয়ান।

হাতের আঙ্গুলগুলো কেটে ফেলা হোল।

রামদায়ের কোপে নদীতে ছিটকে পড়ল পায়ের আঙ্গুল দশটা।

ছেলেটা আর্তনাদ করে কাঁদতে লাগল—রাজাবাবুর কাছে যাব। রাজাবাবু।

কি খেয়াল হোল কর্তাবাবু হাত পায়ের আঙুলকাটা ছোঁড়াটার কাছে এগিয়ে এলেন।

—আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। আমাকে মারবেন না রাজাবাবু।

কর্তাবাবু তাকালেন ছেলেটার দিকে। রক্তাক্ত হাত পা।

এখুনি রামদায়ের আর একটা কোপে দুখানা হয়ে যাবে ছেলেটা।

বললেন,—ছেড়ে দে ওকে।

ছেলেটা চলে এলো কর্তাবাবুর সঙ্গে তাঁর গোলাম হয়ে।

আজও সে গোলাম হয়ে আছে।

হাত পায়ের কুড়িটা আঙ্গুল নেই।

হৃদয় বারিক।

হৃদয় বারিক তার কথা রেখেছে। কর্তাবাবুর হুকুম তার কাছে স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী। যা বলেন তাই।

কর্তাবাবুও ভালবেসেছেন ওকে। ধীরে ধীরে। ছেলেটা বড় ভাল। হৃদয় আছে হৃদয়ের।

মৃগনয়নীকে বড় ভালবাসত হৃদয়দা।

একটু কাঁদবার চেষ্টা করতে না করতে আঙ্গুলবিহীন হাতদুটো বাড়িয়ে কোলে নিত ওকে।

নিজের থাকবার ছোট ঘরটিতে নিয়ে আসত। ঘুম পাড়াত।

নিজের বিছানার ওপর ওকে শুইয়ে রেখে খুশী খুশী মনে কাগজের মোড়ক থেকে বের করত গাঁজা। ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালি আর সরু কলকে। হৃদয় গাঁজা খেত, আর খেত লঙ্কা। এক থালা ভাত সঙ্গে গোটা ছয়েক লঙ্কা পোড়া।

লঙ্কাপোড়া না পেলে মেজাজটা ওর বিগড়োত মাঝে মাঝে।

—কি যে করো ঠাকরুন! লঙ্কা না পেলে গায়ের ব্যথা মরবে কিসে শুনি।

রাঁধুনীকে দিত দুটো ধমক।

সঙ্গে সঙ্গে কর্তামা নিজে ওর পাতে ছুঁড়ে দিতেন গোটাকতক লঙ্কা।

হৃদয় ঠাণ্ডা। একেবারে জল।

খেয়ে দেয়ে নিজের ঘরটিতে গিয়ে একটু জিরোত হৃদয়। বেলা গড়িয়ে না এলে ওকে ওঠাবার উপায় নেই।

বিকেলে হয়ত বললেন—ওরে, কাঠ কিন্তু মোটে নেই। মালী আসেনি আজ।

আঙ্গুল কাটা হাতে কুড়ুলটা বাগিয়ে ধরতো হৃদয়। বৃথা কথা না বলে একখানা মোটা ডাল চেলা করে দিত ঘণ্টা দেড়েকে। বুক পিঠ ভিজে যেত ঘামে।

কর্তামা ভারি খুশী, হৃদয় না হলে কি চলে?

রাত সাড়ে দশটায় এলেন কর্তামার ভাইয়ের ছেলে। মাছ আছে দু'রকম। আরও মাছ চাই।

হৃদয় কই। হৃদয়কে ডাকো।

হাতের তালুর ভেতর ছিপটা বাগিয়ে ধরে হৃদয় বিনাবাক্যব্যয়ে চলল বড় দীঘির ধারে।

দশটা সওয়া দশটার ভেতর বড একটা চিতল নিয়ে এলো বেতের খোলায় ঝুলিয়ে। কর্তামা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন।

—নে, বাবা দুটো মুড়ি নে। চিবো। রান্না হোক।

হৃদয় মুড়ি নেবার প্রস্তাবটা নির্বাক দৃষ্টিতে অগ্রাহ্য করে চলে যায় নিজের ঘরে। ধুন্! এই খাটুনীর পর মুড়ি! হুঁ!

ছোট কলকে নামায় আর কাগজের মোড়ক থেকে খাঁটি জিনিসটুকু। একটি দমে বুঁদ হয়ে যেতে হবে।

কর্তাবাবুর ডাক আবার রাত বারোটায়।

হৃদয়কে খবর দিতে যেতে হবে রাধারাণীর ঘরে। আনতে হবে তাকে কর্তাবাবুর আয়না মহলে।

এ কাজ হৃদয় ছাডা আর কে পারবে? কাকেই বা বিশ্বাস করা যায়?

হৃদয় ওঠে। লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে এগোয়।

আজ কর্তাবাবু ভররাত থাকবেন আয়না মহলে।

আয়না মহল। মস্ত বড একটি হলঘর। দেয়ালে আস্তরের বদলে আয়না। ওপরে পাঁচটি ঝাড লণ্ঠন। মাঝেরটি পঞ্চাশ বাতির। নীচে গালিচা। কাশ্মীরী নকশা তাতে। তাকিয়া অনেকগুলো।

খানসামা নিযুক্ত দুটি। বিখ্যাত খেম্‌টা বা বাঈ এলে ছ'টি খানসামাকেও ব্যস্ত থাকতে হয়। এমনিতে দুটি। রাধারাণী এলে কেউ নয়। শুধু হৃদয়। কত খেম্‌টা বাঈজী তো এসেছে। রাধারাণীর মত আর কাউকে চোখে ধরে না। কর্তাবাবুরও নয়। হৃদয়েরও নয়।

অমন ভাসাভাসা ভীরু নয়নপল্লব দেখাই যায় না। আর গায়ের রঙ সাদা নয়, টুকটুকে রাঙা নয়, মাজা-মাজা, যেন একাদশীর চাঁদের আলোর মত। রাধারাণী কোথা থেকে এসেছিলো কর্তাবাবু ছাডা কেউ জানেন না।

সেবারে স্বয়ং মহলে গেলেন আদায়ে। নিয়ে এলেন নৌকো ভরে টাকা আর গিনিমোহর আর বজরার কুঠি আলো করে এক নবীনা রূপসীকে।

বজরাতেই প্রথম কদিন থাকতে হয়েছিলো রাধারাণীকে। তারপর কর্তাবাবুর হুকুমে তার নতুন বাড়ী হোল স্যাঁকরা বাড়ীর পাশে।

সেই থেকেই রাধারাণীর বসবাস।

বেশীদিন নয়, বছর ছয়েক।

আজও রাধারাণী এলো নিজের পালকিতে। সঙ্গে এলো হৃদয়।

হৃদয় এসে খানসামাদের ঘরে গিয়ে দেখে আয়না মহলের একটি খানসামা ঝিমোচ্ছে। আঙুল কাটা হাতে একটা থাপ্পড় বসায় পিঠে।

ওর হাতের থাপ্পড় খেয়ে চমকে ওঠে খানসামাটি—ওরে বাপরে! জ্বালা করছে পিঠটা। তাও তো আঙুল নেই!

—যা শালা আয়নামহলে। কর্তাবাবু আছেন।

চোখ দুটো রগড়ে খানসামা ওঠে। সমস্ত রাত জাগতে হবে আজ।

এ সব কথা কিছু কিছু হৃদয়দার কাছেই শুনেছিল মৃগনয়নী। শৈশবটা অত বড় জমিদার বাড়ীতে অবহেলায় কেটে যায়। মা হাতে হাতে কাজ করত কর্তামার সঙ্গে। কিন্তু মেয়ে দেখবার অবসর বেশী পেত না। এর ওর কাছে বেশীর ভাগ হৃদয়দার কোলে পিঠেই মানুষ হতে হয়েছে মৃগনয়নীকে।

তরঙ্গিণীকে মানুষ করেছিল ঝি বিজয়া।

পুঁটিকেও তাই।

সরমা সনকা মালিনীর কাছে মানুষ।

ওদের বাড়ীর এই-ই নিয়ম।

একটু বড় হবার পর মৃগনয়নী মাঝে মাঝে যেত বাবার কাছে। বাবা নিজে কখনও এসে নিতেন না ওকে। কোলে ত নয়ই।

সাড়ে চার বছর যখন বয়েস ওর তখন ও প্রথম বাবার কাছে যেত মধ্যে মধ্যে বাইরের কাছারী ঘরের পাশে একটা ছোট ঘরে।

সকাল থেকে রাত বারোটা একটা পর্যন্ত কর্তাদের কাছারী ঘরে বা বাইরের মহলেই দেখা যেত। ভেতরে আসত শুধু খাবার সময়। খাবার সময় সামনে বসতেন শুধু কর্তামা। আর কোন বউয়ের বা ছেলেপিলেদের আসবার হুকুম ছিল না। খেতে বসতেন ওঁরা তিন ভাই। মৃগনয়নীর বাবার ঠাঁই হোত আলাদা।

কর্তাবাবু আর মেজকর্তার পাতে রোজই দেখা যেত অন্তত দু-একটা করে বড় মাছের মুড়ো আর চার পাঁচরকম মাছ। কোনদিন বা তার ওপর মাংস, তার পরে আবার খুব ঘন ক্ষীর পুরো একবাটি। সঙ্গে আম কাঁঠাল হোল ভালই, নইলে খুব পুষ্ট দেখে গোটা চারেক করে মর্তমান কলা। এটা ওঁদের দৈনিক আহার।

রামতারণের ঠাঁই আলাদা। ওঁর আসত পাথরের থালায় আতপ চালের ভাত।

কিছু সেদ্ধ, ভাজা, তরকারী একটা আর ছোট একটা বাটিতে খানিকটা ক্ষীর, গোটা ছয়েক কলা। এই তাঁর নিত্য আহার।

কর্তাবাবু হাসতেন, মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলতেন—নিরামিষ ঘাস সবজী খেয়ে রামের বুদ্ধিটাও পাঁঠার মত হচ্ছে।

রামতারণ হাসত দাদার কথায়। জবাব দিত না।

একদিন মনে আছে মৃগনয়নীর। ও বাবার কাছে গেছে। গিয়ে দেখে একটি লোক একটি শতছিন্ন কাপড় পরে বাবার কাছে একখানা কাপড় চাইছে। রামতারণ জপ করছিলেন। মুখখানা একটু শুকিয়ে গেল। ভেতর থেকে নতুন কাপড় রামতারণ চাইলে কর্তামা দেবেন না। রামতারণকে নতুন কাপড় দিতে কর্তাবাবুর বারণ—ওকে কিছু দিও না। হাতে জিনিস পেলে লোককে দিয়ে দেবে।

রামতারণ বড় বিপদে পড়ে গেল।

বিছানার চাদর ছিল একটি পাশের চৌকার ওপর। চাদরখানা টেনে নিয়ে পরে নিজের কাপড়খানা খুলে দিয়ে দিলেন লোকটিকে, বললেন—পালা, কেউ যেন না দেখতে পায়।

লোকটা পালিয়ে গেল।

রামতারণ প্রসন্ন মনে জপে বসলেন আবার।

খেতে যাবার সময় বিছানার চাদর পরা দেখলে কর্তামা বাধ্য হয়ে কাপড় একখানা বার করে দেবেন।

সমস্ত জীবনেও ঘটনাটি মৃগনয়নী ভুলতে পারেনি।

অনেক সময়ই দেখা যেত গরীব অত্যাচারিত প্রজারা আর কোনও কূল না পেয়ে রামতারণের পায়ের ওপর এসে পড়ত।—বাঁচান বাবু।

রামতারণ অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতেন—কি হোল আবার। আঃ! পা ছাড—

—পাঁচ সনের খাজনা বাকী। কাল আমায় বেঁধে নিয়ে আসবে আবেদ আলী।

রামতারণ বলেন—তা আমি কি করব?

—আপনি বাঁচান।

—না হয় বলে দেবো আবেদ আলীকে। যা—

—বললে কি হবে বাবু, রাজাবাবুর হুকুম।

রামতারণ বোঝে দাদার হুকুম। বললে—কত টাকা ?

—সাত টাকা করে পাঁচ সনের।

রামতারণ জপ করতে থাকে। চোখ দুটো ওর করুণায় ভরে ওঠে। বলে, আচ্ছা যা কাল আসিস।

সেদিন খেতে বসে রামতারণ বলেন দাদাকে—গোটা চল্লিশ টাকার দরকার।

কর্তাবাবু মাছের মুড়োটা ভাঙতে ভাঙতে হাসেন,—তোর আবার টাকার কি দরকার ?

সত্যি কথাই। এজমালি জমিদারীতে যে যা চাইছে সে তাই পাচ্ছে। চালাচ্ছেন কর্তাবাবু, দাদার ওপর ভার দিয়ে রামতারণ নিশ্চিন্ত।

তবু বলে রামতারণ—টাকাটা বড্ড দরকার।

কর্তাবাবু বোঝেন।—কেউ এসে চেয়েছে বুঝি ? নাঃ তোকে নিয়ে আমার জ্বালা হয়েছে।

আর কিছু বলেন না।

কাছারীতে গিয়ে বিকেলে নায়েবকে হুকুম দেন রামতারণকে টাকাটা দিয়ে দিতে। আরও বলেন—দেখবে রামের কাছে যেন কোন প্রজা না যেতে পারে, ওর ঘরের কিছু তফাতে একটা বরকন্দাজ বসিয়ে রাখো।

নায়েব কর্তাবাবুর কথামতই কাজ করে।

ছোটবেলা মৃগনয়নী তাই বুঝেছিল, কিছু চাইতে হলে বাবার কাছে চাওয়া চলবে না। চাইতে হবে কর্তাবাবুর কাছে। শুধু মৃগনয়নী নয়, সবাই একথা মাঝে মাঝে অনুভব করত।

চাইতে অবশ্য হোত না। নিয়মিত দুমাস অন্তর বস্তা বস্তা কাপড় শাড়ী আসত। শীতের দিনে আসত দোলাই, আলোয়ান, তুষ, বালাপোষ, পুজোয় সিল্ক বেনারসী, তাঁতের ধুতি।

পুজো পার্বণ বারো মাসে রাহান্ন বার। প্রতি অমাবস্যায় কালী পুজো। এটা বহুদিন থেকে চলে আসছে।

তাছাড়া গঙ্গাপুজো, শীতলা পুজো, নবান্ন, মুলোমুড়ি, পুজো পার্বণের শেষ নেই, ঘুম থেকে উঠেই একটা কিছু শোনা যেত।

পাঁঠা আর ভেড়া বলি লেগেই আছে, মাছ মণে মণে আসত, চাল লাগত প্রতিদিন সাড়ে তিন মণ।

খাওয়া আর বেড়ানো। সন্ধ্যায় খাওয়া সেরে যে যার নিজেদের ঘরে মায়ের কাছে এসে শুয়ে পড়ত। দিনরাত যেন চোখের পলকে কেটে যায়।

মৃগনয়নী আনন্দময় পরিবেশে বড় হয়ে উঠল। একদিনের কথা ওর বেশ মনে আছে। কর্তাবাবু ওকে ডাকলেন। ডাকেন না, আজ ডাকলেন যেন নতুন করে দেখলেন ওকে, বললেন, বাঃ! রামের এই শ্যামলা মেয়েটা বেশ হয়েছে তো!

ডাগর ডাগর চোখদুটো তুলে তাকাল মৃগনয়নী।

কর্তাবাবু বললেন—দুপুরে আসবি, তোকে দিয়ে একটা কাজ করাব আজ।

মৃগনয়নী মাথা নেড়ে চলে গেল।

তরঙ্গিণী দেখেছে কর্তাবাবুর সঙ্গে কথা বলছে মৃগনয়নী। বেরিয়ে আসতেই ধরে —তোকে কি বললে রে কর্তাবাবু?

মৃগনয়নী হাত ছাড়িয়ে বলে—কি আবার বলবে।

—বল না?

—বললে দুপুরে যেতে।

—শোন, দুপুরে গিয়ে কর্তাবাবুর কাছ থেকে টাকা চাইবি একটা।

—কেন?

—কেন কিরে! রসগোল্লা খাব আর কদমা!

মৃগনয়নী বোকার মত তাকিয়ে বলে—আচ্ছা।

তরঙ্গিণী চোখদুটো নাচিয়ে দুলতে দুলতে বলে—চ' তোকে জামরুল খাওয়াব।

—কোথায়?

—চল না।

ওর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে ও-ধারের পাঁচিলের পাশে। পাঁচিলের শেষ যেখানে, সেখানে ছোটখাট একটা বন। বড় বড় তেঁতুল গাছ আর কুল গাছ। নীচে বেতের বনে ছাওয়া। পাঁচিলের পাশ দিয়ে উঠেছে একটা জামরুল গাছ। গাছ ভরতি সাদা জামরুল।

গাছের নীচে ছড়িয়ে পড়েছে জামরুল ফুল ছোট ছোট সাদা মোতির মত।

তরঙ্গিণী বলে—এই পাঁচিলে উঠতে হবে।

বেলা তখন অনেক। কাঁচের মত আকাশে সূর্যকিরণ ঝলসে উঠছে যেন। মাঝে মাঝে লঘু মেঘ ভেসে যায় মাথার ওপর দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ছড়িয়ে। একটু বা মেঘের ছায়া দেখা যায়। আবার রোদ। মাথার তালুটা জ্বলে।

এবার উঠবে ও পাঁচিলের ওপরে ভাঙ্গা ইটের গর্তে পা ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে।

—পেন্নাম করলে কেন?

—ও বাবা পেন্নাম না করলে রক্ষে আছে! ঘাড় মুটকে দেবে যে।

—সে আবার কি?

—তুই জানিস না বুঝি? তরঙ্গিণী বলে চোখ বড় বড় করে। কথা যত না বলে ভাবভঙ্গী তার দ্বিগুণ। বলে—কর্তামা বলেনি তোকে?

—না।

—এই পাঁচিলে যে একটা লোককে গেথে ফেলেছিলো।

মৃগনয়নী বোবার মত ভয়ে ভয়ে তাকায়।

হাত পা নেড়ে তরঙ্গিণী বলতে থাকে, দাউদপুরের সদার, ওরা বিদ্রোহী হয়েছিলো কিনা। মানে খাজনা দেবে না, আমাদের মানবে না। লাঠি সড়কি নিয়ে মারামারি কোরত খাজনা নিতে গেলে। তা আমাদের ঘাটজন বরকন্দাজ পাঠিয়ে দাদু ওকে ধরে এনেছিল। তখন এই পাচিল সবে তৈরি হচ্ছে। এর ভেতর গেঁথে ফেলেছিল সদারকে।

চোখদুটো বড় বড় করে আবার পাচিলটাকে প্রণাম করে তরঙ্গিণী।

মৃগনয়নীর বুকের ভেতর ধুক ধুক করে। গায়ে কাঁটা দেয়।

তরঙ্গিণী ততক্ষণে তরতর করে উঠে গেছে পাচিলের ওপর। মৃগনয়নীর চোখের সামনে সেই পাঁচিলে গাঁথা লোকটার কঙ্কাল ফুটে ওঠে। ও বলে—শীগ্‌গির নাব দিদি, ভয় করছে।

পাঁচিলের ওপর থেকে জামরুল ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে তরঙ্গিণী বলে—নে কুড়ো, ভয় আবার কি। ধুস! এখন তো দুপুর বেলা।

মৃগনয়নী জামরুল কুড়োয়। বুকের ভেতরের ধুক্‌ধুকুনী ওর কিছুতেই যায় না।

সমস্ত দুপুরটাই ওর ভয় ভয় করে। কর্তাবাবুর কাছে যেতে হবে একটু বাদে। কর্তাবাবু এইমাত্র খেয়েদেয়ে বাইরে গেলেন। গড়গড়ার শব্দ শোনা যাবে এক্ষুণি। তাকিয়া ঠেস দিয়ে একটু বা ঝিমোবেন। ঝিমোনো মানে যত রাজ্যের মামলার ফিকিরের জাল বিস্তৃত হবে মাথায়। আজ বোধ হয় আর ঝিমোনো হল না। নিত্যপুরের জমিদার খেয়েছে আজ ওদের বাড়ী, মৃগনয়নীর কানেও এসেছে কথাটা। ওরই মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে দাদার।

ওঁর সঙ্গেই হয়তো গল্প করবেন কর্তাবাবু।

মৃগনয়নী আস্তে আস্তে কর্তাবাবুর বাইরের ঘরের দিকে যায়।

না। গল্প তো করছেন না। ঝিমোচ্ছেন।

মৃগনয়নী গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। পাশে বসে।

ওপাশে একটা লম্বা খাটে বিশাল পাহাড়ের মত একটা মানুষ পড়ে আছে। নাকের ভেতরে তার শব্দ হচ্ছে। একটা অদ্ভুত শব্দ। কর্তাবাবুরও হয়। ভয়ে ভয়ে লোকটার দিকে তাকায় মৃগনয়নী।

কর্তাবাবুর ঠোঁট থেকে গড়গড়ার নলটা পড়ে যেতেই চমকে ওঠেন।

মৃগনয়নীকে দেখে বলেন,—তুই এসেছিস। শোন। উঠে বসেন কর্তাবাবু।

—বোস আসছি। বাড়ীর ভেতর চলে যান।

মৃগনয়নী একা একা এত বড় একটা ঘরে বসে থাকে। নাকের শব্দটা শুনে ওর কেমন ভয় ভয় করে। কর্তাবাবু ফিরে আসেন। হাতে তাঁর একটি সোনার শেকল।

—আয়।

মৃগনয়নীকে নিয়ে লোকটির কাছে যান।

ঘুমন্ত লোকটির হাত দুটো আস্তে আস্তে তুলে সোনার শেকল দিয়ে বাঁধলেন।

বেঁধে মৃগনয়নীর কানের কাছে বলেন,—ঘুম থেকে উঠতে গেলে, তুই বলবি উঠতে পাবেন না। জোর করে উঠতে গেলে চেঁচাবি। আমি কাছারী ঘরে রইলুম। কাজ আছে।

চলে যান কর্তাবাবু।

মৃগনয়নী চুপ করে বসে থাকে।

বিশাল লোকটির বড় বড় থাবার মত হাতের গোড়ায় মোষের গলার মত মোটা কব্জি দুটো সোনার শেকলে বাঁধা।

নাকের গর্ত দুটো কি বড় রে বাবা। উঃ কি ভীষণ শব্দ! মৃগনয়নী চোখ দুটো বুজে ফেলে।

শব্দটা একটু কমে আসে। আবার তাকায় ও।

ঘরের সামনে প্রায় বিশ বিঘে ফুলবাগান। দু ধারে হলুদ চাঁপার ঝোপ।

মাঝের গোল মাটির চাকার ভেতর বড় বড় গাঁদার পাহাড়। কত টগর, জুঁই আর গন্ধরাজ গাছ।

বাগানের পাঁচিলের এক পাশে বেমানান দুটো কাঁঠাল গাছ।

পাতাবাহারের ছড়াছড়ি। বড় বড় এক একটি পাতায় রামধনু রঙ ছড়িয়ে আছে।

ছোট ছোট কচুগাছের পাতা। হলুদ সবজে। তাতে রক্তচন্দনের ছিটে পড়েছে মনে হয়।

পাতাবাহারের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় বিদেশী শাক-সবজির চাষ। ছলাত শাক, বিট, গাজর, বিলিতী বেগুনের চারা।

বাগানটি কর্তাবাবুর নিজের হাতের তৈরি। রোজ ভোরে উঠে অন্তত দু ঘণ্টা বাগানে বেড়ান।

বাগানের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে মৃগনয়নী।

ফুল আর পাতার বাহারে মনটা ওর প্রসন্ন হয়ে ওঠে। এক অনাবিল আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে মনে। পা দুটো নাচতে থাকে। ছুটতে ইচ্ছে হচ্ছে। এক ছুটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে ওই হলুদ চাঁপার কাছে। বাগানে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে কি আরাম!

ভোঁস করে একটা শব্দ হয়। চমকে তাকায় মৃগনয়নী।

বিশাল লোকটি নড়েচড়ে উঠছে। বলে ওঠে ও,—উঠবেন না।

লোকটি হাসে। শোবার আগে পান খেয়েছিল। দাঁতে তখনও পানের ছোপ।

—কর্তাবাবু! চেঁচিয়ে ওঠে মৃগনয়নী—কর্তাবাবু!

একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে কর্তাবাবু আসেন। বাবা আসেন। মেজজ্যাঠা আসেন। আরও অনেক লোক। বিশাল লোকটি হকচকিয়ে চারদিকে তাকায়।

কর্তাবাবু এসেই যেন বিস্ময়ে বলেন,—একি আপনাকে বাঁধল কে? একি মশাই আমাদের এই এক ফোঁটা মেয়ে আপনাকে বেঁধে পাহারা দিচ্ছে।

সোনার শেকলটা ঝকঝক করে ওঠে। লোকটি অপ্রস্তুত হয়ে হাসতে থাকে। সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

হাসির ভেতর কর্তাবাবুর গলা শোনা যায়—আপনি তো বন্দী। মেয়ে দান করে মুক্ত হতে হবে।

এঁর মেয়ের সঙ্গেই মৃগনয়নীর দাদার বিয়ের কথা হচ্ছে। অপরূপ ঠাট্টার কথা ছড়িয়ে পড়ে মুখে মুখে।

মৃগনয়নী বাড়ীর ভেতর যেতে না যেতে কর্তামা, মা, মেজজেঠী আর আশে পাশের সব মেয়েরা ঘিরে বসে মৃগনয়নীকে।

—বল, কি ব্যাপার?

মৃগনয়নী আজ সকলের কাছে প্রিয়। জীবনে এই প্রথম ওকে সবাই একটা মানুষ

বলে মেনে নিল। সকলের প্রিয় হয়ে উঠল। কর্তাবাবুর প্রিয় হলে সকলের প্রিয় হবে এ আর আশ্চর্য কি?

—বল্ না। কি হোল?

মৃগনয়নী একটু হকচকিয়ে যায়। বড় বড় চোখ মেলে তাকায় সামনের দিকে। তারপর যা ঘটেছিল, সব বলে। মেয়েরা হেসে লুটোপুটি। খুব জব্দ হয়েছে ভাবী বেযাই।

এগুলো ছিল তখনকার দিনের জমিদারী ঠাট। ঠাটা যেমন গুরুতর তেমনি উপভোগ্য।

মেয়েদের ভিড়ে ঘেমে ওঠে মৃগনয়না। ভিড় একটু কমতেই ও ছুটে চলল হৃদয়দার ঘরে।

হৃদয় বারিক ঘরেই ছিল। ছোট একখানি তক্তপোশ ওর ঘরে। ঘরটি ওর একার। বাড়ীর এক কোণে ছোট একটু ঘর।

কাছে যেতেই হৃদয়দা ওকে কোলে টেনে নিলে। আঙুলকাটা হাতের তেলো বুলোতে লাগল ওর পিঠে।

হৃদয়দার চোখ দুটো টকটকে রাঙা। গাটা যেন বড্ড গরম।

বোধহয় কিছু আগে বড় একছিলিম হয়েছে। সে গরমটা টাটকা।

মৃগনয়নী হৃদয়দার গা ঘেঁষে বসে। দুপুরের ওই গল্পটা ভুলতে পারেনি ও।

জিজ্ঞেস করে,—আচ্ছা, হৃদয়দা, পচাপুকুরের বনের পাশে পাঁচিলের ভেতর একটা মানুষ গেঁথে ফেলেছিলো?

হৃদয় রাঙা আধ বোজা চোখ দুটো একটু তুলে হাসে,—হুঁ। কত! একটা কিরে! ওতো এক হাত তফাৎ তফাৎ একটা করে মানুষ। একখানি ইট খসিয়ে দেখিস হাড় পাবি।

—বলো কি?

—হ্যাঁ, অমন তো হামেশাই হয়। এই তো সেবারে—

ব্যস্ আরম্ভ হোল হৃদয়দার গল্প। কত জমিদার কত রাজার গল্প। গল্পগুলো তিল থেকে তাল হয়ে যায় ছিলিমের গুণে। মৃগনয়নী হাঁ করে শোনে।

অনেক পরে তরঙ্গিণী ওকে ডাকতে আসে। সন্ধ্যে তখন উতরে গেছে।

দুই

মনে পড়ে বলত মৃগনয়নী। বিরাট জমিদার পরিবারে মানুষ হবার অনেক জ্বালা। বড় একটা ইঞ্জিন চলছে, সবাই ইঞ্জিনের তদারকে ব্যস্ত। পেছনের অগুনতি কামরাগুলো ফালতো। ওগুলো ইঞ্জিনের জোরে আপনা-আপনিই চলে আসবে। মৃগনয়নী এ পরিবারে অতি নগণ্য ছোট একটি কামরা।

বছরগুলো তাই কাটলো একঘেয়ে। বেহিসেবী সংসারে খাওয়া পরার যেমন হিসেব নেই। মানুষেরও হিসেব নেই। মা বাবার নজরও পড়ে না বেশী সন্তানদের পর। কেউ নিজেরটির জন্যে নয়, সবাই সকলের জন্যে ব্যস্ত।

এমনি করেই বড় হয়ে উঠলো ওরা। তরঙ্গিণী বেশ বড় হয়ে উঠেছে। পুঁটিদিও। দাদার বিয়ে হয়ে গেছে সেই জমিদার কন্যার সঙ্গেই। আর একজন সঙ্গিনী বেড়েছে ওদের। ওরা ডাকে, বড় বৌ। বৌ ডাকে, ঠাকুরকন্যা। ঠাকুর-ঝি নয়। ঠাকুরকন্যা ডাকাই ওদের নিয়ম।

পুঁটিদির সঙ্গেই মৃগনয়নীর ভাবটা জমে বেশী।

ফরসা পাতলা পুঁটিদি একটু ট্যারা। কিন্তু বড় নম্র, বড় মিষ্টি স্বভাবটি। পুঁটির সঙ্গেই ওর যত আলাপ।

বড় বৌয়ের বনে বেশী তরঙ্গিণীর সঙ্গে।

বিকেলে ভেতরবাড়ীর বাঁধা ঘাটে গা ধুতে যাবে ওরা দুজন একসঙ্গে। মৃগনয়নী আর পুঁটি যায় না। বড্ড জল ছোঁড়াছুঁড়ি করে। অকারণে খিলখিল করে হাসে। হঠাৎ এসে জাপটে ধরে।

দিদি বড় বিশ্রী সব ইয়ে করে। ভাল লাগে না মৃগনয়নীর।

বড়বৌ এসব পছন্দ করবেই। নতুন বিয়ের পর কে না এ সবে আনন্দ পায় শুনি?

গা ধুয়ে এসে পরিষ্কার করে গাটি মুছবে।

চুল বাঁধবে দুজন দুজনার। আলতা পরবে। ঠোঁটে আলতা মাখবে।

কাঁচ পোকার টিপ পড়বে। ডুরে শাড়ীখানা বেশ এঁটেসেঁটে পরে বড়বৌকে নিয়ে তরঙ্গিণী যাবে আয়না মহলের ছাদে। থামের আড়ালে বসবে, তারপর গল্প জমবে দুজনের।

পুঁটি আর মৃগনয়নী আলাদা যাবে গা ধুতে।

পুঁটি ফরসা পাতলা মানুষ, হালকা জলপিপির মত সাঁতরে গিয়ে তুলে নিয়ে আসত শালুক ফুল। সাদা, কোনটা বা লালচে আভা।

অনেকগুলো শালুক ফুল সরু লম্বা ডগা সমেত নিয়ে আসত।

মৃগনয়নী ভাল সাঁতার জানত না। একটু ভারী শরীর। শ্যামলা রঙ। বড় বড় চোখদুটো মেলে দেখত পুঁটির ছটফটে ভাবখানা। বড় ভাল লাগত ওর। পুঁটিকে ও সত্যিই ভালবাসে।

গা ধুয়ে দুজনে ঘরে এসে শালুক ফুলগুলো পরিষ্কার জলে ধুয়ে রাখত একখানা রেকাবীতে।

পুঁটির একটি ছোট শিব ছিল। কাপড় ছেড়ে দুজন ওই ফুল নিয়ে শিবের মাথায় দিত। কামনা কিছু থাকত ওদের মনে।

মৃগনয়নী বলত, তুই কি চাইলি শিবের কাছে পুঁটিদি?

—আমি? পুঁটি দুবার ঢোক গিলে বলত, তুই কি চাইলি?

—আমি? ইয়ে—শোন্ কানে কানে।

কানের কাছে মুখ নিয়ে বলত,—ভাল বর।

পুঁটির কানের পাশে গাল দুটি রাঙা হয়ে উঠত।

বলত,—দুর্ বোকা!

একটু থেমে তারপর স্বীকার করতে হোত, আমিও তাইই চাইলুম কিন্তু চাইতে কেমন ভাল লাগল না। বিয়ে না হলেই ভাল।

—কেন রে।

—অনেক জ্বালা! পুঁটির কথাটা একটু পাকা-পাকা।

—কি আবার জ্বালা শুনি?

—দেখিসনি ও তরফের হরমোহিনী পিসি কি মার খায়। বরটা একটু পাগলা-পাগলা।

—আমি তো দেখিনি! মৃগনয়নী কথা পালটায়, বলে, ও পুঁটিদি। ওই ছাতে চ'। দিদি আর বৌদি কি কথা বলছে শুনিগে।

—দুর্, ওরা সব বাজে কথা বলে।

—কি বাজে কথা?

—ও তুই এখন বুঝবি না। সব অসব্য কথা।

মৃগনয়নীর কৌতূহল বাড়ে। ও এদের ভেতর সবচেয়ে ছোট। বয়স আন্দাজে বা একটু বোকা—ট্যালা। অনেক কথাই নাকি ও বোঝে না। ওকে বুঝতে হবে।

পুঁটিদিকে ধরে নিয়ে ও চলে আসে আয়না মহলের ছাদে।

বসে আছে তরঙ্গিণী আর বড়বৌ। তরঙ্গিণী যেন ফেঁপে উঠছে দিন দিন কলার মোচার মত। বড়বৌ ছোটখাট মানুষ। গুটিসুটি হয়ে বসেছে। তরঙ্গিণী বসেছে পা দুটো ছড়িয়ে। আলগা আরাম ওর চোখে মুখে। বলছে—তা বুঝি জান না?

বৌ বলছে—না তো!

—কর্তাবাবুর মা তো ভরার মেয়ে।

—ভরার মেয়ে কেমন?

—দূর্ তুমি একেবারে ইয়ে! ভরার মেয়ে মানে তখন নাকি নৌকো বোঝাই করে সব মেয়ে আসত, সব উঠতি বয়স। বাপমায়ের পরিচয় নেই, নয়ত বা বাপমা বিক্রি করে দিয়েছে নৌকোর মালিককে। সে সব মেয়েদের নৌকো আসত বর্ষার পর জলে টান ধরবার আগে। মানে এই পুজোর আগে।

বৌ অবাক। থামের আড়াল থেকে মৃগনয়নীও।

—নৌকোর মাঝি-মাল্লাগুলো কি আর একটু-আধটু কিছু না করত। মেয়ের দল নৌকোর ভেতর বসে থাকত এ ওর গা ঘেঁষে। ভরার মেয়ে যারা কিনবে তারা টাকা নিয়ে যেত। মেয়েগুলোর ভেতর বেছে বেছে সুন্দর দেখে মেয়ে কিনে নিয়ে এসে বিয়ে করত।

—বল কি গো!—বৌয়ের চোখদুটো বিস্ফারিত।

—আমার দাদামশাই গিয়েছিলেন নৌকো দেখতে। এমনি বেড়াতে বেড়াতে। সুন্দরী একটি মেয়ে দেখে মজলেন।

বড়বৌ হেসে উঠল খিলখিল করে,—বলো কি ঠাকুরকন্যা। মজলেন একবার দেখে। প্রথম দিষ্টিতে ভালবাসা তাহলে ঠিক কথা বল।

তরঙ্গিণীর মনে রসসঞ্চার হয়। গা দোলাতে দোলাতে খোঁপাটা একবার ঠিক করে নেয় অকারণে। তারপর মুচকী হেসে বলে—তা আর নয়। তেমন তেমন মেয়ের দিকে একবার তাকালে আর চোখ ফেরে না। তেমন তেমন পুরুষও আছে।

আরও কাঁচভাঙা হাসি বড় বৌয়ের,—আছে নাকি? তোমার সন্ধানে আছে?

—সন্ধানে থাকলে তো তার পথ চেয়েই বসে থাকতুম। তোমার সঙ্গে গল্প করতুম না।

—তারপর সেই ভরার মেয়ে বিয়ে করলেন তোমার দাদু ?

—হ্যাঁ। করলেন। বাড়ীতে এসেই নায়েব মশায়কে পাঠিয়ে দিলেন যত টাকা লাগে ওই মেয়ে কিনে নিয়ে এসো। মেয়ে কিনে একেবারে বরণ করে তোলা হল।

—ভরার মেয়েদের তো তাহলে বাপের বাড়ী বলে কিছু নেই ?

—কি করে থাকবে ? আমার ঠাকমা অবিশ্যি ছিলেন দূর গাঁয়ের এক ব্রাহ্মণের মেয়ে। অনেক খোঁজ করে বার করেছিলেন দাদু। ঠাকমা কিন্তু মাটির মানুষ ছিলেন। এমন রূপ আর গুণ এক সঙ্গে নাকি দেখা যেত না। কোন প্রজার কষ্ট শুনলে, কেউ মরেছে শুনলে কেঁদে ফেলতেন। সেদিন নাকি ভাত যেত না তাঁর গলায়। বাবা অনেকটা ঠাকমার ধাত পেয়েছেন।

বড়বৌ শ্বশুরের কথায় গম্ভীর হয়ে বলে—তা বটে এমন মানুষ আমার চোখে পড়ে নি কখনও।

ঠাকমা উপোস করতেন মাসে পনরো দিন। যত পূজো পার্বণ দোল মেলায় ঠাকমার উপোস বাঁধা! অল্প বয়সেই মরে গেলেন। দাদু এত ভালবাসতেন ঠাকমাকে। শোক সইতে পারলেন না। তিনিও মরলেন দুবছরের ভেতর। তখন তো কর্তাবাবু কলেজে পড়েন।

মৃগনয়নী ওপাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে।

পুঁটি কখন চলে গেছে ও টেরও পায় নি। কর্তামার কাছে গেছে বোধহয়।

মৃগনয়নী ভাবছে এখনও ভরার মেয়ের কথা। সে এই প্রথম শুনল তার ঠাকমা ছিলেন ভরার মেয়ে। পুজোর আগে চর থেকে নৌকো বোঝাই পাঠা, খাসী আর ভেড়া আসে। বলির জন্যে। এক নৌকো মেয়ে। পাঁঠার মতই বোধহয় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে থাকত। কল্পনায় কত কাল ছাড়িয়ে চলে গেছে মৃগনয়নী। মাঝে মাঝে এমন করে ওর মন উধাও হয়। বিভোর মৃগনয়নী।

আহা রে! অতগুলো মেয়ে! সব চেয়ে কালো কুচ্ছিত যেটি সেটির না জানি কত কষ্ট! হয়তো বা সব বিক্রি হবার পরও সেটি বিক্রি হল না। অত বড় নৌকোখানায় কালো মেয়েটা বসে থাকবে একা একা। ঘাটে ঘাটে নৌকো ভিড়বে। কেউ বিনামূল্যেও কিনে নেবে না ওকে।

কি হবে তা হলে মেয়েটার ? ইচ্ছে হয় দিদিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে।

না থাক। ভাবতে বেশ ভাল লাগছে, কথা বললে বিভোর ভাবটুকু কেটে যাবে গভীর জল থেকে ভেসে উঠে হাল্কা হয়ে যাবে।

মেয়েটাকে কি শেষকালে অগাধ জলে মাঝ নদীতে ফেলে দিয়ে নৌকো হালকা করবে ওরা। ওকে কেনবার কেউ নেই। বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবেই বা কতদিন?

নয়ত কোন নিলক্ষীর চরে নামিয়ে নিয়ে নৌকো ভাসিয়ে চলে যাবে ওরা। দুয়ারে নদী ঝিকঝিকে রামদায়ের ফলার মত বিরাট চরে কেউ বা পাবে মেয়েটাকে। শুধু কাশবন আর ঘাস।

হাটের নৌকো যাবে চরের পাশ দিয়ে। বেচাকেনার পর খালি নৌকো বোঝাই করবে ওরা চরের ঘাস কেটে। চরের ঘাস ভারি মিষ্টি, গরুকে খাওয়ালে দুধ মিষ্টি হয়।

ওরা নামবে সব। জোয়ান জোয়ান চাষার ছেলে, জেলের পো, হাতে ঘাস কাটবার দা, ওর চেয়েও মিশকালো একটা জোযান চাষার ছেলের নজরে যদি পড়ে যায় মেয়েটা। প্রথম দেখেই ভালবাসা। এই মাত্র দিদি বলছিল।

—এই তুই এখানে কি কচ্ছিস?

চমকে ওঠে মৃগনয়নী। তরঙ্গিণী ধমকে ওঠে। বড়বৌ নীচে নেমে যায়।

তরঙ্গিণী ওর চুলটা ধরে টেনে দেয়—লুকিয়ে লুকিয়ে কথা শোনা হচ্ছে। অসব্য মেয়ে!

মৃগনয়নী বোকার মত তাকায়। হুঁ হাঁ একটা উত্তর দিতেও ওর দেরি হয়। তরঙ্গিণী ততক্ষণে চলে গেছে ছাদের পশ্চিম কোণে। ওখান থেকে দেখা যায় বাইরের ঘরের দাওয়া। সেখানে বেড়াচ্ছে মাস্টার মশাই। ইস্কুলে নতুন এসেছে। ছাব্বিশ বছরের এক সুন্দর মাস্টার। আবার ভাল গানও নাকি গায়।

তরঙ্গিণী দাঁড়ায়। মাস্টারও থমকে দাঁড়ায়।

মৃগনয়নী নিচে গেছে কিনা একবার আড চোখে দেখে নেয় তরঙ্গিণী। চলে গেছে। যাক।

আবার বাইরের দাওয়ার দিকে তাকায় তরঙ্গিণী। বলিষ্ঠ যুবক মাস্টারটি দাঁড়িয়ে আছে তখনও। জমিদারের ইস্কুলে কাজ করে। জমিদারের বাড়ীই থাকে খায়। মাইনে যা পায় বাড়ীতে পাঠায়। থাকা খাওয়ার বদলে পড়াতে হয় দুএকটি ছেলেকে।

বড় সুন্দর গান গায়। প্রথম আসবার পর আসরে একদিন গান গাওয়ান হয়েছিল ওকে। গেয়েছিল—মজলো আমার মনভ্রমরা, শ্যামাপদ নীল কমলে।

কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীত। কর্তারা শুনে খুশী হয়েছিলেন। মেয়েরাও শুনেছিল একদিন ঘরোয়া আসরে।

তরঙ্গিণীর কানে বাজছে এখনও গানের স্বর। কি মিষ্টি গলা। গাইতে গাইতে কেমন তাকায়। চোখত্নটি ছোট ছোট ওর, কিন্তু জলজ্বল করে যেন পৌরুষের মহিমায়।

তরঙ্গিণী মুগ্ধ হয়েছিলো, আজও মুগ্ধ হয়ে আছে।

মাস্টারের দেখা পাবার উপায় নেই। বয়েসের মেয়েদের বাইরের বাড়ীতে যাওয়া বারণ।

অগত্যা আয়না মহলের ছাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে। মাস্টারের দৃষ্টি এধারে ফেরাবার জন্তে কত সাধ্যসাধন। তার ওপর আবার ঠিক একই সময়ে ওকে আকর্ষণ করে টেনে আনা। প্রেমের অনেক জ্বালা!

তরঙ্গিণী নিজের মনেই হাসে।

ওমা! মাস্টারও হাসছে। সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। কি লজ্জা!

লজ্জানন্দে মিশোনো অপরূপ ভাবে বিভোরা।

তরঙ্গিণী দোলে একটু একটু। হাসে ফিকফিক করে।

তরঙ্গিণী জানতো না মৃগনয়নী নিচে নেমে যায় নি। চুপ করে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ছাদের ধারে ঘরের দোরের আড়ালে। এতক্ষণ তরঙ্গিণীর ভাবভঙ্গী দেখে মৃগ-নয়নীর কেমন অবাক অবাক লাগে। মাস্টারকে দেখতে পায় না।

ওকে ফিক ফিক করে হাসতে দেখে বারে বারে অকারণে বুকের আঁচল টানতে দেখে মৃগনয়নী রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। একি রে বাবা! দিদি কি পাগল হয়ে গেল নাকি।

—ও দিদি! মৃগনয়নী এগিয়ে যেতেই তরঙ্গিণী চমকে ফিরে তাকায়।

মাস্টার মুহূর্তে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যায়।

মৃগনয়নী গিয়ে তরঙ্গিণীর একখানা হাত ধরে,—অমন হাসছিলি কেন দিদি?

তরঙ্গিণী মুহূর্তের ভেতর আকাশের দিকে তাকিয়ে তেমনি হাসতে থাকে। খিলখিল করে হেসে ওঠে একবার।

—কি হোল?

তরঙ্গিণী বলে,—দেখছিস না ওই পাখিত্নটো কেমন ঘুরপাক খাচ্ছে।

ভাগ্যি ত্নটো পাখি আকাশে ত্নটি কালো বিন্দুর মত ঘুরপাক খাচ্ছিল, নইলে আজ কি অবস্থা হোত।

মৃগনয়নী আশ্বস্ত হয়।

তরঙ্গিণী ঘেমে উঠেছিল। এতক্ষণে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে,—চ'—নিচে যাই।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ সমস্ত গ্রামের হাওয়া বদলে যায়। বাড়ীতে বাড়ীতে গুমট গাম্ভীর্য। ঘরে ঘরে ফিসফিসানী।

জমিদার বাড়ী স্তব্ধ হয়ে গেছে। কর্তাবাবু থানায় গেছেন কিছুক্ষণ হোল। মেজকর্তা দৌড়োদৌড়ি করছে ঘরে-বাইরে। হাতে গোছা গোছা টাকার নোট। রামতারণ নিঃশব্দে আধা অন্ধকার বাইরের ঘরে বসে জপ করছেন একমনে।

কর্তামা ঠাকুর ঘরে গিয়ে দোর দিয়েছেন। দোরে ঘা দিতে কেউ সাহস করছে না। বৌরা সব নীরবে বসে আছে দাওয়ায়। ঘরের দোরে মাথা রেখে। থম থম করছে সমস্ত বাড়ীখানা।

রান্না প্রায় হয়ে এসেছিল। রান্না নামিয়ে বামুন ঠাকুর ঝি চাকরেরা দলে দলে বসে আছে। জটলা করছে ফিসফিস করে। রান্না আর হবে না। উনুন বোধহয় নিভে গেছে। কি সর্বনাশ হয় কে জানে। কৌতূহল আর বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই।

তরঙ্গিণী, পুঁটি, নোতুন বৌ আর মৃগনয়নী একটা ঘরে বসে আছে।

—কি করে মরলো?

তরঙ্গিণী কিছু কিছু খবর জানে, বলে,—বিলে নৌকার ওপর বৈঠা দিয়ে মেরেছে।

—আহা গো!

মৃগনয়নী বড় বড় চোখ মেলে তাকায়।

—কেন মারলে?

তরঙ্গিণী বলে ফিসফিস করে—ওই নাপিতটার সঙ্গে নষ্ট ছিল রাধারাণী। ওই-ই তো মেরেছে।

—তাহলে তো ভালবাসবে। মারবে কেন।

—সেইটেই তো কেমন কেমন লাগছে, কর্তাবাবু বিকেল থেকে বাড়ী ছিল না। বিলের দিকে নৌকোয় তাকে যেতে দেখেছে অনেকে।

—বল কি গো ঠাকুরকন্যা?

—হ্যাঁ, তবে আর বলছি কি? কর্তামা রাত্তিরে আর ঠাকুরঘর থেকে বেরোবেন না।

মৃগনয়নী কিন্তু কথাগুলো গিলছে।

সেই অন্ধকার নিষ্ঠুর রাত্রিটা সারা জীবনেও ভুলতে পারেনি মৃগনয়নী। ভয়ে হাতপাগুলো ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

পুঁটিদি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে এক গেলাস জল গড়িয়ে খায়। একটি কথাও বলে না পুঁটিদি।

মৃগনয়নী শুধু বলে—বাবা কোথায়?

তরঙ্গিণী বলে,—বাবা বোধহয় মালা জপছেন। তাঁর তো আর কাজ নেই।

মৃগনয়নী একটু ঠাণ্ডা হয়। ও ভেবেছিল বাবাও হয়তো গেছে থানায়।

ওঘরের দাওয়ায় ফিসফিস শব্দ শোনা যায়। মেজজ্যাঠা এসেছেন।

তরঙ্গিণী ছুটে যায় সেই দিকে। পাশে গিয়ে অন্ধকারে কান পেতে দাঁড়ায় অনেকক্ষণ কেটে যাচ্ছে।

তরঙ্গিণী গেল কোথায়? আর এক গেলাস জল খায় পুঁটিদি।

তরঙ্গিণী অনেকটা সময় পরে তেমনি ছুটতে ছুটতে ঘরে আসে। মুখটা ওর উত্তেজনায় রাঙা। চোখদুটো ভয়ে উত্তেজনায় বিস্ফারিত।

—কি ব্যাপার?

—আরও দু'হাজার নিয়ে গেলেন মেজজ্যাঠা।

—তাই নাকি?

—সব শুনে এলুম। ওরে বাবা! বুক কাঁপছে আমার!

সত্যিই তরঙ্গিণীর বুকের ওঠা-নামা শোনা যায়। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন।

তরঙ্গিণী তারপর যা বললে আজ পর্যন্ত সে সব কথা মৃগনয়নীর অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে। ওরা বরাবরই জানত রাধারাণীর কথা। যাকে কর্তাবাবু এনেছিল বজরায় করে মহল থেকে আসবার সময়। ওরা রাধারাণীর অসামান্য রূপের কথা শুনেছিল রূপকথার মত।

আয়না মহলে মাঝে মাঝে রাধারাণী আসত, অনেক রাতে কর্তাবাবুর ডাকে। হৃদয়দা গিয়ে নিয়ে আসত। তারপর কর্তাবাবুর সঙ্গে রাত্রিযাপন করতে হত। নাচগান চলত পুরোদমে। খানসামারা তটস্থ। ভোরে আবার পৌঁছে দিয়ে আসত রাধারাণীকে ওর বাড়ীতে হৃদয়দা।

হৃদয়দার মুখেও এক আধ দিন শুনেছে মৃগনয়নী রাধারাণী নাকি খুব নরম ছিল। যেমন নরম শীতল দেহটি তেমনি নরম মন। চোখের দৃষ্টি ছিল বড় ভীতু। রাস্তায়

আসতে আসতে বার বার বলত পালকি থেকে—হৃদয় ভাই, ভাল করে দেখে চল। সাপখোপের ভয় রাস্তায়।

হৃদয় হাসত।

রাধারাণী নরম ভীরু চোখে তাকাত—ওটা কিসের শব্দ?

—একটা খাটাশ চলে গেল। আবার হাসত হৃদয়।

এত ভীতু রাধারাণী! তেমনি নরম দেহ। দুধে-আলতা রঙ অথচ ভ্রমর-কালো দুটো চোখ। হৃদয়দা বলত, ভোমরার মত কালো।

বেশ তো কাটছিল দিনগুলো। কর্তাবাবুর কাছে কে এসে যেন বললে রাধারাণীর ঘরে আজকাল ওর পাশের পড়শী নিকুঞ্জ নাপিতকে প্রায়ই দেখা যায়। কথাটা এমন জায়গা থেকে শুনেছিলেন যে পুরো অবিশ্বাস করতে পারলেন না। নিজে একদিন হঠাৎ এসে হাজির হোলেন রাধারাণীর ঘরে।

এমন বড় একটা আসতেন না। যখন প্রয়োজন ডেকেই পাঠাতেন।

রাধারাণীর অবাক হবারই কথা। কর্তাবাবু বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখতে পেলেন নিকুঞ্জ নাপিত টুক করে বেরিয়ে গেল রাধারাণীর দরজা দিয়ে। কথাটা সত্যি। একটুও সংশয় রইল না। কর্তাবাবু ঘোড়ায় উঠলেন। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চললেন ফিরে বাড়ীর দিকে।

রাধারাণী বাইরে দোরের কাছে এসেছিল। দেখলেন কর্তাবাবু ফিরে গেলেন।

মুখে কিছু বললেন না কর্তাবাবু।

একটা নাপিতকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবতেও ঘৃণা হয়। যে কোন দিন নাপিতটাকে এনে টিপে পুঁটি মাছের মত মেরে ফেলতে পারেন।

তা করবেন না। এমন শিক্ষা তিনি ওকে দেবেন যে জীবনে ভুলতে পারবে না।

দিন কয়েক পরে বিকেলে বজরা সাজাতে বললেন মাঝিদের। মাঝিরা বজরা সাজালো।

কিন্তু মাঝিদের সঙ্গে নিলেন না। সঙ্গে নিলেন ইসলামপুরের দুদান্ত প্রজা তিনজনকে। তারাই বৈঠা বাইবে।

সেদিন বজরা খালের ধারে রেখে বিকেলে হেঁটে হাজির হলেন রাধারাণীর ঘরে। রাধারাণী আজও অবাক। পা ধুইয়ে ঘরে এনে বসালো রাধারাণী।

এইমাত্র গা ধুয়ে এসেছে। স্নিগ্ধ নরম মুখখানির ওপর তখনও দু'চার ফোঁটা জল। ভ্রমর কালো চোখের নিচে নীল ভেঙে দিয়েছে। শাড়ী পালটে এল রাধারাণী।

তাকালেন কর্তাবাবু, ঘাড় নাড়লেন,—উঁহু।

—কি? ভয়ে ভয়ে বললে রাধারাণী।

—আরও ভাল করে সেজে এসো। ঘাগরা পর। তার ওপর বেনারসীর ওড়না। চোখে সুরমা দাও।

রাধারাণী ম্লান হাসে,—কেন হঠাৎ?

—যা বলছি কর।

রাধারাণী তোরঙ্গ থেকে বার করে সব চেয়ে ভাল ওড়না, ঘাগরা।

বলে,—এগুলো সন্ধ্যের পরে পরলেই হোত?

কর্তাবাবু হাসেন। ক্রুর হাসি—না এখনই। বজরায় থাকব আজ রাত্রে।

—কেন, আমার ঘরে কি থাকতে নেই?

চোখদুটো কুঞ্চিত হয় কর্তাবাবুর—না, থাকতে নেই। বজরায় বেড়াব আজ।

রাধারাণী পাশের ছোট ঘরে চলে যায়।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢোকে।

কর্তাবাবু বলেন—বোস।

চোখ ঝলসে যায় কর্তাবাবুর। জড়ির চুমকীগুলো চিকচিক করছে ওড়নার ওপর। নিচের বুকের জামায় বেনারসী কল্কা। আঁট জামা ঝলমল করছে।

কর্তাবাবু ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

রাধারাণী সলজ্জ হেসে মুখ নামায়।

—সত্যিই তুমি সুন্দরী রাধারাণী।

রাধারাণীর কালো চোখের মণিদুটো চিকচিক করে কৃতজ্ঞতায়।

—চলো এবার। কর্তাবাবু ওঠেন।

—একটু পান তামাক খেয়ে গেলে হোত না?

—না।—কঠিন স্বরে জবাব দেন কর্তাবাবু।

পিছন পিছন রাধারাণী চলে। বজরায় ওঠে।

জোয়ান জোয়ান মাঝিগুলো রাধারাণীর রূপে বিহ্বল হয়ে তাকায়। একটু যেন বা মুচকে হাসে। রাধারাণীর চোখ পড়ে। এরা আগের চেনা মাঝি নয়। সব অচেনা।

কি জানি কেন এক আতঙ্কে ওর বুকটার ভেতর কাঁপে।

বজরার ছোট ঘরে গিয়ে বসেন কর্তাবাবু। গালিচার ওপরে এক পাশে বসে রাধারাণী।

কর্তাবাবু গড়গড়ার নলটা হাতে তুলে নেন। বাইরে একজন মাঝি তামাকে ফুঁ দিচ্ছে।

কর্তাবাবু ডাকেন—কাছে এসো।

রাধারাণী মুখ তুলে তাকায়। এবারে ভয়ে ভয়ে।

কাছে এলে কর্তাবাবু একখানি হাত নিজের কোলের ওপর রাখেন।

কর্তাবাবু এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন ওর দিকে। ধবধবে ফরসা নরম গালের ওপর রক্তাভা, চোখের পল্লব কত সুদীর্ঘ ঘন।

—সত্যি তুমি সুন্দরী। ভয়ংকর সুন্দরী!

চমকে ওঠে রাধারাণী। ভয়ংকর কথাটায়।

কথাটার সুরে কোথায় যেন এক চাপা জ্বালার সন্ধান পায়।

তরতর করে বজরা চলেছে এগিয়ে। গাবগাছের বন পেরিয়ে যায়, পেরিয়ে যায় বেগাছের সীমানা।

কর্তাবাবুর বিশাল বুকের ওপর মাথা রেখে আধশোয়া হয়ে পড়ে আছে বিবশা রাধারাণী।

—কোথায় চলেছি জানো?

রাধারাণী তাকায়—কোথায়?

—জাহান্নমে!

সর্বশরীর কেঁপে ওঠে ওর, জড়িয়ে ধরে কর্তাবাবুর বিশাল দেহখানা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নদীর মোহানার কাছে এক চরের ধারে এসে বজরা থেমেছে। অন্ধকার ঘন আলকাতরার মত ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। বাতাস বইছে জোরে। কাশবন দুলছে বাতাসে। শোঁ শোঁ আওয়াজ শোনা যায়। নীরেট চাপা অন্ধকার। পুবদিকে তীর দেখা যায়।

বজরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। যেন কি এক আদেশের অপেক্ষায়। বজরার বাইরে আলো দেয়া হয়েছে। ভেতরে আলো দিতে বারণ ছিল কর্তাবাবুর।

জোয়ান মাঝি তিনটে অন্ধকারে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে জ্বলছে ওদের চোখগুলো। কর্তাবাবু বসে আছেন ভেতরে অন্ধকারে।

রাধারাণী কর্তাবাবুর পায়ের ওপর গাল রেখে কাঁদছে। অঝোরে কাঁদছে—কি করেছি আমি? বলো আমি কি করেছি?

কর্তাবাবুর মৃদু হাসির সঙ্গে শোনা যায়—কিছুই করো নি।

ওর নরম দেহটা পা দিয়ে আস্তে একটু ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ান কর্তাবাবু।

—চলো একটু বাইরে যাই।

রাধারাণী কর্তাবাবুর পা দুটো আঁকড়ে ধরে আবার, আমার কি অপরাধ বলবে না?

—না। কঠিন স্বর কর্তাবাবুর। রাধারাণীর হাতটা ধরে টেনে তোলেন। বাইরে নিয়ে আসেন।

মাঝি তিনটে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানায় কর্তাবাবুকে। আসামী হাজির। আগে থেকেই বলা আছে। ওদের ইশারা করেন কর্তাবাবু। জোয়ান লোক তিনটে রাধারাণীর তিনপাশে এসে দাঁড়ায়।

বজরার বাইরের ম্লান আলোয় রাধারাণীর মুখটা দেখা যায়। কর্তাবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টির ভাষা মর্মান্তিক করুণ। কর্তাবাবুর মুখখানা পাথরে কোদা যেন।

রাধারাণী মুহূর্তে আর একবার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কর্তাবাবুর পায়ের ওপর।

স্বর ভেঙে গেছে ওর, তবু প্রাণপণে চীৎকার করে বলে, মারতে হয়, তুমি নিজে হাতে মারো। ওদের হাতে দিও না।

কর্তাবাবু পা দুটোর ওপর থেকে ওকে তুলে নেন হাতে। ফিসফিস করে বলেন, নিজের হাত দুটো আর নষ্ট করতে চাই না। ওদের কাছেই যেতে হবে।

বজরার ঘরে ঢুকে যান কর্তাবাবু। আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ে রাধারাণী।

তারপর বোধহয় আর জ্ঞান ছিল না।

কর্তাবাবুর কাছে কিছুক্ষণ পরে একটা লোক আসে— সব শেষ হুজুর।

কর্তাবাবু গড়গড়া টানেন। কপালে স্পষ্ট কয়েকটা রেখা। বলেন—লাশটা নিকুঞ্জ নাপিতের বাড়ীর সামনে শুইয়ে রেখে চলে আসবে। আমাকে বটগাছের নিচে নামিয়ে দাও। ওখানে ঘোড়া থাকবে। আমি চলে যাব।

বজরা নড়ে ওঠে। অন্ধকার ভেদ করে জলের ওপর বজরা চলে আবার। কর্তাবাবুর কথামতই সব কাজ হয়।

বাইরের ঘরে এসে চুপ করে বসে থাকেন কর্তাবাবু। খানিকক্ষণ সময়ের ভেতরেই কর্তাবাবুর কাছে লোক আসে হাঁপাতে হাঁপাতে—হুজুর রাধারাণী খুন হয়ে পড়ে আছে।

—কোথায়?

—নাপিতের বাড়ীর সামনে।

—বলো কি? যেন বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠে পড়েন কর্তাবাবু।

থানায় খবর যায়। কর্তাবাবু নিজে থানায় যান। সব শুনে দারোগা লাশ আনে। নাপিতকে বেঁধে আনা হয়।

নাপিতের কথা শুনে কর্তাবাবুর কথা শুনে দারোগার সন্দেহ হয়।

আশে পাশের লোকের কাছে শুনতে পায়, তারা দেখেছে কর্তাবাবুর সঙ্গেই বেরিয়েছিলো রাধারাণী।

দারোগা হাসে, কেসটা সাজানো মুশকিল হবে স্যার।

দুহাজার টাকার নোট টেবিলের ওপর রেখে কর্তাবাবু বলেন—নাপিতটাকে লটকাতেই হবে।

—টাকা নিতেই এসেছিলো মেজজ্যাঠা। বলে তরঙ্গিণী। মেজজ্যাঠা জেঠাকে সব বলছিলো। মৃগনয়নী, পুঁটি, নোতুন বৌ পাথরের মত স্থির হয়ে বসে থাকে।

তরঙ্গিণী আবার বলে—আহা রে, রাধারাণীর লাশটা একবার দেখলে হোত!

ওরা কেউ উত্তর দেয় না।

পুঁটি আর এক গেলাস জল খায়।

পরদিন শোনা যায় নাপিতটাকে চালান দেওয়া হয়েছে সদরে খুনের অপরাধে। মামলায় কর্তাবাবুকেও সদরে যেতে হয় আর তিনহাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে।

বাড়ীতে এক গুমট নীরব হাওয়া বইতে থাকে। সবাই ফিসফিস করে কথা বলে, কাজ করে, খায়, ঘুমোয়। কর্তামা বেশীর ভাগ সময়টাই কাটান ঠাকুর ঘরে।

প্রায় সতেরো দিন পরে কর্তাবাবু ফিরে আসেন। আরও কিছুদিন পরে খবর পাওয়া যায়। খুনের অপরাধে নাপিতের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেছে। সাক্ষাৎ প্রমাণ নেই বলে ফাঁসিটা হয়নি।

আরও একবার স্তম্ভিত হয়ে যায় সমস্ত বাড়ীখানা। আরও একটা নিরীহ মানুষের জীবন গেল। কেউ কিছু বলে না। কর্তাবাবু আরও গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। কথা বলেন আরও কম, রাগ দেখা যায় আরও বেশী।

তাই তটস্থ থাকে সবাই। রামতারণ বসে বসে দিনরাত জপ করে। কারো সঙ্গে একটা কথাও বলে না।

তিন

বহুদিন ধরে একটা বিরাট স্বপ্ন মৃগনয়নীর মনকে ভীত করে তুলতো, বিভ্রান্ত করে তুলতো। সংসারে এত অন্যায়ের কি কোন শাস্তি নেই? সেই তামস মনোবিকারের পরিণতিতে রাধারাণী আকাশে বাতাসে যে আর্তনাদ তুলেছিলো, সে সকরুণ আর্তনাদের কি কোনও মূল্য নেই?

অনেক বছর পরে মৃগনয়নী হাসত আর বলত,—চোখে দেখেছি বাবা, সংসারে অন্যায় করে পার পাবার উপায় নেই। যে মন তামস মোহে ডুব দিয়ে তোমাকে অন্যায় করাবে, সেই মনই একদিন বিচারক হয়ে উঠবে। পাপপুণ্য তো মনে বাবা, মনই চুলচেরা বিচার করে নিজের অন্যায়ের ওপর নিজে শোধ নিয়ে নেয়।

কর্তাবাবুর মৃত্যুর আগের কথাটা রাধারাণীর আর্তনাদের মতই ওর মনে আছে। বহুদিন আগে ঘরের তাকের ওপর একটা পুরোনো হাঁড়ি থেকে তেঁতুল চুরি করে খেতে গিয়ে বিছের কামড় খেয়েছিল মৃগনয়নী। বিছের কামড়ের জ্বালাটা বেশ মনে আছে।

তার সঙ্গে একমাত্র তুলনা করতে পারে ও কর্তাবাবুর শেষের কয়েকটা দিন।

মনের পরতে পরতে গোটা চল্লিশ বিয়াল্লিশ বিছে কামড়ালে যে রকম জ্বালা হতে পারে, সেটা অনুমান করা কিছুমাত্র কঠিন হয়নি কর্তাবাবুকে দেখে।

মাঝে মাঝে রাধারাণীর নামটাও শোনা গেছে তার মুখে—বিকারের জ্বালায়।

বহুকাল ধরে বহুমৃত্যু দেখেছে মৃগনয়নী, কিন্তু অমন করুণ জ্বালাময় মৃত্যু আর দুটো দেখেনি। রাধারাণীর অসহায় আর্তনাদের বিচার দেখেছে ও।

রাধারাণীর মৃত্যুর পর নাপিতের সাজা, তারপর কর্তাবাবুর অবস্থাটা বেশ মনে আছে মৃগনয়নীর। মাঝে মাঝে উন্মনা হয়ে কি ভাবতেন বসে বসে। এঁটো হাতেই হয়ত বসে আছেন। কর্তামা আর সামনে বসে খাওয়ান না। মৃগনয়নী তরঙ্গিণী ওরাই কেউ থাকে।

এঁটো হাতে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর একটা নিঃশ্বাস ফেলেন, বলেন হয়তো মৃগনয়নীকে,—তোর কর্তামাকে একবার ডাক দিকি?

মৃগনয়নী যেতো কর্তামার কাছে। জানাই আছে কার্তামাকে পাওয়া যাবে পুজোর ঘরে।

—কর্তাবাবু ডাকছেন।

—কে? যেন চমকে ওঠেন কর্তামা। বসেছিলেন গোবিন্দজীর সামনে।

—কর্তাবাবু ডাকছেন।—আবার বলতে হয় মৃগনয়নীকে।

কর্তামার ভ্রূদুটি কুঁচকে ওঠে। ফরসা মুখখানি কালো হয়ে ওঠে বোধহয় ভেতরের কোন অসহ্য জ্বালায়। বলেন—বল এখন যেতে পারব না।

—তোমার জন্যে অনেকক্ষণ বসে আছেন।

কর্তামা গম্ভীরস্বরে বলেন,—বিরক্ত করিসনি আমায়। যা বললুম বলগে যা।

মৃগনয়নীকে ফিরে আসতে হয়।

কর্তাবাবুর কাছে ও একথা কি করে বলবে। যদি রেগে ওঠেন?

ও যেতেই কর্তাবাবু বলেন—ফিরে এলো?

মৃগনয়নী খুব মিষ্টি করে বলে—গোবিন্দর ভোগ সামনে, বললে আসতে পারবে না এখন। মানে যদি ভোগ নষ্ট হয়।

কর্তাবাবুর মস্ত চাকার মত গোল মুখখানা মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায়। উঠে পড়েন, একটুও রাগ করেন না।

কর্তাবাবুর জন্যে কেমন একটু মায়াও হয় যেন মৃগনয়নীর।

ওরা নীরব বিস্ময়ে দেখে কর্তামা কর্তাবাবুর সঙ্গে আর একটা কথাও বলেন না। বেশীর ভাগ সময় কাটান ঠাকুর ঘরে।

রাত্রে অবশ্য শোবার ঘরে যান। কর্তাবাবু যখন ঘুমিয়ে পড়েন, জেগে জেগে অপেক্ষা করে অধৈর্য হয়ে পড়েন,—তখন যান কর্তামা। ভোরে প্রায় রাত থাকতে উঠে বেরিয়ে আসেন।

তরঙ্গিণী হাসতে হাসতে বলে,—লোকে বলে বউকে ত্যাগ করে। এ যে দেখছি কর্তামা কর্তাবাবুকে ত্যাগ করেছেন।

নোতুন বউ বলে,—আহা, অমন করে বোলো না, হেসো না। দুজনকে দেখলে বড় কষ্ট হয়।

তরঙ্গিণী খিলখিল করে হাসে,—তোমার তো পুতুলের বিয়ের কনে বাপের বাড়ী গেলেও চোখে জল আসে। নিজের কথা ভেবে ভয় হয় বুঝি?

—ধুস্। কি যে বলো?

পুঁটি এক গেলাস জল খেয়ে এই ধরণের আলাপ হতে দেখে সরে পড়ে। ও কখনও এ ধরণের আলাপে মজে না।

মৃগনয়নী দাঁড়িয়ে থাকে বোবার মত। কথা না বললেও শুনতে ওর ম লাগে না।

বিয়ের কথাটা ভাবলেই আজকাল বুকের ভেতর কেমন একটা চমক লাগে একে নাকি পুলক বলে। বর—কথাটা এত মিষ্টি এতদিন কেন যে বুঝে পারেনি। দিদির মুখের রসাল কথা শুনলে আরও কেমন কেমন করে। খুশী খু লাগে।

পুঁটিকে ও জিজ্ঞেস করে,—দিদি কথা বললে তুই চলে যাস কেন?

রোগা ফ্যাকাশে পুঁটি ফ্যালফ্যাল করে বললে,—কি জানি ভাই, আমার কেম ভয় করে।

—ভয়? সেকি রে? বরের কথা শুনলে ভয়?—মৃগনয়নী হাসে।

—হ্যাঁ।—পুরুষ মানুষ ভাবলেই আমার কেমন ভয় লাগে।

—তবে বিয়ে হলে কি করবি?

—বিয়ে না হলেই ভাল ভাই।—ভয়ে ভয়ে বলে পুঁটি।

—দুর্! তা কখনও হয়। বিয়ে তো হবেই।

—আমার ওসব ভাবতে ভাল লাগে না।

মৃগনয়নী বলে,—ভাল লাগে না বললে তো তোমায় ছাড়বে না।

পুঁটি ভীষণ চিন্তিত ভীত হয়ে পড়ে, বলে,—ও সব কথা থাক।

মৃগনয়নী বলে,—দেখব সত্যি সত্যি বর এলে কেমন ভয় খাও।

—দেখিস আমি পালাব। গুণ্ডো মতন পুরুষ মানুষের কথা ভাবতেই আম কেমন যেন বুক ধড়ফড় করে। থাকগে ওসব কথা, চ' দয়াময়ী মন্দিরে যাই। আ কালীকেত্তন হবে।

—কে গাইবে?

—বোধহয় ওই নোতুন মাস্টার।

—চ' যাই।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মৃগনয়নী মাকে বলে দয়াময়ী কালীবাড়ীর দি এগোয়। পুঁটি সঙ্গে আছে।

বাড়ীর ভেতর দিয়ে অনেক উঠোন চাতাল পেরিয়ে মন্দিরে যেতে হয়। ও বাড়ীর ভেতর দিয়ে চলতে থাকে। সদরের পথ দিয়ে মেয়েরা যায় না।

ছোট শরিকদের আঙিনা পেরিয়ে তবে দয়াময়ী কালীবাড়ীর ভেতরে বাঁ পা

গিয়ে দাঁড়ায়। সামনে নাটমন্দিরে গান হবে। আরতি হচ্ছে। গানের একটু দেরি আছে।

পুঁটি আর মৃগনয়নী দাঁড়িয়ে থাকে একটা থামের আড়ালে।

সকলেই হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। এক মনে দেখছে আরতি।

মৃগনয়নীর গরম লাগছে। গায়ে গতরে ও একটু ভারী। কেমন হাঁসফাঁস করছে। মৃগনয়নী এ-পাশে ও-পাশে তাকায়। মন্দিরের পুব দিকের চাতালে এসে দাঁড়ায়।

সামনে ছোট একটু মাঠ। অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে ক্রমে। মেঘভরা আকাশে একটুকরো জলে ভেজা চাঁদ—নরম ক্ষীণ আলোর রেখা। মৃগনয়নী বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়। আরতির বাজনা মাঠের কিনারায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। হঠাৎ মৃগনয়নীর চোখ পড়ে অল্প দূরে কাঞ্চন ফুলের গাছের দিকে। গাছের নিচে দুটি মানুষ দেখা যাচ্ছে। বুকটা কাঁপে ওর। ভূত নয় তো?

ভাবে পালাবে নাকি? পা দুটো সিমেণ্টের চাতালে আটকে আছে। একটুও নড়তে পারে না। ভয়ে আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

একটু সময় পরে দেখতে পায় একটি মূর্তি ধীরে এগোচ্ছে। ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। চীৎকার করবে কিনা ভাবে।

মূর্তিটি পাশ দিয়ে মন্দিরের সদরের পথের দিকে চলে যায়। মানুষটা চেনা মনে হয়। ভাল করে তাকিয়ে দেখে এ সেই নোতুন মাস্টার। মাস্টার কি করছিলো কাঞ্চন ফুলের গাছের নিচে?

আর একটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসে। এবার আর অতটা ভয় পায়না মৃগনয়নী। ভাল করে তাকায়। ওমা! এ যে দিদি! তরঙ্গিণী হনহন করে আসে ওর পাশে।

ওকে দেখে তরঙ্গিণীও চমকে ওঠে,—কে?

—আমি।—কোনমতে বলতে পারে মৃগনয়নী।

তরঙ্গিণী সামনে এসে ওর হাত ধরে বলে,—তুই এখানে কি করছিস?.

—কিছু নয়। এই গরম লাগছিল তাই দাঁড়িয়ে ছিলুম।

—পুঁটি কই?

—ভেতরে।

তরঙ্গিণী সন্দিগ্ধ চিত্তে বলে—কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলি?

—অনেকক্ষণ।

তরঙ্গিণী হঠাৎ হেসে বলে,—কাঞ্চনগাছের নিচে ভাই একটা লোককে দেখে ভ: পেলুম।

—তাই নাকি?—মৃগনয়নী যেন কিছু জানে না।

—কেন, তুই লোকটাকে দেখিসনি?

—দেখলুম ত একটা লোক গেল।

—দেখিছিস?—একটা ঢোঁক গিলে বলে তরঙ্গিণী।

—তোমাকেও দেখলুম গাছতলায়।

তরঙ্গিণী চোখ দুটো বড় বড় করে,—ওমা সে কিরে, গাছতলায় আবার ছিলু: কখন। হনহন করে বেরিয়ে এলুম।

—ওই মাস্টারের সঙ্গে তো কথা বলছিলে?

—ওরে বাস! কি মিথ্যুক রে বাবা!

মৃগনয়নী নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে কথা বলছিল, তরঙ্গিণীর এক গুরুতর অপরাধ ও জেনে ফেলেছে। এবার ওর রাগ হয়।—মিথ্যুক বোল না, বলছি, কর্তামাকে বলে দোব সব।

তারঙ্গিণীও চোখ পাকায়,—কি আবার বলবি শুনি? কি করিছি যে তুই বলবি

মৃগনয়নী রেগে চলে যায় কালাবাড়ী ছেড়ে।

তরঙ্গিণী ডাকে পেছন পেছন,—এই শোন। লক্ষ্মী বোনটি শোন।

মৃগনয়নী শুনবে না। ও শুধু যে রেগে গেছে তা নয়। রাগের ছুতো করে ও যা দেখেছে সেটা সবাইকে জানাতে চায়। ও সোজা দৌড়ে চলে যায় কর্তামা: ঘরে।

কর্তামা জপ সেরে উঠে এ বেলার রান্নার ব্যবস্থাটা করে দিচ্ছিলেন। ঠাকু: চারজন দাঁড়িয়েছিল সামনে।

মৃগনয়নী ছুটতে ছুটতে ঘরে আসে,—ওরে বাবা!

—কি হোল রে?—কর্তামা ওকে সস্নেহে কাছে টেনে নেয়।

—ও মাগো! গেছি!—মৃগনয়নী যেন খুব ভয় পেয়েছে।

—কি হোল?

ঠাকুরদের দিকে তাকিয়ে কর্তামা বলেন,—সরপুঁটি সরষে বাটা দিয়ে ঝাল কোর. ডালটা পাতলা করে করবে। বাচ্চারা ঘন ডাল খেতে পারে না।

ঠাকুররা চলে যায়।

মৃগনয়নী কর্তামার আঁচল ধরে বলে,—ভয়ে মরি কর্তামা। দয়াময়ী বাড়ীর কাঞ্চন গাছের তলায়—

—কিরে? কিছু অপদেবতা টেবতা?

—তাই ভেবেছিলুম, তারপর দেখি ইস্কুলের সেই নোতুন মাস্টার, ওই যে গান গায়।

—তোর কাছে এসে কিছু বলেছে?

—না, ওই মাস্টার দিদির সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করছিলো।

কর্তামা গম্ভীর হয়ে যান।

বয়েসটা মৃগনয়নীর কম নয় খুব। তার মুখে এ ধরণের কথাকে প্রশ্রয় দিতে চান না তিনি। একটু সময় চুপ করে বসে থেকে বলেন,—তুই যা, হৃদয়কে একবার পাঠিয়ে দে।

মৃগনয়নী বেরিয়ে আসে। হৃদয়দা ছিল গোয়াল ঘরে। ও হৃদয়দাকে বলে,—কর্তামা তোমাকে ডাকছে।

হৃদয়দা গরুর জাবনা দিতে দিতে বলে,—এখন যেতে পারব না।

—বারে, এক্ষুণি ডাকছে তোমায়।

—যাও এখন। খিঁচিয়ে ওঠে হৃদয়দা।

ও এমন সবাইকে খিচখিচ করে ওঠে। কর্তামাকেও সময় সময়।

কেউ কিছু বলে না। সবাই জানে যে ওর মত বিশ্বাসী আর কর্মঠ খানসামা আর দুটো নেই এ বাড়ীতে।

মৃগনয়নী চলে যায়।

হৃদয় হাতটা ধুয়ে গজ গজ করতে করতে কর্তামার ঘরের দিকেই এগোয়।

আড়াল থেকে দেখে মৃগনয়নী মুচকী হেসে চলে যায়।

হৃদয় আসতে কর্তামা গম্ভীর মুখে বলেন,—একবার ঘটক বাড়ী যাও, এক্ষুণি। বলবে কাল সকালেই আমি ডেকেছি। আর শোন, কর্তাকে একবার বলে যেও ভেতরে আসতে।

কর্তামার মুখের থমথমে ভাব দেখে হৃদয় আর কথা বলে না। চলে যায়।

চার

কিছুদিনের ভেতরই শোনা যায় বিয়ের সম্বন্ধ চলছে তরঙ্গিণীর আর পুঁটির। তিনটি ঘটক লাগান হয়েছে, বাড়ীতে আবার এক আনন্দের স্রোত বইতে থাকে। মা বলেন মেজমাকে, ছেলে কেমন?

মেজগিন্নী এক গাল পান চিবোতে চিবোতে একটু দোক্তা মুখে ফেলে বলে, তরুর বিয়েটা ভালই হবে শুনছি। ছেলের বাড়ী ঢাকায়, দুভাই, রেলে খুব ভাল চাকরি করে। নৈকষ্য কুলীন।

—আর পুঁটির?

—খোঁজ নেওয়া হচ্ছে, ছেলেটির বোধ হয় রণ্ডা দোষ আছে। তিনপুরুষে নাকি মেয়ে হয়নি ওদের ঘরে। আবার কেউ বলছে মেয়ে হয়ে মরে গেছে। যাই হোক না বাপু, ভঙ্গ বংশজ তো নয়!

—অত দোষ ধরতে গেলে আর চলে না।

সকলের মুখেই এখন বিয়ের কথা। বড়বৌ প্রথম খবরটা দিয়েছিল তরঙ্গিণীকে- বলি ও ঠাকুরকন্যা, নোতুন মানুষ আসছে যে।

—কে?

হাসতে হাসতে বলে বড়বৌ,—তোমায় নিতে।

—যাঃ! সত্যি।

তরঙ্গিণী নড়ে চড়ে বসে।

—তবে কি মিথ্যে বলছি! ছেলের নামটি বড় সুন্দর।

—কি?

—সুশীল।

—দুর্, বাজে নাম।

তরঙ্গিণী বসে বসে ঘুরে যায় এক পাক।

মৃগনয়নী মনে মনে হাসে।

পুঁটি বলে মৃগনয়নীকে, বড্ড ভয় করছে, ভাই, কি সব শুনছি।

—ভয় ভাঙবে লো ভাঙবে। আসুক আগে।

পুঁটি আর এক গেলাস জল খায়, আমার রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় না।

—কেনরে ?

—স্বপ্ন দেখি, পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছি।

—না। ও সব ই'য়ে কিছু নয়। বিয়ের পর ঠিক হয়ে যাবে।

পুঁটির চোখমুখ বসে যাচ্ছে দিন দিন।

তরঙ্গিণী সেদিন মুখটা কালো করে মৃগনয়নীর কাছে আসে।

—তোর সবনাশ হবে।

—কেন ?

—মিছিমিছি একটা মানুষকে তুই তাড়ালি।

—তা আমি কি কোরব। সেই তো চলে গেল।

তরঙ্গিণীর চোখদুটো ভিজে ভিজে লাগে,—তোর ভাল হবে না! শাপ লাগবে।

—লাগুক।

মৃগনয়নী গামছা শাড়ী নিয়ে ঘাটের দিকে এগোয়। সে কি করবে মাস্টারের যদি চাকরি যায় ? কর্তাবাবু তাকে ইস্কুলে রাখবে না। মৃগনয়নীর কি দোষ ? মাস্টারের জন্যে তরঙ্গিণীর দরদটা বড় আশ্চয লাগে।

ও একবার ঘাটে যাবার পথে বাবার ঘরে যায়। রামতারণ বসেছিলেন আকাশের দিকে তাকিয়ে।

—বাবা !

রামতারণ ফিরে তাকায়।

মৃগনয়নী কাছে এসে বসে,—কি কোচ্ছ বাবা ?

—আকাশটার কেমন রঙ হয়েছে দেখেচিস।

পশ্চিম আকাশের রক্তাভা লেগেছে সাদা মেঘের কিনারায়।

মৃগনয়নী বলে, আচ্ছা বাবা, কারো শাপ লাগে ?

রামতারণ মেয়ের দিকে তাকায়।

—কারো মনে খুব কষ্ট দিলে, নিজের মনে তার ধাক্কাটা সামলাতে হয় মা।

—ইচ্ছে করে যদি কষ্ট না দিই।

—তবে তো তোমার মনে তার ঢেউটা লাগবে না।

—শাপ মানে কি বাবা ?

—ঠিক করে ওর মানে বলা মুশকিল মা। ও গুলো মনের ব্যাপার। কেউ যদি একাগ্র মনে তোমার অকল্যাণ কামনা করে তোমার মনে তার একটা ধাক্কা লাগবে; তোমার মনই তোমার মঙ্গল হতে দেবে না।

—বুঝলুম না বাবা।

—বোঝবার কি দবকাব! কাউকে কখনও কষ্ট দিসনি, তাহলেই তে হোল।

রামতারণ আকাশের দিকে চোখ ফেরায়।

চলে যায় মৃগনয়নী। তরঙ্গিণীর কথায় ওর মনটা একটু খারাপ হয়ে যায়। কথাগুলে কর্তামাকে না বললেই হোত।

দিন দশেকের ভেতর শোনা যায় ঘটকরা আর একটি ছেলের খবর পেয়েছে ছেলেটি তেমন ভাল নয। থার্ড ক্লাস অব্দি পড়েছে। অত্যন্ত রুগ্ন মনে হয় দেখলে বাড়ীর অবস্থা তেমন ভাল নয়। মামাব বাড়ী মানুষ।

—তা হোক। ঘর কেমন?

—নৈকষ্য কুলীন। খুব নামকরা ঘর।—বলেন কর্তাবাবু।

ঘটক দাঁড়িয়ে আছে।

কর্তামা একটু হেসে বলেন,—তবে ও ছেলে হাতছাড়া করা যাবে না। নয়নীর বিয়ে ওখানেই দাও। ছেলেকে মানুষ করে দোব আমরা।

ঘটক বলে, কিন্তু বাড়ীঘর কিছু নেই যে।

—তা হলেই বা। আমরাই কিছু জমি দিয়ে এখানে বাড়ী করে দোব।

কর্তাবাবুও বলেন, তবে তাই হোক। তিন জনের একসঙ্গে বিয়ে হলে আমা খরচেরও কিছু সাশ্রয় হবে।

ঘটক রাজী হয়ে চলে যায়। আবার বাড়ীর ভেতর গুঞ্জন শোনা যায় মৃগনয়নী বিয়েও ঠিক হয়েছে।

মা বিষণ্ণ হয়ে পড়েন—ছেলেটি শুনলুম বড় রুগ্ন।

মেজগিন্নী হাসেন—তাছাড়া বিদ্যে-বুদ্ধিও তেমন নয় শুনলুম।

মা বলেন, নয়নীর বরাতটা ভাল নয়। আগাগোড়াই দেখেছি আমি। আ একটু দেখে শুনে দিলেই হোত।

—কুলিন ধুয়ে জল খাবে। শুনলুম নাকি খুব নাম করা বংশের ছেলে। সমাজে নাম হবে আমাদের।

—এর চেয়ে ওকে বেঁধে জলে ফেলে দিলেই হোত।

মেজগিন্নী বলেন, তা কেনগো? শুনলুম যে এখানে বাড়ীঘর করে দেবে। ছেলেকে আবার পড়াবে। চাকরি দেবে।

মা আর কথা বলেন না। মৃগনয়নীর সম্বন্ধ কারো মনঃপূত হয়নি এটা বোঝা যায়। তখন এ বাড়াতে কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। কারো ভাল লাগা না লাগার ওপর কাজ স্থির হয় না। কর্তাবাবু কর্তামার মতে সবাইকে চলতে হবে।

কর্তাবাবু রামতারণের মত নিলেন একবার। রামতারণ একটু হেসে বললেন,—তুমি যা করবে তার ওপর আমার আবার বলবার কি থাকতে পারে। তাছাড়া বোঠানের যখন মত।

দিন স্থির হয়ে গেল। ঘটকরা ব্যস্ত হয়ে উঠল আরও। গয়না গড়তে গেল তিন সেট। শাড়ী, ধুতি, কাজুই হাতা ব্লাউজ, সামিজ এলো। লেপ তোষক খাট তৈরি হোল বাড়ীতে। কলকাতায় খেমটা আর ঢপ্ নাচের বায়না হোল। জমিদার বাড়ীর যাত্রার দল তৈরি হতে লাগল। দু'রাত গাইতে হবে। নিমন্ত্রণে গাঁয়ে চলল বাড়ীর ছেলেরা। পত্র গেল দূর দেশে ধনী আত্মীয়দের কাছে। সমাজ নিমন্ত্রণ হোল। প্রায় দু'হাজার নিমন্ত্রিত আসবে। বহুদিন পর জমিদার বাড়ীর মেয়ের বিয়ে। চারদিকে সোরগোল পড়ে গেল।

ক্রমশঃ দিন ঘনিয়ে এলো। মৃগনয়নী সব শুনল। আনন্দ হোল খুব, কিন্তু সবাই যখন ফিসফিস করতে লাগল,—এই মেয়েটারই বরাত খারাপ। একটা ঘাটের মড়ার মত রোগা বর জুটছে।

মৃগনয়নীর আনন্দ ভাবাবেগে থমকে গেল। এর ওর দিকে তাকাল ফ্যাল ফ্যাল করে।

তরঙ্গিণী টিপ্পনি কাটতে ছাড়লো না—দেখলি শাপ লাগল কি না?

কেমন বিরস হয়ে গেল মৃগনয়নীর মন। সত্যিই কি যে আসছে, সে এত রোগা! এত গরীব! সত্যিই কি শাপ লাগল? বোকার মত বিভ্রান্ত মনে এ-কোণে ও-কোণে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

পুঁটির কাছে যেতে, ও বললে,—বদল করে নে না হয়! আমার জন্যে যেটি, সেটি তো শুনেছি গাব গাছের মত মোটাসোটা। আমার ভাই ভয় করছে।

এক গেলাস জল খেয়ে ফেললে পুঁটি। মৃগনয়নী কথা বললো না। কথা বলতেও যেন ক্লান্তি আসে। চুপ করে এক কোণে বসে থাকতে ইচ্ছে হয়।

বিয়ের দিন দু খানা চার ঘোড়ার গাড়ী সাজান হোল। একটিতে তরঙ্গিণীর বর। আরেকটিতে পুঁটির।

জমিদার বাড়ীর হাতীটি সাজান হোল, সেটিতে আসবে বনবিহারী—মৃগনয়নীর বর। সেই সব চেয়ে বড় কুলীন, তাই বোধকরি তার ব্যবস্থা আলাদা।

বর এলো। এলো বরযাত্রীরা শ' দেড়েক। বিরাট আয়না মহলে থাকবার ব্যবস্থা হোল বরযাত্রীদের। তোষাখানা ভরে গেল খানসামায় আর লেঠেল সদারে।

সন্ধ্যা উতরে গেল। রাত্রি সাড়ে আটটায় হঠাৎ বাড়ীতে বিরাট সোরগোল। সর্বনাশ হোল বুঝি! হায় হায় শব্দ!

দীনবন্ধু কবিরাজ ছুটে এলেন। মৃগনয়নীর বর বনবিহারী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

কেউ বলছে,—নাড়ী নেই হয়ে গেছে। কেউ বলছে,—সব শেষ। সাদা হয়ে গেছে দেখে এলাম।

মৃগনয়নীকে সাজাচ্ছিল মেয়েরা। সাজান বন্ধ করে যে যার ছুটে বেরিয়ে গেল।

মৃগনয়নীর মুখটা নিচু হয়ে গেছে, প্রায় কোলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। সারাদিন উপোসে মাথাটা ঝিমঝিম করছে। একভাবে বসে আছে মৃগনয়নী। চোখের জলে গাল ভেসে গেছে। ধুয়ে গেছে চন্দন কুঙ্কুম।

হঠাৎ মাথায় ওর একখানি ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে ও মুখ তুলল।

বাবা। রামতারণ।

—যাচ্ছিলাম এখান দিয়ে। ভাবলাম দেখে যাই কি হোল তোর?

—কিছু তো হয়নি বাবা!—মৃগনয়নীর গলার স্বর আটকে যায়। দর দর করে চোখের জল নেমে আসে।

রামতারণ মুখটা নিচু করে আস্তে বলেন,—ভয় নেই মা। আমি বলছি, তোর ভাল হবে।

মৃগনয়নী তাকায় বাবার দিকে। রামতারণ আর দাঁড়ান না। চলে যান যেমন এসেছিলেন।

একটু পরে মেয়েরা সব ঘরে আসে। বলে,—কি ফাঁড়া গেল বাপু।

কেউ বলে,—বোধহয় হিষ্টিরিয়া আছে!

একজন বলে গলাটা নামিয়ে—কনের এমন বরাত দেখিনি জন্মে।

মৃগনয়নী স্থির হয়ে বসে থাকে। বাবার কথাটা কানে বাজে,—ভয় নেই মা। আমি বলছি, তোর ভাল হবে।

বিয়ের সময় হয়ে আসে। পিঁড়িতে গিয়ে বসতে হয় ওদের। পিঁড়িতে যাবার আগে পুঁটি কাঁদতে থাকে।

তিন কন্যাকেই ধরে নিয়ে আসছিল। মৃগনয়নীর পাশে ছিল পুঁটি। মৃগনয়নী একবার তাকাল পুঁটির দিকে। পুঁটির মুখখানা সাদা হয়ে গেছে। চোখ দুটো একদিনেই বসে গেছে।

পুঁটি মৃগনয়নীর কানের কাছে মুখটা নিয়ে আসে। বলে ফিসফিস করে,—গলাটা শুকিয়ে ভাই কাঠ হয়ে গেছে।

মৃগনয়নী কথা বলে না। ও জানে ভয় পেলেই পুঁটির গলা শুকোয়। কিন্তু আজ তো জল খাবার উপায় নেই।

পিঁড়িতে বসে তরঙ্গিণী তেরছা দৃষ্টিতে তাকায় ওর বরের দিকে। সামনের পিঁড়িতে সুস্পষ্ট সুন্দর যুবক সুশীলকুমার। সুশীলকুমার হাসে একটু। তরঙ্গিণী রূপসী। সুশীলকুমার খুব খুশী।

তরঙ্গিণীর চারপাশে রূপসীদের ভিড়। আইবুড়ো মেয়েরা এদিকেই ঝুঁকেছে বেশী। খিলখিল করে হেসে ওঠে ওরা। ওমা বর বৌতে কেমন চোখাচোখি হচ্ছে দেখ।

তরঙ্গিণী মুচকি মুচকি হাসে।

মন্ত্র পাঠ হচ্ছে। পুঁটি যেন পিঁড়ির ওপর নুয়ে পড়েছে পাতলা একটি কাঠির মত। পুঁটির বরটি জোয়ান গম্ভীর, নীলকান্ত নাম। এখানেও ভিড় আছে কিছু।

ভিড় বেশী নেই মৃগনয়নীর পিঁড়ির কাছে। বনবিহারী রোগা, পিঙ্গলাক্ষ। ধবধবে ফরসা। মাঝে মাঝে পিঁড়িতে বসে ঝিমিয়ে পড়ছে। দুজন লোক দুপাশে বরকে ধরে আছে। পাছে আবার অজ্ঞান হয়ে যায়।

মৃগনয়নী কালো মেয়ে। তার ওপর মুখখানা আজ ওর ভার ভার। সবটুকু আনন্দই যেন মুছে গেছে ওর মুখ থেকে।

এ পাশটায় বিয়ের আনন্দও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। বর্ষীয়সী দু একটি মহিলা আছেন। বিধবাও দু চারজন। কয়েকজন পুরুষ, বরযাত্রী গুটিকয়েক। মন্ত্রপাঠ চলেছে।

ওদিকে চলেছে নিমন্ত্রিতদের নিয়ে বিরাট ব্যাপার। গ্যাসের আলোয় ভরে গেছে বিরাট চত্বর। দেখা যায় শুধু মানুষের মাথা। বসে গেছে সব সারি সারি। সামনে পাতা। থাকে থাকে লুচি পড়ছে পাতে। বিশ ত্রিশ খানা লুচি গাঁয়ের মানুষের কাছে অতি লঘু আহার। প্রচুর খাওয়া। আরও প্রচুর দেওয়া। মহোৎসব চলেছে।

দলে দলে মানুষ বেরিয়ে যায়। আবার দলে দলে ঢোকে। বিরাম নেই পরিবেশনে পরিশ্রান্ত হচ্ছে একদল, আর একদল ঝাঁকা আর বালতি হাতে এগিয়ে আসছে।

বাইরের ঘরে ফরাসের ওপর বসে কর্তাবাবু গড়গড়ার নল মুখে করে বসে আছেন কপালে কয়েকটি কুঞ্চিত রেখা। সম্মানিত অতিথি কেউ এলে নিজেই একটু হেসে গড়গড়ার নল ঠোঁট থেকে নামাচ্ছেন। আবার তামাক টানছেন।

খালি গায়ে মোটা একগাছা পৈতে। আর হাতের কনুয়ের ওপর সোনার তাবিজ। বড় বড় চোখদুটি চিন্তায় দায়িত্বে রাঙা হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে এক একটি ঢেকুর তুলছেন।

সমগ্র ব্যাপারের বিশালতা আর গাম্ভীর্যের জীবন্ত প্রকাশ এই কর্তাবাবু। তাঁকে দেখলেই যেন উৎসবের মহত্ত্ব আপনা আপনি ধারণা করা যায়।

রাত বেড়ে চলেছে। ক্রমে কোলাহল ক্ষীণ হয়ে এলো। উৎসবের উজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে এলো। কর্তাবাবু বাইরে থেকে ভেতরে এলেন।

নিজ হাতে তিনি কিছুই করেননি, কিন্তু তিনিই সব করেছেন। বিরাট দায়িত্ব তীক্ষ্ণ বোধশক্তি এনে দেয়।

কর্তাবাবু কখনও নিজে কিছু করতেন না, কিন্তু সবাই বলত, তাঁর নাকি একলক্ষ চোখ। মনকে তিনি ছড়িয়ে রাখতেন সব দিকে। যেদিকে নজর পড়ত, এতটুকু ত্রুটি ধরতে তাঁর কখনও ভুল হয়নি। এতবড় একটি ব্যক্তিত্ব মৃগনয়নীর জীবনে আর চোখে পড়েনি।

ভেতরে আসবার সময় তাঁর নজর পড়ল সর্বত্র। বাইরে দুটি লোক বসেছিল একটি থামের আড়ালে। তারাও তাঁর চোখ এড়ায়নি। তাদের খাবার ব্যবস্থা করে ভিতরে ঢুকলেন। মেয়েরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

মৃগনয়নীর কাছেই প্রথম গেলেন কর্তাবাবু।

—জামাইকে কিছু খেতে দাও।

বনবিহারীর বিশুষ্ক পাণ্ডুর মুখ দেখে তিনি এ আদেশ করেছিলেন।

গেলেন পুঁটির কাছে। পুঁটির দিকে তাকিয়ে বললেন, ওর ঘোমটা যেন কম হয়।

পুরুতের প্রতি আদেশ। আজকে হোমের আগুনের তাত পুঁটি সইতে পারবে না।

তরঙ্গিণীর কাছে গেলেন। খুশী ভরা চোখে কর্তাবাবুর দিকে তাকাল তরঙ্গিণী।

কর্তাবাবু কিছু বললেন না। নিজের ঘরে গেলেন।

নায়েব অপেক্ষা করছে. সিন্দুক খুললেন কর্তাবাবু। কালকের ব্যবস্থা করে রাখতে হবে আজ।

রাত আরও বাড়ল, বাসরে গেল বর কনে নিয়ে।

তরঙ্গিণীর বাসরে মেয়েদের ভিড় বেশী। ফুলে ফুলে ভরে গেছে শয্যা। আশে পাশে সুবাস ছড়ানো বেনারসীর জৌলুস। রূপবতীদের চোখে মুখে হাসির বাঁধ ভেঙে পড়েছে।

সুশীলকুমারের কোলে বসিয়েছে ওরা তরঙ্গিণীকে। তরঙ্গিণী এলোমেলো হয়ে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছে।

সুশীলকুমার রসিক। এক সম্পর্কীয়া শ্যালিকাকে বাহুবন্ধনে আনতে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছে। তরঙ্গিণী সেই পড়শী বোনটিকে আরও দূরে ঠেলে দিল।

পুঁটির বাসরে গান শোনা গেল। কলহাস্য কম। পুঁটি ভয়ে জড়সড়। নীলকান্ত গম্ভীর। গান ছাড়া আর কিই বা হতে পারে।

মৃগনয়নীর ঘরে ভিড় কম। মৃগনয়নী বসে আছে বিছানার এক কোণে। বনবিহারী শুয়ে পড়েছে।

বৃদ্ধা কয়েকজন এসে বলে গেছেন, জামাইকে বিরক্ত কোর না। ও অসুস্থ।

দু একজন বিবাহিতা মহিলা আছে বাসরে। তারা শুধু পাহারায় আছে।

একজন বললে মৃগনয়নীকে,—তুইও শুয়ে পড না?

মৃগনয়নী চুপ করে রইল।

জন ছয়েক মহিলা। দুজনের কোলে আবার দুটি সন্তান। পরিবেশটি গম্ভীর, কিছুটা বা ম্লান। সকলের মনেই একটি কথা ঘোরাফেরা করছে মেয়েটার বরাত ভাল নয়। ঘাটের মড়ার সঙ্গে বিয়ে দিলি গা! এতো রোগের ডিপো!

রাত তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর। পাশের দু ঘরের বাসর তখনও নিস্তব্ধ হয়নি। মৃগনয়নীর ঘর স্তব্ধ হয়ে গেছে।

মহিলা কজন এধারে ওধারে ঘুমে ঢলে পড়েছে। বনবিহারী ঘুমোচ্ছে। মৃগনয়না জেগে বসে আছে তখনও। বনবিহারীর দিকে তাকাচ্ছে বারে বারে। রোগা ফরসা একটি অল্প বয়েসী পুরুষ। এর সঙ্গেই আজ থেকে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বাঁধা পড়ল।

একে বড করতে পারলে সে বড হবে। এ ছোট থাকলে, তাকে আজীবন ছোট হয়ে থাকতে হবে।

শরীরে তো কিছুই নেই। কয়েকখানি হাড। এই হাড কখানি সম্বল করে যাত্রা শুরু হোল আজ।

জীবনের এই আশ্চর্য পরিহাসকে মেনে নিতে হবে। মাথা পেতে নিতে হবে সব অভিশাপ।

সবাই কানাকানি করছে তার ভাগ্য নেই। সে নিজেও জানে। তাই হয়তো বা আজ জীবনের কতকগুলো গভীর সত্য তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সত্যগুলো খুশির বন্যায় ভেসে যায় নি।

চোখদুটো জলে ভরে ওঠে ওর। বনবিহারীর রোগা পা দুখানির ওপর হাত রাখে মৃগনয়নী, একটু চাপ দেয়।

কে? চমকে ওঠে বনবিহারী।

হঠাৎ চমকে উঠেই গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে বেঁকে যায় ধনুকের মত।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায় মৃগনয়নী। বনবিহারী বেঁকে বেঁকে এধার ওধার করে।

ভয়ে লজ্জায় মৃগনয়নী একজন মহিলাকে ধাক্কা দেয়।

তিনি উঠে চোখ মেলে বনবিহারীর অবস্থা দেখে চেঁচিয়ে ওঠেন।

দেখতে দেখতে ঘরে ভিড হয়ে যায়। চোখে মুখে জল ছিটোয়। বাতাস করে।

আবার অজ্ঞান হয়ে পডেছে জামাই। ডাক্তারবাবু আসেন। হিস্টিরিয়া আছে বনবিহারীর।

ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠে বনবিহারী, ভিড পাতলা হয়ে আসে। তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ফিকে হয়ে এসেছে পুব আকাশের অন্ধকার।

কর্তামা এসে বলে গেলেন,—জামাইকে পশ্চিমের ঘরে নিয়ে শুইয়ে দাও, ঘুমোক।

লজ্জায় ভয়ে হতাশ হয়ে বসে আছে মৃগনয়নী। ওরও মাথাটার ভেতর কেবল ঝিমঝিম করে। তাকায়। চোখে ভাল দেখতে পায় না। শক্ত হয়ে বসে থাকে তবু।

বারবার মনে করবার চেষ্টা করে। সব অভিশাপ তাকে মাথা পেতে নিতে হবে। কিছুতেই হেরে যাবে না সে। কিছুতেই না।

পুব আকাশটা রাঙা হয়ে উঠেছে, বাসর শেষ হোল।

ভোরে সূর্যপ্রণাম করতে নিয়ে যায় মেয়েরা বর কনেদের।

পাঁচ

আগাগোড়া এক দুঃস্বপ্নের মত কেটে গেল মৃগনয়নীর দুটো দিন।

তরঙ্গিণী আর পুঁটি আজ যাবে না। মৃগনয়নীর মামাশ্বশুর এসেছিলেন বরকর্তা হয়ে। তিনি জানালেন,—বনবিহারী আজই যাবে। মৃগনয়নীকে আজই যেতে হবে শ্বশুরবাড়ী।

শ্বশুরবাড়ী ভাবতেই মৃগনয়নীর মনে প্রথমে একটা আতঙ্ক এলো। তার এক ভাসুর। এক দেওর। আরও কানে এলো সধবা একটি ননদ আছে সংসারে। বিধবা শাশুড়ী আছেন।

মনে মনে কল্পনা করবার চেষ্টা করে মৃগনয়নী শ্বশুরবাড়ীর চেহারাটা। সবাই যদি এর মতো রুগ্ন হয়? সবাই যদি তার ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে?

অনেক জোড়া ক্রুদ্ধ বিরূপ চোখ ওর মনের ওপর ভেসে ওঠে। ও যেন দেখতে পায় ঘৃণা অবহেলায় মেশানো কতকগুলো দৃষ্টি।

আতঙ্কে ঘেমে উঠল মৃগনয়নী।

বাড়ীটা কেমন কে জানে? হয়তো খুব ছোট। বড়ও হতে পারে। এত মানুষ যে সংসারে, সেখানে ছোট বাড়ী কেমন করে হবে?

দরিদ্রের ঘর। আগাগোড়া শুনে এসেছে ও। দরিদ্র মানে কেমন ঠিক আন্দাজ করে উঠতে পারে না।

আশৈশব স্বাচ্ছন্দ্যে থেকে ওর ধারণাটা এর চেয়ে অনেক নিচে নামতে পারে না। দরিদ্র মানে অনেক বাড়তি টাকা নেই। অনেক সজ্জা অলংকার নেই।

তা না থাক। মৃগনয়নী অলংকার চায় না। অতিরিক্ত সজ্জায় রুচি নেই ওর। একজনও কি বন্ধু পাওয়া যাবে না সেখানে, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ননদটি তো ভাল হতে পারে। হতে পারে দেওরটি ভাল। কোন প্রতিবেশিনীর বন্ধুত্ব পাবার সুযোগও থাকতে পারে।

ধীরে ধীরে মন ওর শক্ত হয়ে আসে। যেখানে যেতেই হবে সেখানে যাবার জন্যে রীতিমতো প্রস্তুত করে নেয় নিজেকে।

দুপুরের খাওয়া মিটে যায়। দুপুর গড়িয়ে গেছে।

সবাই এখন মৃগনয়নীর যাত্রার জন্যে ব্যস্ত। মেয়েরা তোরঙ্গ গোছাতে লেগেছে মৃগনয়নাকে সাজাতে বসেছে কয়েকটি মেয়ে। কয়েকটি জোয়ান ছেলে বিছান বাঁধছে।

মুখরা প্রতিবেশী মেয়েরা মুখে পান ফেলে ওর শ্বশুরবাড়ীর আলোচনায় মেতে আছে। ওর মাকে বলছে একজন,—আজই না গেলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হোত?

মা বলে, ওর মামাশ্বশুর বললেন।

—বললেই হোল! কর্তাবাবু তো বলতে পারতেন?

—কর্তার কথাও শোনেননি।

—সে কি গো!—গালে হাত দেন—কি গোঁয়ার বেহারা! এমন গোঁয়ার গুষ্টির হাতে পড়ে মেয়ে তোমার বাঁচলে হয়।

—সবই বরাত মা।

—এবার ঘুরে এলে আর ছেড়ো না। জোর করে মেয়ে রেখে দেবে।

মা হেসে পানের পিক ফেলে বলে—তা কি হয়, মেয়েকে যে পর করে দিইছি। তারা বাঁচালে বাঁচবে। তারা মারলে মরবে।

মৃগনয়নীর কানে সব কটি কথা এসে পৌঁছায়। একটি মেয়ে চুল বাঁধছিল ওর। সে দেখতে পায় না যে মৃগনয়নার পাতলা ঠোঁট দুটি কঠিন হয়ে উঠেছে।

মৃগনয়না মনে মনে শক্ত হয়ে উঠেছে। একটু বাঁকা হাসি দেখা যায় ওর ঠোঁটে। তারা বাঁচালে বাঁচবে। তারা মারলে মরবে।

মায়ের শেষের কথা কটি যতখানি নিষ্ঠুর, ততখানি সত্য। কিন্তু এই দুটি পথ ছাড়া আর কি কোন পথ নেই? নিশ্চয় আছে। মৃগনয়নী তার সন্ধান জানে না। তার মা মাসীরাও জানে না। এক অনিশ্চিত ভাগ্যের হাতে মেয়েকে ছেড়ে দেওয়া। চিরদিন ধরেই নাকি চলে আসছে। যা চিরকাল চলছে, মৃগনয়নীর পক্ষে তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

তবু ভয় পাবে না ও। তার ভাগ্য খারাপ, তাই ভয় পাওয়া তার চলবে না। ভয় মানে মৃত্যু।—বাবার কাছে শুনেছে মৃগনয়না।

ছোটবেলা থেকে ভীতু ছিল ও। একবার গাব গাছের নিচে মাথাকাটা একটি দেহ দেখেছিল মৃগনয়না। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। মৃগনয়নী ফিরছিল অন্য তরফ থেকে বেড়িয়ে।

গাবগাছের নিচে বহুকাল থেকেই একটি পুরোনো ইঁদারা মজে বজে গেছে। একা একা আসতে ওর কেমন একটু ভয় ভয় করছিল। ও পরিষ্কার দেখেছিল ওই পুরোনো ইঁদারা থেকে উঠলো একটি দেহ, তার মাথা নেই। ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ও একছুটে বাইরের ঘরের ভেতর ঢুকে বাবার কোলের উপর পড়ল।

রামতারণ জপ করছিলেন, জপ বন্ধ করে বললেন,—কি হোল মা?

—কন্দকাটা ধরতে আসছে।

—কোথায়?

—ওই গাবগাছ তলায়।

—তা এলেই বা!—হেসে বলছিলেন রামতারণ।

বাবার পূর্ণ নির্ভয় স্বরে ভয় ওর কোথায় উড়ে গেল।

রামতারণ বললেন—চলো তো তাকে দেখে আসি।

—ওরে বাবা! পেছোয় মৃগনয়নী।

—আমার হাত ধরে এসো। রামতারণ ওর হাত ধরে সেই ইঁদারার কাছে যান।

—ওই ত। চেঁচিয়ে ওঠে মৃগনয়নী।

সত্যিই একটি মস্তকহীন মূর্তি দেখা যায়।

রামতারণ বলেন, চেঁচিও না। ভয় পেও না। দাঁড়াও এখানে।

তারপর নিজে সেই মূর্তিটির হাত ধরে মৃগনয়নীকে ডাকেন—দেখবে এসো।

মৃগনয়না ধীর পায়ে এগিয়ে যায়। দেখতে পায় বিরাট লক্ষ্মীপ্রতিমার খড়বাঁধা মূর্তি। মাথার দিকে খড় নেই।

—একে দেখে তুমি ভয় পেয়েছিলে। হাসতে হাসতে রামতারণ ওকে নিয়ে আসেন ভেতর বাড়ীর দিকে। আসতে আসতে বলেন—ভয় পেয়ো না। ভয় পাওয়া মানে মরা। ওর চেয়ে পাপ আর সংসারে নেই।

বাবার সে কথা আজও ভোলেনি মৃগনয়নী। ভয় পাওয়া মানে মরা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দেখেছে মৃগনয়নী সংসারে খড়বাঁধা মূর্তি দেখে অকারণে ভয় পাওয়াই মানুষের স্বভাব। ভয়ের জন্ম ভেতরে। মনে ভয় না থাকলে, বাইরের কিছুই মানুষকে ভয় দেখাতে পারে না।

শ্বশুরবাড়ীর চিন্তার যে ভয় সেটাও হয়তো খড়বাঁধা প্রতিমাকে ভূত কল্পনা করে অহেতুক ভয়।

মনকে বোঝাবার চেষ্টা করে মৃগনয়নী। যা হবার তাকে আটকাবার যখন উপায়

নেই, তখন ভয় পেয়ে মিছে পাপের বোঝা ও বাড়াবে না। এতক্ষণে নিজের শক্তির সন্ধান পায় মৃগনয়নী। স্থির হয়ে বসে থাকে।

যাবার সময় হয়ে এলো। উৎসবের শেষে যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল সমস্ত বাড়ীখানা। এবার আর একবার সবাই সজাগ হয়ে উঠলো।

বরযাত্রীরা রওনা হয়ে গেছে, সঙ্গে গেছে বরকন্দাজ। পাল্কী এসেছে। মালপত্র সব চলে গেছে।

মৃগনয়নীর কাছে এসেছে পুঁটি। পুঁটির সিঁথির সিঁদুরটা জলজ্বল করছে মুখখানা শুকিয়ে গেছে—মুখে হাসি নেই। বললে মৃগনয়নীকে—ভয় করছে না?

মৃগনয়না একটু হাসবার চেষ্টা করে কিন্তু চোখদুটো জলে ভরে ওঠে। ধরা গলায় বলবার চেষ্টা করে,—না।

পুঁটি ওর হাতখানা ধরে, আমার ভাই ভয় করছে।

ভয় পাওয়া মানে মৃত্যু।—বলতে ইচ্ছে হয় মৃগনয়নীর। কিন্তু কথা বলতে পারে না। বলতে ইচ্ছে হয় না।

তরঙ্গিণীও এসেছে। সিঁথির সিঁদুরের চেয়েও উজ্জ্বল ওর মুখের হাসি।

মৃগনয়নীর চোখে জল দেখে ওর মুখের হাসিও মিলিয়ে যায়। ঘরের বাতাস কেমন কান্নাভরা মনে হয়।

মৃগনয়নী কর্তামাকে প্রণাম করে। কর্তামা চোখ মোছেন আঁচলে। মাকেও প্রণাম করে। মা ওকে জড়িয়ে ধরে।

এ এক দুঃসহ বিচ্ছেদ, তবু অন্তরের আনন্দের আশীর্বাদের স্রোত বয়ে যায় সকলেরই মনে। ও সুখী হোক। আহা ওর কপাল ভাল নয়। ভেতরের প্রণাম চুকিয়ে বাইরে আসে। কর্তাবাবুকে প্রণাম করতে হয়। কর্তাবাবু তাকালেন। রায়ের এই শ্যামলা মেয়েটা। চলে যাবে আজ।

কর্তাবাবু শুধু বলেন,—অসুবিধে কিছু হলে হৃদয়কে দিয়ে জানাস।

ঝি যাচ্ছে। হৃদয়ও যাচ্ছে মৃগনয়নীর সঙ্গে। ওকে পৌছে দিয়ে চলে আসবে। ওর শ্বশুরবাড়ী দুদিন থাকতেও পারে। ওকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে হৃদয়। দেখে আসবে ওর শ্বশুরবাড়ীর হালচাল। এসে সংবাদ দেবে।

একজনকে দেখা যাচ্ছে না এই কান্নার অভিসারে। সে রামতারণ।

মৃগনয়নী বাবার ঘরের দিকে এগোয়। রামতারণ জপ করছিলেন বসে বসে। ওকে এগিয়ে আসতে দেখে একটু হাসলেন। অতি প্রশান্ত হাসি। শীতল প্রসন্নতায় ভরা।

বাবার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতে গিয়ে মৃগনয়নী আর সামলাতে পারলো না নিজেকে। কেঁদে ভেঙে পড়ল।

—ওঠো। ওঠো। কেঁদো না।—রামতারণ ওকে তুলে ধরলে নিরুদ্বেগ আদরে। মৃগনয়নীর গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে।

এই আর একবার তার বড্ড ভয় করছে এক অজানা সংসারে প্রবেশ করতে। তার যে বরাত খারাপ সবাই বলে।

রামতারণ ওর দিকে তাকিয়ে আবার একটু হাসলেন, বললেন, একটা কথা মনে রাখতে পারবে? শান্তি যদি চাও মা, নিজের দোষ দেখো। অন্য কারো দোষ দেখো না।

মৃগনয়নী যেন মন্ত্র পেলো। দীক্ষা মন্ত্র। নোতুন সংসারে যাবার আগে দীক্ষা হোল তার। চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল মৃগনয়নী।

বনবিহারীও এসেছে। প্রণাম করল রামতারণকে। রোগা ফরসা ছেলেটি। পিঠে হাত বুলিয়ে রামতারণ চুপ করে রইলেন। জপে বসলেন আবার।

ওরা এসে পালকিতে উঠল। পালকির দরজা আধখানা ভেজিয়ে দেওয়া হোল।

সবাই দাঁড়িয়েছে বাইরে। পুঁটি, তরঙ্গিণী, মা, মাসী, জেঠী সবাই। পালকি এগিয়ে যাচ্ছে। এক উচ্ছ্বসিত কান্নার শব্দে সবাই তাকিয়ে দেখল, তরঙ্গিণী কাঁদছে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে। আশ্চর্য!

ছয়

বরযাত্রীরা আগেই খবর দিয়েছে বরকনে আসছে রেল স্টেশন থেকে পেছনের গরুর গাড়ীতে। মৃগনয়নী যখন গরুর গাড়ী থেকে নামল, দেখল বউবরণের জন্য দাঁড়িয়ে আছে অনেক অবগুণ্ঠনবতী, অনেক বৃদ্ধা, আরও অনেক মানুষ। জমিদার বাড়ীর মেয়ে বিয়ে করে এসেছে বনবিহারী। তাই যেন মেয়ে দেখবার কৌতূহল সবায়ের।

মৃগনয়নীকে হাত ধরে নামাল গাড়ী থেকে একটি বউ। বউটির দিকে ভাল করে তাকাল ও। ভাসা ভাসা দুটি চোখ, রঙটা মিশ কালো। মুখভরা হাসি। বললে,—এসো ভাই।

বড় মধুর লাগলো আহ্বানটি। এই মৃগনয়নীর মেজ-জা—সরলা।

নামল মৃগনয়নী ধীর পায়ে। বরণডালা নিয়ে এলো সধবার দল। ঘরে তুললে ওদের।

ফরসা রোগা এক বিধবা এলেন কাছে। সেই কালো বউটি বললে,—মা। প্রণাম করো।

এই শাশুড়ী। মৃগনয়নী ভাল করে তাকাল। আশীর্বাদ ভরা চোখ দুটো নিয়ে বললেন মা,—আহা বড় ভাল বউ হয়েছে। দেখে বুঝতে পারছি।

প্রণাম করল মৃগনয়নী।

—এই ঠাকুরঝি।—বললে আবার মেজ-জা। তাকাল মৃগনয়নী।

মুখখানা অস্বাভাবিক লম্বা, তার ভেতর চোখদুটো বড় বড়—যেন জ্বলছে। বিঁধে পড়ছে। মৃগনয়নীর চোখে সে চোখ যেন ছুঁচ বেঁধালো। চোখ নামাল মৃগনয়নী।

—দেখি বাছা ভাল করে আর একবার তাকাও তো। বলে উঠল মহিলাটি। বেশ শুনিয়ে শুনিয়েই বললে তারপর,—চোখটা যেন একটু ট্যারা-পানা মনে হোল কই গো বউ তাকাও না?

কানদুটো লাল হয়ে উঠল মৃগনয়নার। বেশ বড় বড় চোখ করে তাকাল।

—ও বাবাঃ। এ যে গিলতে আসছে! কি চাউনী রে বাবা! বলি ন'দাদা কি বাঘিনী ধরে আনলে না কি গো!

শাশুড়ী বলে উঠলেন,—আঃ! তুই এখান থেকে যা দিকি সুন্দরী।

ঠাকুরঝির নাম সুন্দরী। বড়ই মানানসই নাম। এত রাগেও হাসি পেল মৃগনয়নীর। পরে শুনেছিল ওর নাম শুধু সুন্দরী নয়—প্রমদাসুন্দরী।

মেজ-জা সরলা কানের কাছে মুখটা এনে বললে,—একে সামলে নিও ভাই। নইলে মুশকিল হবে।

তাকাল মৃগনয়নী। হাসিভরা মুখখানি সরলার। রাগটা পড়ে গেল মৃগনয়নীর মুখ নিচু করলে।

প্রমদাসুন্দরী চলে গেছে। মায়ের কথায় নয়। সবাইকে নোতুন বউয়ের চোখের খবরটা জানাতে।

নোতুন বউয়ের প্রশংসা নিন্দে যা হবার গ্রামে দুচার দিনেই সেটা রটে যায়। রটনার মূলে কেউ কেউ থাকে। কিন্তু শুধু রটনায় সবাই সন্তুষ্ট হয় না। দলে দলে আসে রটনার সত্যকে যাচাই করে নিতে।

বেলা অনেকটা বেড়ে গেছে। এ বেলা পড়শিনীদের আসা আর সম্ভব নয়। বিকেলে সব আসবে। প্রমদাসুন্দরীর কথাগুলোও যাচাই হবে।

কিছুক্ষণের মত ছুটি। সরলা ওকে নিয়ে এল তার নিজের ঘরে। তোরঙ্গ খুলে শাড়ী বার করলো। নারকেল তেলের পাত্র এনে মৃগনয়নীর চুল খুলে নিজেই ওর চুলে তেল মাখাতে লাগল।

—আহা গো, চাঁদিটা দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। এত বেলা হোল। হবে না?

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে।

—চলো ভাই ঘাটে চলো। চান করে কিছু খেয়ে ঠাণ্ডা হও।

ঘাটে চললো মৃগনয়নী ওর সঙ্গে।

বাড়ীটা একবার দেখে নিল এতক্ষণে। তিনখানা টিনের ঘর। একটা মাঝারি উঠোন। একখানি রান্নাঘর—টিনের চালা এক কোণে।

—এও তো ছিল না। মামাশ্বশুর দিয়েছেন। এরা তো সব মামার বাড়ী মানুষ। ছোট বেলায় শ্বশুরঠাকুর মারা গেছেন। শাশুড়ী চার ছেলে এক মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী রইলেন। বাপের বাড়ীতে কত অত্যেচার সয়ে ছেলে কটিকে বড় করলেন। তারা আর এক সঙ্গে থাকতে চাইলে না। তাই মামাশ্বশুর এই বাড়ীখানা করে দিলে আর কিছু জমি লিখে দিলে শাশুড়ীর নামে। এতে কোন মতে চলে।

সরলা বলছিল মৃগনয়নীকে ঘাটে যেতে যেতে। ঘাটে গিয়েও বলতে থাকে।

—তার ওপর ননদ রয়েছে সংসারে। আট সতীনের ঘরে বিয়ে দিলে কুলীনের মেয়েকে। নন্দাই বিয়ে করে চলে গেল—শুধু কুল রক্ষে করে গেল। আর এলো না। তাইতো এখানে রয়েছে ও আমাদের জ্বালাতে। তা আর কোথায় যাবে বলো ভাই। তবে মাঝে মাঝে এত বাড়াবাড়ি করে। পরশু তো আমায় গালে এমন দুটো আঙ্গুলে ঠোনা মারলে ভাই। দেখো গালটা দেখো।

চমকে উঠলো মৃগনয়নী। মারলে! তাকেও মারবে নাকি?

—বড় ভাসুর তো বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ী ঘরজামাই হয়ে আছেন রাজার হালে।

—তাই নাকি? "এতক্ষণে একটা কথা বলতে পেরেছে মৃগনয়নী।

—হ্যাঁ গো! সে এ বিয়েতেও আসেনি। শ্বশুরবাড়ী থেকে ছাড়ে না। শুনি নাকি জোতদার শ্বশুর। মেলা টাকা। মেজ ভাই, ন'ভাই, আর ছোট। দেওরটির কি রাগ! দুদিন দেখলে টের পাবে।

—খুব রাগী বুঝি? মনে মনে আতঙ্কিতা হলেও মুখে একটু হাসে মৃগনয়নী।

—ভীষণ। স্নান সারা হয়ে এলো ওদের।

সরলা বলে,—দুদিনেই সব দেখতে পাবে। চলো ভাই কথায় কথায় অনেক বেলা হোল। ওরা ঘাট থেকে বাড়ীর পথ ধরে।

প্রমদাসুন্দরী এতক্ষণে পাড়া টহল দিয়ে ফিরেছেন কিনা কে জানে। ঘাটে দেরী হোল, আবার খেঁকিয়ে না উঠে। সরলার অমন হাসি-হাসি মুখখানিও একটু শুকিয়ে যায় যেন। লক্ষ্য করে মৃগনয়নী। কিছু বলে না।

ওরা সটান সরলার ঘরে চলে আসে। ঘরে বসে চুল আচড়ে, সিঁদুর পরে, শাড়ী পালটে আসতে আসতে বেলা বেড়ে যায় অনেক। মাথার ওপর চনচনে রোদ্দুর। মৃগনয়নীকে নিজের ঘরে বসিয়ে সরলা রান্নাঘরের দিকে এগোয়।

এসে দেখে প্রমদাসুন্দরী মাছের ঝাল চাখছে। রাঁধছে আজ পাশের বাড়ী মঙ্গলার মা। এ বাড়ী ও বাড়ী রাঁধুনীর কাজ করেই বেড়ায় সে।

—আর দুটো মাছ দাও ঠাকুরঝিকে।—সরলা বলে মঙ্গলার মাকে।

প্রমদাসুন্দরী একটু খুশী হয়, মুখে বলে,—থাক্, আর লাগবে না। শুনে ঝালে একেবারে আচারের মত লাগছে। খাসা রেঁধেছে। যাই বলো মেজ-বৌ, তোমাদের মাছের ঝাল মনে হয় যেন ফ্যান দিয়ে রেঁধেছ, এত পানসে হয়। য বল... মুখের ওপর।

ও কথার জবাব না দিয়ে সরলা বলে,—দাও আর দুটো মাছ।

মঙ্গলার মা আর দুটো মাছ চাখতে দেয় প্রমদাকে। প্রমদা খুব খুশী।

সরলা এই ফাঁকে বলে,—ঠাকুরঝি নোতুন বৌকে একটু জল খেতে দোব। সন্দেশের হাঁড়িটা কোথায়?

—হাঁড়ির খবরে তোমার কি দরকার। একি নবাবের সংসারে এয়েচে যে জল খাবার খাবে? দাদারা খেতে আসবে এখুনি। একবারে ভাত খেয়ে নেবে।

মুখখানি ম্লান করে চলে যায় সরলা শাশুড়ীর ঘরে। শাশুড়ী বসে মালা ফেরাচ্ছিলেন।

—কি বৌমা?

সরলা বলে নোতুন বৌয়ের জলখাবারের কথা।

শাশুড়ী মালা রেখে ওঠেন—ঠিক বলেছো মা। বড়ঘরের মেয়ে, এত বেলা অবধি না খেয়ে থাকা অভ্যেস নেই। আমি সন্দেশ দিচ্ছি দুটো।

প্রমদার বিছানা আর চৌকী এই ঘরেই। তার বিছানার পিছন থেকে হাঁড়ি বার

করে সন্দেশ বার করে দেন শাশুড়ী। সরলা সন্দেশ দুটি হাতে নিয়ে ছুটে ওর নিজের ঘরে চলে আসে।

এসে মৃগনয়নীর মুখে একটা সন্দেশ গুঁজে দেয়,—খাও, খেয়ে নাও দিকি। জল দিচ্ছি। সরলার হাসিভরা মুখখানির দিকে আবার তাকায় মৃগনয়নী, ভয় তাহলে ওর নেই। যা জানবার মেজ জায়ের কাছ থেকেই জেনে নেবে। সব বিপদের একমাত্র ভরসা।

তিনভাই বাড়ী ফিরেছে। গোলমালে বুঝতে পারে সরলা।

—এতক্ষণে বাবুরা এলেন!

বাইরে থেকে চাৎকার শোনা যায়,—অ বৌঠান! বৌঠান কোথায়?

সরলা মৃগনয়নীর সামনে এক গেলাস জল রেখে বলে,—ওই ঠাকুরপো ডাকছে। বোভাতের বাজার নিয়ে এলো। তুমি বোস, আমি আসছি।

বেরিয়ে যায় সরলা। মৃগনয়নী একা একা বসে থাকে।

সংসারটি মন্দ লাগে না ওর। দরিদ্র ছোট গৃহস্থ পরিবার। মেজ-জার কোন সন্তান নেই। কথাটা না বললেও দেখে বুঝতে পারে ও।

এখানেই কি সারা জীবন কাটাতে হবে। এই তিনখানি টিনের ঘর, এই ছোট একটু উঠোনে? এই কথাটা ভাবতেই কেমন হাঁপ লাগে ওর। যে সংসারে মানুষ হয়েছে ও, তার বিশালতার কাছে এ সংসারের ক্ষুদ্রতা ওর অনুভূতিকে কুকড়ে দিতে চায়।

কে জানে পুঁটিদির শ্বশুরবাড়ী কেমন হোল। দিদি কেমন ঘরে গিয়ে পড়ল।

পুঁটিদির কথা ভেবে মনটা ওর বেদনায় টনটন করে। বড় ভীতু মানুষ পুঁটিদি। বড় তরাসে। ভাল করে কারো সঙ্গে দুটো কথা বলবার দরকার হলে আগে দু গেলাস জল খেয়ে নেয়। নোতুন সংসারে গিয়ে ও কি মানিয়ে নিতে পারবে?

দিদি পারবে। তরঙ্গিণীর সাহস আছে। সুন্দরী মুখরা তরঙ্গিণী পরকে আপন করে নিতে জানে। ওর জন্যে ভাবনা নেই।

গলা খাঁকারির শব্দে চমকে ওঠে মৃগনয়নী।

বনবিহারী।

ফরসা মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে রৌদ্রের তাপে। পিঙ্গল চোখ দুটিতে ভাবলেশ-হীন একটু হাসি।—এখানে বসে কেন। মার কাছে যাও না?

এই প্রথম সম্ভাষণ। স্বামী সম্ভাষণ।

মৃগনয়নীর মাথায় ঘোমটা টেনে দেয়। বনবিহারী কি ভেবে ঘরে ঢুকেছে কে জানে!

মৃগনয়নী লজ্জায় চোখ নামায়। ছি, ছি, কেউ যদি এসে পড়ে। কি ভাববে! বুকটার ভেতর শব্দ হয়। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ে।

বনবিহারী আবার কি ভেবে ঘরের বাইরে চলে যায়।

বাঁচল মৃগনয়নী। যদি কাছে আসত? হাতটা চেপে ধরত? নয়ত কাছে এসে বসে পড়ত। কি আরও কিছু কথা বলত। বাজে কথা—অথচ মিষ্টি কথা তবে কি ভাল লাগত ওর?

ভাল লাগত খুব। এক কাল্পনিক আনন্দে তন্ময় হয় ও। ওর জীবনে এই প্রথম পুরুষ কল্পনা। এর আগে কল্পনাতেও কোন পুরুষের কাছাকাছি ও যেতে চায় নি ওর মনেই হয়নি এ সব কথা।

তরঙ্গিণীকে দেখেছে পুলকিত হতে। ও নিজে পুঁটিদির সঙ্গে এসব মধুর স্বপ্ন থেকে তফাতে থেকেছে। তাই এ অনুভূতি ওর কাছে সম্পূর্ণ নোতুন।

বনবিহারী ওর জীবনের একমাত্র পুরুষ। এই ভাবনা আজ এই মুহূর্তের আগে পর্যন্তও ওকে বিভ্রান্ত করেনি।

মৃগনয়নী চোখদুটি নামিয়েই বসে থাকে। কেমন এক মিষ্টি আবেশের ভেতর ডুবে গেছে ওর মন। কতক্ষণ এভাবে কেটেছে ওর খেয়াল ছিল না। সরলা ঘরে ঢুকতে ও চমকে তাকায়।

—চলো ভাই খাবে চলো। তোমার বরটি ভাই একবারে ভোলানাথ।

মৃগনয়নী চোখে কৌতুক নিয়ে তাকায়।

—বরাবরই ভীষণ সরল আর রাগী। ওকে কিমত চালিয়ে নিও ভাই। ও মায়ে কাছে গিয়ে কি বললে জান?

বলতে বলতে হেসে লুটিয়ে পড়ে সরলা।—তোমার ভাশুর বসে, ঠাকুরপো বসে ও গিয়ে হঠাৎ বলে,—কই এখনও আসেনি? আমরা তো চমকে তাকাই। কে আবার আসবে। তা আবার বলে, ওই যে তোমার বৌকে বলে এলুম, এখানে আসতে। শুনে আমি লজ্জায় হাসি চাপতে গিয়ে মুখে আঁচল গুঁজি। তোমার ভাশুর মুচকি হাসতে লাগল। মা বললে, যা হতভাগা, তোকে কে বলতে বলেছে বৌ ঘরে না তুলতেই হুকুম হচ্ছে। বেরো। বেচারী ধমক খেয়ে হকচকিয়ে চলে গেল হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেছে আমার।

মৃগনয়নী লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। ছি, ছি, কি লজ্জা! কি করে সবাইকে মুখ দেখাবে ও। এমন মুখ আলগা স্বামী নিয়ে ও কি করবে?

—সত্যি তোমায় এসে কি বললে ভাই? বলতে বলতে হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ে সরলা।

মৃগনয়নী মুখ লাল করে বসে থাকে।

—বললে বুঝি, মার কাছে যাও;—আবার সরলার হাসি।

মৃগনয়নীরও হাসি পায় এবার। ঠোঁটে হাসি চেপে বসে থাকে। কথা বলে না।

—এসো। খাবে এসো। বিকেলে আবার মাসীপিসীর দল আসবেন।

মৃগনয়নী ওঠে। সরলা ওর হাত ধরে নিয়ে চলে রান্নাঘরের দিকে। চোখে পড়ল হৃদয়দা বসে আছে বাইরের দাওয়ায়। হৃদয়দাকে দেখে ওর মনটা খুশী হয়ে ওঠে আরও। খুশী মনে খাবার ঘরে যায়।

সেদিন কেটে যায়। পরের দিন বৌভাত চুকে গেল।

ফুলশয্যার রাত্রে মৃগনয়নীকে সাজিয়ে সরলা ঘরের কাছে নিয়ে আসে।

—উঁহু হুঁ!—থামায় ওদের প্রমদা।

সরলা অবাক হয়ে বলে—কি হোল?

—নদা'র শরীরটে ভাল নেই। আজ বউকে এ ঘরে দেয়াটা ঠিক হবে না।

প্রমদার কথা শুনে সরলা রীতিমত বিরক্ত হয়,—আপনি যান ঠাকুরঝি। ভাইয়ের ফুলশয্যের রাতে বোনের থাকতে নেই।

—যান বললেই হোল।—প্রমদা রেগে যায়,—ভাইয়ের ব্যামো বাড়লে ভুগতে হবে আমার। তোমরা তো পরের মেয়ে। তোমাদের কত দরদ সে তো দেখতেই পাচ্ছি। দেখো মেজবৌ, ফের যদি অমনধারা কথা বলবে, মেজদা'কে বলে তোমার পাঁশজুতো না খাওয়াই তো আমার নামে কুকুর পুষো।

সরলা বলে—চীৎকার করে ভাইকে তো জানালেন দেখচি। তা আপনি জুতো খাওয়ান খাওয়াবেন। কিন্তু আজ আপনাকে এখানে গোলমাল করতে আমি দোব না।

প্রমদার চীৎকারে সত্যি বনবিহারী জেগে উঠে বসেছিল। প্রমদা রণমূর্তি ধরবার আগেই বেরিয়ে এলো বনবিহারী। বললে,—আমার শরীর তো খারাপ হয়নি কিছু। তুই যা এখান থেকে।

—ও মাগো। এই তো বললে, গা হাত পা কেমন করছে।—গালে হাত দিল প্রমদা,—বিয়ে করতে না করতেই মাগের ভেড়ো। দুটো দিন সবুরও সইল না। বলতে বলতে চলে গেল প্রমদা।

মৃগনয়নী অবাক হয়ে শুনছিলো ঠাকুরকন্যা প্রমদাসুন্দরীর কথাগুলো। একবার তাকিয়েছিলো ও প্রমদার চোখের দিকে। চোখ দুটো জ্বলছে। কেন জ্বলছে? ঈর্ষায়? কিসের ঈর্ষা? যাক্, ওসব ভাববে না আর মৃগনয়নী।

ফুলশয্যার শুরুতে যে কাণ্ডটা হোল, এত বিষ ছড়িয়ে গেল একজন যে মধু আর কিছু রইল না।

—ও একেবারে পাগলী! সস্নেহে বলে ঘরে ঢুকল বনবিহারী।

গজগজ করল সরলা,—সেয়ান পাগলী। ভায়েরা বোন বলতে অজ্ঞান। তাই তো এত বেড়েছে, নইলে ওকে জব্দ করতে দুদিনও লাগে না।

মৃগনয়নীর কানে এলো কথাগুলো। নিজে কথা বেশী বলছিল না বলে অন্যের কথাগুলো বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছিল মৃগনয়নী। মনটাও ছিল অনেক প্রশান্ত, তাই প্রতিটি কথায় প্রতিটি মানুষের আসল চেহারাটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল প্রত্যেককে ভাল করে দেখবার জানবার একটা আন্তরিক চেষ্টা ছিল, তাই হয়তো কথায় কথায় চরিত্রগুলো সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করে নেবার চেষ্টা করছিল।

বেশ বোঝা গেল প্রমদাসুন্দরী ভাইদের আদরিণী। কারণটাও স্বাভাবিক। বিয়ে হবার পর স্বামীর আদর সে পায়নি। ভাইরা তার সেই অভাবকে নিজেদের স্নেহ দিয়ে ভরে দেবার চেষ্টা করে। ফলটা হয় উলটো। ভাইরা আমার হাতে এই রকম একটা দম্ভের সিংহাসনে রাণী হয়ে বসেছেন প্রমদাসুন্দরী। আর সেটাকে মাঝে মাঝে যাচাই করে নেবার একটা নিষ্ঠুর কৌতূহল দমন করতে না পেরে বৌদের ওপর অত্যাচার করে দেখে নেয়, দাদারা কার পক্ষ নেয়।

স্বভাবতই মেজদা প্রতিদিন বোনের পক্ষই নিয়েছেন। এবার ন'দাকে যাচাই করবার লোভটা আর সামলাতে পারছে না প্রমদা। গোড়াগোড়িই এই রকম একটা পরীক্ষা করে নেবার চেষ্টা করছে।

এই প্রথম বিফল হোল প্রমদা। এটা বেশ বোঝা গেল আজ। রাগ করে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল প্রমদা। বিয়ে করতে না করতেই নদা' মাগের ভেড়া হোল। প্রমদার নিদারুণ দম্ভে আজ প্রথম আঘাত। আরও ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো সে। শুয়ে শুয়ে গজরাতে লাগল।

মৃগনয়নীকে এবার ঘরে ঢুকিয়ে দরজাটা চেপে দিলে সরলা। আর ত্ চারিটি অল্প বয়েসী বউ এসেছিলো। তারা এসে এবার দোরের কাছে জড়ো হোল। কান পেতে রইল, কিছু মিষ্টি মিষ্টি বাজে কথা শোনা যায় কি না!

মৃগনয়নী ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে। বনবিহারী বসেছিল বিছানার ওপর। একটা বিড়ি ধরাল। একবার তাকাল মৃগনয়নীর দিকে। কিছু বললে না। মৃগনয়নী দাঁড়িয়ে রইল তেমনি।

সামনের জানালার মত একটা খুপরি। ঝাঁপটা খোলা। চারকোণা এক টুকরো আকাশ চোখে পড়ে মৃগনয়নীর। ঝিকমিক করছে তারাগুলো। একটা কলাগাছের পাতা ধনুকের মত হেলে পড়েছে জানালার কাছে। নরম আলো চিকচিকিয়ে উঠছে সবুজ কলাপাতার ওপর।

বুকের ভেতর থেকে একটা ঢেউ উঠছে গলা অবধি। শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে বার বার। মৃগনয়নী কিছুতেই এগোতে পারে না।

ঝিঁ ঝিঁপোকার ডাক ছাড়া আর কোন শব্দই কানে আসে না। মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসে কুকুরের ডাক।

বনবিহারী ওঠে। জানালার ঝাঁপটা বন্ধ করে দেয়। মৃগনয়নীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে দোরের ছিটকিনিটা এঁটে দেয়। শব্দ হয় দরজার। চমকে ওঠে মৃগনয়নী। মুখটা নিচ করেই দাঁড়িয়ে থাকে। হাত-পাগুলো কেমন অবশ অবশ লাগে।

ঘরের বাইরে বেড়ার ফাঁক দিয়ে কৌতূহলী কয়েক জোড়া চোখ কিছু দেখবার চেষ্টায় লাফিয়ে ওঠে। বনবিহারী আস্তে আস্তে বিছানার কাছে যায় আবার। গিয়ে শুয়ে পড়ে।

তখনও দাঁড়িয়ে আছে মৃগনয়নী। বনবিহারী আর একবার ওঠে। লণ্ঠনটা নিবিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে খিল খিল হাসির আওয়াজ আসে।

মৃগনয়নীর হাতে আর একখানা হাত এসে লাগে। টানে ওকে। অবশ হয়ে এগিয়ে যায় মৃগনয়নী। অতি পুরাতন একটি প্রশ্ন আসে মৃগনয়নীর কানে,—তোমার নাম কি?

উত্তর আসে না মৃগনয়নীর কাছ থেকে।

—কি হোল। বল?

নীরব অন্য পক্ষ।

—বোবা নাকি?

কথা নেই।

মৃগনয়নীকে জড়াতে যায় দু খানা রোগা হাত।

—উঃ। লাগে!—প্রথম কথা বলে ও।

বনবিহারী রেগে যায় হঠাৎ,—ধুত্তোর!

বলে ঠেলে দেয় মৃগনয়নীকে। ওর মনে হয় সরলার কথা, ঠাকুরপো বড্ড রাগী। ও বোঝে শুধু রাগী নয়, অসহিষ্ণুও বটে।

পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে বনবিহারী। মৃগনয়নীও একটু সময় বসে থেকে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে ইচ্ছে করেই মৃগনয়নী একখানা হাত বনবিহারীর বুকের ওপর ফেলে। হাতখানা সরিয়ে দেয় বনবিহারী। আবার হাতটা আসে।

মৃগনয়নীর অতি মৃদু গলা শোনা যায়,—ঠাকুরঝির সামনে আপনি না বেরোলেই পারতেন?

বনবিহারী এপাশ ফেরে এতক্ষণে।

খুশির স্বরে বলে,—না বেরুলে কি ও যেত নাকি? তোমাকে আর এ ঘরে আসতে হোত না। ও অমনি একটু পাগলাটে।

—মেজদি তো ছিল?

—মেজ বৌঠান? আরে দূর্! তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিত। একটা কথা তোমায় বলে রাখি—ও একটু বকবক করে বেশী। সইতে হবে তোমায়।

—মেজদি কিন্তু ভারী ভালমানুষ।

—মেজ বৌঠান তো কাদা। ওর তুলনা নেই। তোমার কেমন লাগছে সবাইকে?

—ভালোই!—উত্তরটায় খুব উৎসাহ ছিল না।

—আমাদের বাড়ী?

—মন্দ কি!

—আর একটা কথা। মানে বড় মানুষের সংসার থেকে এসেছো, এখানে বড়মানুষী কিছু করে বোস না যেন!

কথাটায় কেমন একটু শাসানি ছিল! উত্তর দিল না। বনবিহারীও আর কথা পাড়ল না। চোখ বুঁজল বোধহয়। রাত শেষ প্রহরে এসে পৌঁছলো। ভোর হতে আর বেশী দেরি নেই।

অন্ধকার তখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। মৃগনয়নী বিছানা থেকে উঠল। বনবিহারী তখন ঘুমুচ্ছে। একবার তাকাল বনবিহারীর দিকে। রোগা ফরসা বনবিহারীর

পিঠে দুটো লাল রঙের তিল। মাথার চুল পাতলা আর খুব কালো নয়। বরং খুটেপানা।

মৃগনয়নী জানালার ঝাঁপটা খুলে দিল। আকাশ প্রায় ফরসা হয়ে এসেছে। ঘাস-পাতার ওপর বিন্দু বিন্দু শিশিরের ফোঁটাগুলো টলমল করছে তখনও। সূর্য উঠলেই শুকিয়ে যাবে।

মৃগনয়নী ঘর থেকে বেরোয়। বেরিয়ে দেখে শাশুড়ী দাওয়ার ওপর বসে আছেন বসে। জপের মালা ফেরাচ্ছেন! কত ভোরে উঠেছেন উনি? শেষ রাত্রে বোধহয়। আর কেউ ওঠেনি তখনও। এমন কি মালিনীও আসেনি উঠোন ঝাঁট দিয়ে গোবর ছড়া দিতে।

শাশুড়ী মৃগনয়নীকে দেখে বলেন—এসো।

মৃগনয়নী ঘোমটা টেনে সামনে আসে খুব আস্তে আস্তে। উনি মৃগনয়নীর ঘোমটা খুলে পাশে টেনে নিয়ে বসান,—আমার সামনে আবার ঘোমটা কেন? কথা আছে তোর।

মৃগনয়নী মৃদু হেসে মুখ নিচু করে বসে। বৃদ্ধা পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বারে বারেই বলতে থাকেন,—এ বউ আমার লক্ষ্মী। বড় ঠাণ্ডা বউ। দেখো মেয়েটা পেটে ধরেছিলাম একটা রাক্ষসী।

ঠাকুরকন্যার কথা বলছেন, বোঝে মৃগনয়নী।

—বউ আনলাম। বাজা। আজ ছ বছরের ওপর হোল তার কপালে কিছুই এলো না, কিছুই হোল না। তোমার মুখখানি দেখেই আমি বুঝেছি, তুমিই আমার লক্ষ্মী বউ।

খোঁচড় থেকে বড় একটি সুন্দর কল্কা আঁকা কাঠের কৌটো বার করে বৃদ্ধা।

—ধরো।

ইতস্ততঃ করে মৃগনয়নী।

বৃদ্ধা মৃগনয়নীর হাতে গুঁজে দেন,—এ ভরার কৌটো। লক্ষ্মী বাঁধা থাকে এ কৌটোয়। তোমাকে দিলুম। প্রত্যেক বছর বিজয়াদশমীর দিন মাকে বরণ করে একটি করে গিনি, না হয় একটি করে টাকা এতে রাখবে। দেখবে তোমার কোন অভাব থাকবে না। জীবনে কোন কষ্টই পাবে না।

বৃদ্ধার কথাগুলো যেন বিন্দু বিন্দু স্নেহ-ঝরা মধুতে ভিজে কথা। তাকায় ওঁর দিকে মৃগনয়নী। বনবিহারীর মত ফরসা ক্ষীণ দেহ। মুখখানি ভারি নিরীহ, ঠাণ্ডা। শান্ত চোখদুটি।

বলেন উনি,—এ ভরার কৌটো আজকের নয় মা। আমার শাশুড়ী আমায় দিয়েছিলেন। তাঁকেও দিয়েছিলেন আমার দিদিশাশুড়ী। বহুকালের ভরার কৌটো যত্ন করে রেখো। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন,—আজ নিশ্চিন্ত হলাম। এতদিন ধরে ভেবেছি এ কৌটো কাকে দিয়ে যাই। আজ দেবার মত মেয়ে আমার ঘরে এসেছে আমার দায়িত্ব আমি তোমায় বুঝিয়ে দিলাম।

কথাগুলোর ভেতর কোথায় যেন কারুণ্যের প্রতিধ্বনি শুনতে পায় মৃগনয়নী। উপুড় হয়ে প্রণাম করে বৃদ্ধাকে। বৃদ্ধা ওকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করেন,—সুখী হও মা। মাথায় সিঁদুর নিয়ে জীবন কাটিও। ছেলে আর মেয়ে নিয়ে বড় অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলাম। বাপের বাড়ীতেই জীবন কাটল। জীবনে আর কি সাধ আছে বলো।

আজীবনের আক্ষেপ জমা হয়ে আছে বৃদ্ধার বুকে। বলবার মানুষ পায়নি হয়তো এতদিন। ছেলেরা কেউ তেমন কৃতি হোল না। হয়ে রইল গলার কাঁটা।

—সংসারে সুখের আশাই করেছিলাম। আশা কারো মেটে না মা।

মৃগনয়নী স্পষ্ট দেখতে পায় বৃদ্ধার চোখদুটো চিকচিক করে উঠেছে।

—তাইতো প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করি। তোমরা সুখী হও। তোমাদের সুখে আমি মরেও সুখ পাব। বেঁচে তো আর পেলাম না। একটু থেমে হঠাৎ বলে বৃদ্ধা,—তোমায় গোপন করে আর কি লাভ! ছেলে চারটের একটাও তেমন মানুষ হোল না। রাগ হলে কেউ মাকে মারে শুনেছ? বাপ তো নেই, মামার বাড়ী হাজার হলেও তেমন আদর কেউ পায় না। তাই বোধহয় যত রাগ ওদের আমার ওপর। ছোটবেলা থেকে রাগ হলে আমার পিঠে ওরা দুম দুম করে কিলোবে। এতদিনে পিঠের হাড়গুলো আমার গুঁড়ো হয়ে যাবার কথা। তা ওদেরই দোষ কি? বাপ না থাকলে ছেলেরা মানুষ হবেই বা কি করে? আবার ভয় হয়, তোমরাও আবার এদের হাতে পড়ে কষ্ট না পাও। ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন।

মৃগনয়নী স্তম্ভিত বেদনায় চুপ হয়ে যায়।

—ছাই! ছাই! সংসারে কিছু নেই। শুধু ছাই!

আবার সেই চিরকালের আক্ষেপ। হয়তো চিরকালের এক মহাসত্য।

মৃগনয়নী কথা বলতে পারে না। মেজ ভাশুরের ঘরে শব্দ পায় ওরা।

বৃদ্ধা বলেন,—বোধ হয় মেজ-বৌ উঠছে। যাও কৌটোটা চট করে তোমার তোরঙ্গে রেখে এসো। তোমায় দিয়েছি কেউ যেন না জানে। লুকিয়ে দোব বলেই রাত থাকতে এসে বসে আছি।

একটু হাসে বৃদ্ধা।

মৃগনয়নী ঘরে গিয়ে তোরঙ্গ খুলে কৌটোটা রেখে তোরঙ্গ বন্ধ করে বাইরে আসে আবার।

বৃদ্ধা নেই। বোধহয় তাঁর ঘরে গিয়ে আবার শুয়ে পড়েছেন।

দাওয়ার থামটা ধরে দাঁড়ায় মৃগনয়নী। এখনও সূর্য ওঠেনি। বিমূঢ় বিস্ময়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে ও, যেখানে এতক্ষণ বৃদ্ধা বসেছিলো। একটা পুরো জীবনের শেষ দৃশ্য বুঝি ঘটে গেল ভোরে এইখানে একটু আগে।

আজীবনের আক্ষেপ ঢেলে দিয়ে গেল আর চাপিয়ে দিয়ে গেল এক বংশানুক্রমিক প্রতিশ্রুতি।

কেন এত আক্ষেপ? সংসারটা শুধু আক্ষেপ আর আগুনে ভরা কি? এতকাল শুধু ও শুধু শুনে এলো. জ্বলে গেলুম শোক আর সন্তাপে। তারপর শুরু হয় আক্ষেপের প্রলাপ। ব্যতিক্রম দেখেছে। ওর একমাত্র ব্যতিক্রম দেখেছে মৃগনয়নী। সংসারে একেও সদা প্রসন্ন। শীতল প্রশান্ত। ঠাণ্ডা দুটি চোখ তুলে মিষ্টি কথা বলতে শুনেছে দারুণ বেদনার দিনেও। সে ওর বাবা—রামতারণ। বড় হবার পর থেকে কোন কারণেও রামতারণকে অপ্রসন্ন দেখেনি। সংসারে থেকেও যেন সংসার থেকে অনেকটা দূরে বাস করেন। ওখানে এই বিক্ষেপ আর আক্ষেপের তরঙ্গ পৌঁছয় না।

—কিলো ভাব লাগল নাকি

সরলা উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—চ' ঘাটে যাই।

—চলুন।—বলে মৃগনয়নী।

—একখানা গামছা আর শাড়ী নিতে হবে যে!

মৃগনয়না বলে,—চান করবেন নাকি এত ভোরে?

—আমি ভাই সকালেই চান করি। তোমার বুঝি অভ্যেস নেই?

ঘাড় নাড়ে মৃগনয়নী।

সরলা হাসে,—এখানে ভাই ননদিনী ঘাড় ধরে চান করাবে।

—কেন?

—চান না করলে কিছু ছুঁতে দেবে না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, বলবে, সোয়ামীর ঘরে রাত কাটিয়ে—বলতে বলতে বেদম হাসতে থাকে সরলা।

মৃগনয়নীর মুখখানা লাল হয়ে ওঠে। ঘরে গিয়ে একখানা কাপড় আর গামছা নিয়ে বাইরে আসে। সরলা ওর ঘর থেকে তেল নিয়ে আসে। মাথায় তেল ঘষে দুজনে ঘাটের দিকে চলে।

—ফিরতে হবে সকাল সকাল।—বলে সরলা।

—কেন?

—ঠাকুরঝির ওঠবার আগে। উঠে যদি দেখে বউরা বাড়ী নেই—অনর্থ করবে।

মৃগনয়নী কথা বলে না।

—ঠাকুরঝিকে তো চেনো না। দুদিন পরেই টের পাবে।

মৃগনয়নী আস্তে আস্তে বলে,—কি করতে হবে আমায় সব বলে দেবেন। নইলে জানব কি করে। না জানলেও বকবে?

সরলা হাসে,—ভয় নেই। আমি সব বলে দোব।

একটু সময় চুপ করে থেকে সরলা বলে,—একটা কথা বলবি?

সরলার তুই সম্বোধনে অন্তরের স্পর্শ পায় মৃগনয়নী। তাকায়।

—কাল ন'ঠাকুরপো কি বললে?

মৃগনয়নী চুপ করে পথ চলে। ঘাটে এসে পৌঁছয় ওরা। পুকুরের জলের ওপর একটা ঘন কুয়াশার আস্তরণ তখনও পাতলা হয়ে যায় নি।

সরলা আবার বলে,—কিলো? বলবিনি?

মৃগনয়নী মুখটা নিচু করে বলে—কি আর বলবো?

—তবু আমার নামে কিছু বলেছে?

অবাক হয় মৃগনয়নী—কই না তো!

—নিন্দে সুখ্যাত কিছু করলে না?

—না। আপনার কথা কিছু হয়নি। কি আর বলবে?

—বলবে, আমি বাঁজা, আমার লক্ষ্মী ছিরি নেই। আমি সংসার উড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছি। আবার আক্ষেপ! মৃগনয়নী চুপ করে থাকে।

—বলবে। বলবে। কোলে একটি আসত। কেমন বলতো সবাই দেখতুম!

নিগূঢ় বেদনার কথা শোনায় সরলা। নোতুন মানুষকেই শোনায়। ওর স্ব

চেয়ে বড় বেদনা কোথায়, সেটা নগ্ন করে দেখায়। দেখো, তুমি দেখো, তুমি বিচার করে বলো ভাই। আমার বেদনার কি সীমা আছে?

একই অভিযোগের রূপান্তর মাত্র। শুনতে হবে মৃগনয়নীকে। ঘাড়ও নাড়তে হবে। আহা বলতে হবে। নয়তো নিজের ব্যথার গাথা শোনাতে হবে। ব্যথার পুঁজি কিছু না থাকলে কি বলবে? কিছু ব্যথা বেদনা নেই এমন মানুষ তো চোখে পড়ে না ওর। শুধু তাই নয়, সবাই ভাবে আমার কষ্টের সীমা নেই, অন্য কেউ ও কষ্ট পেলে মরে যেত, ক্ষয়ে যেত। আশ্চর্য এইটেই যে কেউই মরে না। ক্ষয়ে যায় না।

একটা কথা মাঝে মাঝে মনে হয় ওর সংসারে বেদনার প্রয়োজন আছে। বেদনায় মানুষকে নিচে নামাতে পারে ঠিকই। কিন্তু একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই বেদনাই মানুষকে তার নিজের মর্যাদা দেয়। অনেক উচুতে ওঠায়।

এ সব কথা বাবার কাছেই শেখা। বাবার অনুভবে কিছু কিছু অনুভব করা।

বাবা বলতেন, সংসারে যা কিছু অমঙ্গল বলে মনে হয়, তারও প্রয়োজন আছে। মঙ্গলের জন্যেই তার প্রয়োজন রয়েছে। ভাল মন্দ সুখদুঃখ ভগবানই দেন। র কোনটিই বৃথা নয়, কোনটিই বাজে নয় মা। সব অবস্থাকে মাথা পেতে নিতে হয়। সবই যে তাঁর দান।

বাবার কথাগুলো ঠিক তখন তখন বোঝা যায় না। এক একটা অবস্থায় পড়লে, ক এক মানুষকে দেখলে এক একটি কথা উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে মনের ওপর।

সরলার সরল চোখদুটি জলে ভরে উঠেছে এরি ভেতর। ধরা গলায় বলে—অনেক লাগানি ভাঙানি শুনতে পাবি। ওরা বলতে জানে। বললে বিশ্বেস করবিনি, এক একটা কথায় আমার মাথার চাঁদি জ্বলে যেত। মাথায় গিয়ে জল দিতুম। পরশুই তো বললে তোর মেজভাশুর, ন'বৌয়ের যদি ছেলেপুলে না হয়, তোমাকে আবার বিয়ে করতে হবে। বললুম—করো। ওর হলেও তুমি বিয়ে করো। আমার একটুও কষ্ট হবে না। হাসতে লাগল, বললে—সত্যি করতেও তো পারি। রাতটা তাই ঘুম হোল না। মাথাটা জ্বলে যেতে লাগল।

মৃগনয়নী আবার ভয় পায়।

এরা তাহলে দুবার বিয়ে করতে পারে? পারে বইকি! বংশরক্ষার জন্য স্ত্রীর প্রয়োজন। একথা তো কতকাল শুনে আসছে। যে মেয়েমানুষ মা হলো না, সে শুধুই একটা মেয়েমানুষ মাত্র। স্ত্রীর মর্যাদা পাবে কোত্থেকে? তাই আর একটি

মেয়েকে আনতে হয় তার স্ত্রী হবার যোগ্যতা আছে কিনা পরখ করতে। এমন তো হামেশাই হচ্ছে।

বলে সরলা, হবে নাই বা কেন? লাউ কুমড়ো কিনতেও পয়সা লাগে। একটা মেয়ে আনতে পয়সা তো লাগেই না, বরং পয়সা পাওয়া যায়। তুই আসবার পর থেকে তোর মেজ ভাশুর যেন উথলে উঠেছে। আবার বিয়ে করবেই। করুক। এখন এর দাসী হয়ে আছি, তখন সতীনের দাসী হবো। ঝি হতেই জন্মেছিলাম।

সরলার গাল দুটোয় অনেক জলের দাগ।

স্নান সেরে নেয় ওরা। মৃগনয়নী কথা বলতে পারে না। সরলা আর কথা বলে না, ভিজে গামছায় কপাল আর চোখ মোছে।

উঠোনে এসে পা দিতেই মৃগনয়নী শুনতে পায় কর্কশ এক গলা।

—বলি নোতুন বৌকে নিয়ে কি পুকুর খুঁড়ে চান করে এলে?

মাথায় ঘোমটা ছিল তবু বুঝতে দেরি হোল না, এমন গলা ঠাকুরকন্যার ছাড়া আর কার হতে পারে!

—বড্ড বাড় বেড়েছে মেজবৌ! নবৌকে পেয়ে বড্ড বাড় বেড়েছে। ইদিকে এসো। আজ তোমায় হেঁশেলে ঢোকাব। খোস-গল্প উনুনের সঙ্গে বসে করাব আজ।

আজও কয়েকজন আত্মীয়-কুটুম বাড়ীতে খাবে। মঙ্গলার মারই রাঁধবার কথা ছিল। প্রমদাসুন্দরী মঙ্গলার মাকে বলতে যায় আজ আর রান্না করতে আসতে হবে না। দিনভর হেঁশেলে রেখে ও জব্দ করবে সরলাকে।

সরলা নিরুত্তরে মৃগনয়নীকে টেনে নিয়ে ঘরে চলে যায়। প্রমদা ওঠে। মঙ্গলার মার কাছে যাবে।

বুড়ী শাশুড়ী বেরিয়ে আসে,—বলি অ সুন্দরী, চাল্ল কোথায়? ইদিক পানে আছে। দুটো মিষ্টি খেয়ে একটু জল গলায় ঢাল দিকি।

—আজ মেজ-বৌ হেঁশেলে যাবে।

—তা কখনও হয়। মঙ্গলার মা বাঁধুক আরও দু'চারটে দিন।

—না। খবদ্দার তুমি বৌদের নাই দিও না মা।

এর ভেতর বনবিহারী ছোট ভাইকে নিয়ে বাড়ী ঢোকে। দুজনের দুহাতে মাছের থলে। মাছ নামায়।

—কি হোল আবার? বলে ছোট দেওর।

প্রমদা ডাকে, মেজ-বৌ! বলি অ মেজ-বৌ!

মাছ ঢালে তুভাই। বড় বড় পুঁটি প্রায় সের আড়েক।

মেজ-বৌ কপালে সিঁদুর ছুঁইয়ে বাইরে আসে।

—ওই সব মাছ তুমি কুটবে। উনুনে আগুন দাও, ভাত চড়িয়ে মাছ কোট, বাটনা বেটে নাও। জল তোমায় এনে নিতে হবে। সব তোমাকে করতে হবে।

বনবিহারী চুপ করে সরে দাঁড়ায় প্রমদার আদেশের ওপর কে কথা বলবে?

ছোট দেওর একটু মুচকি হেসে বলে, নাও কুটতে লেগে যাও।

সরলা স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। ও জানে এ আদেশ অমোঘ, এর ব্যতিক্রম করার ক্ষমতা এ বাড়ীর কারো নেই। বুড়ী শাশুড়ীও প্রমদার মূর্তি দেখে আর কথা বলতে সাহস পায় না।

মাছের স্তূপের দিকে তাকিয়ে আছে সরলা। এত মাছ কুটতে হবে, ওদিকে ভাত হয়ে গেলে চলবে না। বাটনা বাটতে হবে। কিন্তু রান্না তাড়াতাড়ি চাই। কি করে করবে সরলা? করতেই হবে। কালো মসৃণ গালের ওপর গড়িয়ে পড়ছে চোখের জল।

প্রমদা এগিয়ে আসে,—যাও জল তুলে নিয়ে এসে ভাত চড়িয়ে দাও।

একটা ঠেলা মারে কাকালে।

মৃগনয়নী ঘরের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়েছিল। ওর কান দুটো আগুনের মত লাল হয়ে ওঠে। জমিদার কন্যা মৃগনয়নী। ওর ধমনীর সেই রাজসিক রক্তস্রোত গরম হয়ে ওঠে। সটান উঠোনে নেমে পড়ে ও।

সরলাকে বলে একটু জোরে সকলকে শুনিয়ে,—তুমি জল আনতে যাও মেজদি। আমি মাছ কুটে দিচ্ছি। বাটনাও করে দোব।

প্রমদা এতদিন এ সংসারে অনমনীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে ছিল। সরাসরি সেই ব্যক্তিত্বের ওপর আঘাত করেছে আজ মৃগনয়নী। এই প্রমদার দ্বিতীয় আঘাত।

কি জানি কেন ও মৃগনয়নীর সামনে এসে কিছু বলতে সাহস পেল না। মৃগনয়নীর কণ্ঠস্বরে এমন এক গাম্ভীর্য ছিল যা ওর আদেশের গাম্ভীর্যকে অনেক হালকা করে দিয়েছে। এ গাম্ভীর্য মৃগনয়নীর রক্তে আছে। ওর বংশে সকলে আদেশ করেই এসেছে, আদেশ কখনও শোনেনি।

—বটিটা কই মেজদি?

চোখ দুটো জলে ঝাঁপসা হয়ে গেছে। মৃগনয়নীর আজকের এ রূপ প্রাণভরে দেখতেও পারছে না সরলা।

মৃগনয়নীর কণ্ঠে সহজ কঠোরতায় সবাই বুঝছিল যে এ আঘাতের প্রত্যুত্তর দিতে প্রমদা পারবে কিনা সন্দেহ আছে।

সরলা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল দ্রুতপায়ে। ওর অনেক চোখের জল আজ আর বাধা মানছে না। প্রতিবাদ করবার মত এক শক্তির আবির্ভাব দেখে আনন্দে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠছে ওর।

বুড়ী শাশুড়ী এগিয়ে এলেন। কুঞ্চিত মুখের ভাঁজে ভাঁজে বেশ খুশির আমেজ।

—ওই যে হোথায় আঁশ বঁটি।

বড় আঁশ বঁটিখানা টেনে নিয়ে মাছের স্তূপের কাছে বসে পড়ে মৃগনয়নী। বনবিহারী মুখটা শুকনো করে ভয়ে ভয়ে একবার প্রমদার দিকে তাকায়। তারপর বেরিয়ে যায়।

ছোট দেওর আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। আজ কি হবে কে জানে!

প্রমদা উঠে গিয়ে দাওয়ায় বসল। একটা কথাও বলল না। বুকের ভেতর ওর একরাশ বরফগোলা জল ঢেলে দিয়েছে যেন। সাপের গায়ের মত ঠাণ্ডা ভয় ভয় ভাবখানা। নিজেই বুঝতে পারছে না প্রমদা তার এ কি হোল!

একটা বাচ্চা বউ। ওকে তো চেলা কাঠ দিয়ে পেটালেও এ বাড়ীতে কেউ কিছু বলবার নেই। তার এত স্পর্ধা? এটা দুঃস্বপ্ন নয় তো?

মৃগনয়নী মাছ কুটছে। ওদের বাড়ীতে আধমণ মাছ রোজই আসে। এই কটা মাছ দেখে ভয় পাবার মেয়ে মৃগনয়নী নয়! নায়েব মশাই বাজার সকাল সকাল এনে ফেললে তাকে পুঁটিকে সব মেয়েকেই মাছ কুটতে বসতে হোত। এ মাছ তো সে মাছের কাছে কিছুই নয়। মৃগনয়নী গরম হয়ে রয়েছে তখনও। খচাখচ মাছ কুটে চলেছে।

প্রমদা ঘরের ভিতর গিয়ে শুয়ে পড়ল।

বুড়ী চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন।

—এই না হলে আর কাজের বৌ!—বলতে বলতে মৃগনয়নীর মাথায় একটা হাত রাখেন বুড়ী। হাতখানা কাঁপে। খুব আস্তে বলেন,—সুখী হও মা! তুমি আমার লক্ষ্মী বৌ।

সাত

হৃদয় বারিক চলে যাবে আজ। মৃগনয়নীর সঙ্গে দেখা করতে এলো যাবার আগে। মৃগনয়নী বসে ছিল ওর ঘরে। সরলার সঙ্গে এল হৃদয় বাইরে থেকে।

প্রমদাসুন্দরী আজ সকালেই বলে দিয়েছে হৃদযকে, বোল তোমাদের কত্তাকে, ছ' মাসেব ভেতর বৌয়ের যাওয়া হবে না।

পাচটা কাটা আঙুল মুখের ভেতর একবার বুলিয়ে নিল হৃদয়। মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট শব্দ বেরোল।

তাই দেখা করতে এসে প্রথমেই হৃদয় কোন কথা বলতে পারলে না। মনটা ওর ভারী ছিল সকাল থেকে। কিছু কিছু দেখে কিছু কিছু শুনে ওর ধারণা হয়েছিল যে মৃগনয়নী খুব সুখের ঘরে পড়েনি। বিশেষ করে প্রমদাসুন্দরীর সানাইয়ের পোঁ ধরার মত গলাটা বাইরে বসেও শুনতে পেত হৃদয়।

মৃগনয়নার কানেও সব কথা এসেছিল। বলেছিল সরলা,—ননদিনী কি বলেছে শুনেছিস?

—না তো?

—তোর বাপের বাড়ী যাওয়া ছ' মাস বন্ধ।

মৃগনয়নার কাণের ভেতর দিয়ে কথাটা পৌছতে একটু দেরি হল।

আর একবার বললে সরলা,—ছ' মাস আটকেছে। আমি অবশ্যি তোর ভাশুরকে বলবো। এমন অন্যায় অত্যেচার চলবে না।

বুদ্ধিতে কথাটা পৌছে মনে গিয়ে ধাক্কা খেল, সঙ্গে সঙ্গে এক মন্থর ছ'মাসের ছবি ভেসে উঠল মৃগনয়নীর মনে। ছ'মাস এ সংসারে থাকবার ছবি। অনেক ভারী মন আর বিরাট এক ভয় ওকে কোথায় নামিয়ে দিল ও যেন টেরই পেল না।

—দেখি তোর ভাশুরকে বলে, কি বলে?

পাণ্ডুর ঠোঁটদুটো ফাঁক হোল একটু হাসবার চেষ্টায়। ও বুঝল সেদিনের প্রতিশোধ নিলে প্রমদাসুন্দরী। তাকে এবার এমন এক আঘাত করেছে, যা তার পক্ষে দুঃসহ হয়ে যে উঠবেই একথা চোখ না বুঁজেই ভাবা যায়।

বাবার মুখখানি মনে আনবার চেষ্টা করল মৃগনয়নী। সেই প্রশান্ত হাসিমুখ।

বাবা কথাটা শুনবেন, শুনে একটু হাসবেন। কর্তাবাবু শুনবেন, ভেতরে গরম হয়ে উঠবেন। মা শুনবে, কর্তামা শুনবে, পুঁটি শুনবে, তরঙ্গিণী শুনবে।

আবার বলবে সবাই, হতভাগীর বরাতটাই খারাপ।

এমন পোড়া কপাল দেখিনি বাপু, অষ্টমঙ্গলের গাঁট খুলতেও ছাড়বে না।

কেমন বে-আক্কেলের ঘরে পড়ল গা! নোতুন বিয়ের পর কেউ শ্বশুরবাড়ী ছ'মাস থাকতে পাবে!

স্পষ্ট শুনতে পেল মা মাসীদের আলোচনা।

ওর ইচ্ছে হোল বলে,—পারে। মৃগনয়নী পারে। ছ'মাস কেন ছ'বছরও থাকতে পারে।

আবার কথাটা মনে হয়, শান্তি যদি চাও মা, নিজের দোষ দেখো। পরের দোষ দেখো না। সত্যিই তো সে পরের দোষ দেখতে গিয়েছিলো। নিজের দোষ তো দেখেনি! নোতুন বৌ হয়ে ব্যবহারে আর একটু সংযত হওয়া উচিত ছিল তার। তাই কি? মন যে সায় দেয় না। সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে, ঠিকই করেছে। সে কারো দোষ দেখেনি। শুধু মাত্র যা ন্যায় তাই বলবার চেষ্টা করেছে। এর জন্যে যে কোন কষ্ট সে সইতে পারবে। সে জানে একটুও অন্যায় করেনি।

মনে এক অভাবনীয় শক্তি এসে পড়ে। পরের দোষ সে দেখবে না। কিন্তু অন্যায় দেখে চুপ করে থাকতেও বাবা বলেননি কখনও। সোজা হয়ে দাঁড়ায় মৃগনয়নী।

হৃদয় এসে দাঁড়াল। যেন সহজভাবে হেসে বললে মৃগনয়নী,—চলে যাচ্ছ হৃদয়-দা?

হৃদয় মৃগনয়নীর মুখে হাসি দেখে অবাক হয়ে যায়।

—যা দেখলুম, সবই কি বলব?

মৃগনয়নী হাসে,—সব বলা কি ভাল? সেখানকার সব কথাই কি এখানে বলা যায়?

—শুনেছ? হৃদয়ের গলাটা ধরে যায়।

—কি হৃদয়দা?

—ছ'মাস তোমার এখানেই থাকতে হবে,—হৃদয় অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

মৃগনয়নী খুব সহজভাবে বলে,—সে তো জানি।

—তুমি জান?

—হ্যাঁ। বারে বারে যাওয়া আসা কত অসুবিধে বলো তো? কাছাকাছি পথ তো নয়?

হৃদয় চোখ দুটো বড় বড় করে বলে,—তাই বলে ছ'মাস!

—মৃগনয়নী বলে,—আস্তে! কেউ শুনতে পাবে।

—শুনুকগে!

—তুমি কিন্তু মিছামিছি রাগ করছ হৃদয়-দা'! এদের কোন দোষ নেই।

টুণ্ডো হাত দুখানা চেপে বলে হৃদয়,—তুমি একথা বলচো?

—তা বলব না? এরা তো বড়লোক নয়? বারে বারে আমাকে আনবার একটা খরচ আছে, সেটা ভুললে চলবে কেন?

হৃদয় অবাক হযে তাকিয়ে থাকে।

মৃগনযনী মুখটা নিচু করে চলে,—মাকে বোল—

এইখানে ওর গলাটা একটু ধরে আসে। হৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে।

—মাকে বোল। আমি ভাল আছি।

হৃদয় আবার অবাক হয়। বলে কি মেযেটা! সে যে কিছু কিছু নিজে চোখেও দেখেছে।

—আর বাবাকে বোল—

হৃদয়ের বড বড চোখ দুটো নিস্তব্ধ হযে আসে।

মৃগনযনীর মুখে হাসি,—বাবা যেন আমাকে দু' একটি চিঠি দেন।

—বলবো।—হৃদয় সহজ হয়ে এসেছে। হৃদয় বোঝে ও রামতারণের কন্যার সঙ্গে কথা বলছে। নইলে এত গভীর জলের ওপরে আনন্দে পাল তুলে ভাসতে পারত না।

মৃগনয়নী বলে,—আচ্ছা হৃদয়-দা, পুঁটি নিশ্চয় এসেছে।

—তাঁ বোধহয় এসেছে।

—দিদিও আসবে!

—আসবে তো বটেই। এখানকার মত—

—আঃ! চুপ করো বার বার বলছি!

হৃদয় চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে,—তবে যাই।

মৃগনয়নী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হৃদয় ঘর থেকে বেরোয়। পোটলাটা নিয়ে সদর দোরের সামনে যায়।

প্রমদাসুন্দরী বাইরে এসেছে। সরলাও। হৃদয় কারো সঙ্গে কথা বলে না। একবার পিছন ফিরে তাকায়। মৃগনয়নীর ঘরের দোর ভেজানো। মৃগনয়নী বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে দেখছে।

দেখছে, হৃদয় চলে গেল।

চলে গেল।

সরলা ওর ঘরের দিকে আসছে। মৃগনয়নীর ঠোঁট দুটো কাঁপছে থর থর করে। ছোট চৌকো জানালাটার কাছে যায়। জানালার সামনে যে সবুজ কলাপাতাটি বাতাসে দুলত, সেটি আজ কেটে নিয়ে গেছে।

ঘরের দোর খোলার শব্দ হয়। মৃগনয়নী হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ দুটে. তাড়াতাড়ি মুছে নেয়।

কয়েকদিন মৃগনয়নী বনবিহারীর সঙ্গে একটা কথাও বলেনি, বনবিহারীও কথা বলেনি। প্রমদার এমন একটা অন্যায় আদেশে বনবিহারীও যেন লজ্জিত হয়েছিল। ভেবেছিল মৃগনয়নীর তরফ থেকে বহু অনুযোগ অভিযোগ আসবে, কান্নাকাটি শুনতে হবে, উত্তর দিতে হবে। প্রমদার মতের বিরুদ্ধে যাওয়াও চলবে না। বড় মুশকিলে পড়েছিল বনবিহারী। মৃগনয়নী কিন্তু একটা কথাও বলল না। একটুও কাঁদল না, অকারণে হাসলও না।

অতি সহজভাবে ঘরের দোর বন্ধ করে বনবিহারীর পাশে শুয়ে পড়ল; বনবিহারীর দিকে পেছন ফিরে। বনবিহারী বেঁচে গেল। যাক্, কিছু বলতে গেলেই ফ্যাসাদ হোত। ভগবান বাঁচিয়েছে।

পরের দিনও তেমনি কাটল।

পর পর কয়েকদিন কেটে গেল।

বনবিহারী টুঁ শব্দটি করে না। ঘাঁটাতে গেলে নিজেই মুশকিলে পড়ে যাবে। যা অন্যায় তার বিরুদ্ধে কিছু বলতেও সে পারবে না। অথচ মৃগনয়নীর জন্যে মনে একটু কষ্টও যে হচ্ছে না, এমন কথা নয়।

কষ্ট করতে হবে। উপায় কি। প্রমদা তাদের বড় আদরের বোন। ওর মনে কষ্ট দিতে পারবে না।

মৃগনয়নীকে বনবিহারীর ভাল লেগেছে। কিন্তু বউকে খুব ভাল লাগতে নেই, এই বোধটা ওর মনে সজাগ রয়েছে। মাগের ভেড়ো সে হবে না। বউয়ের কথায় চলবে না। এই বোধটা শৈশব থেকে এক তীব্রভাবে মনে শেকড় গেড়েছে, যে এই শিকড়ের মহীরুহ মৃগনয়নীকে তার কাছ থেকে অনেকটা তফাত করে রেখেছে। কোন কারণ নেই অথচ আশৈশব সংস্কারের কি শক্তি! অকারণে একজনকে মনে

প্রাণে না ভালবাসবার কি হাস্যকর চেষ্টা। বনবিহারী কিছুতেই মনের এই ভাবকে ছাড়িয়ে উঠতে পারছে না।

মৃগনয়নী স্বামীর কাছ থেকে একটু সহানুভূতি আশা করেছিল। দুটো মিষ্টি কথা, একটু সান্ত্বনা। কিন্তু বনবিহারী একেবারে পাথর হয়ে আছে। প্রথম কয়েকটা দিন মনটা বড্ড খারাপ লাগে মৃগনয়নীর। একজন যদি আপন করে নেয়, তবে সইবার জোর আপনা থেকে বেড়ে যায়। একজনও কি আপনার নেই? সরলা? না, সরলাও নয়। সরলা মৃগনয়নীকে খাড়া করে তার ওপর এতদিনের অবিচারের একটা প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করছে, সমব্যথী হয়ে সমবেদনা ভিক্ষে করছে।

মৃগনয়নীর মনের দিকে তাকাবার মত চোখ তার আছে কিনা কে জানে, থাকলেও তাকাবার সময় নেই তার। তীব্র অভিমানে মৃগনয়নীর বালিশ যে ভেজেনি এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

কয়েকদিনের ভেতরই ও নিজেকে সামলে নেয়। অভিমান কার ওপর করবে সে। ভালবাসা যেখানে নেই। সেখানে মান অভিমান করা গরম বালির ওপর চোখের জল ফেলা।

মৃগনয়নী স্থির হবার চেষ্টা করে। বাবার মুখখানি স্মরণ করে মাঝে মাঝে। বাবার মুখ যেন ওর ক্ষতের আশ্চর্য প্রলেপ। মনটা ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

কয়েকদিন পরে শুয়ে শুয়ে ও প্রথম কথা বলে,—একটা কথা ছিল।

বনবিহারী জেগে শুয়েছিল। উত্তর দেয় না।

—শুনছ?

উত্তর নেই।

এ পাশ ফিরে বনবিহারীর দিকে তাকাবার চেষ্টা করে মৃগনয়নী। বনবিহারী চট করে চোখ বুঁজে ফেলেছে।

—ঘুমুলে নাকি?

বনবিহারী যেন গভীর ঘুমে অচৈতন্য।

—একটা কথা বলবার ছিল।

বনবিহারীর গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে মৃগনয়নী।

বনবিহারী বিড়বিড় করে একটা হাই তোলে। ঘুম আর ছাড়ে না।

বুকে হাত দিলে মৃগনয়নী টের পেতো যে বনবিহারীর বুক ঢিপ ঢিপ করছে। একে রোগা দুর্বল মানুষ, তার ওপর এই ফ্যাসাদ!

আবার ঠেলা মারে মৃগনয়নী।

বনবিহারী চোখদুটো কচলে পিট পিট করে তাকায়।

—একটা কথা ছিল।

বনবিহারী অস্পষ্ট স্বরে বলে,—কথা! কথা আবার কি? আচ্ছা, কাল শুনব। বলে ওর দিকে পিছন ফিরে চোখ বোজে আবার।

মৃগনয়নী একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে।

পরের দিনও এই ভাবেই বনবিহারী ঘুমিয়ে কাটায়।

আরও কয়েকদিন কাটে।

আজ একটু সকাল সকাল খেয়ে ঘরে ঢুকে দেখে বনবিহারী বসে বিড়ি টানছে। ওকে দেখেই বনবিহারী চমকে ওঠে। এই রে! আজ আর শুয়ে পড়বার উপায় নেই। একটু আগে টের পেলে বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে শুয়ে পড়ত বনবিহারী।

মৃগনয়নী দোর বন্ধ করে কলসী থেকে জল গড়িয়ে নেয়। শিয়রের কাছে জলের ঘটিটা রাখে। রোজই রাখতে হয়। মাঝে মাঝে বনবিহারীর জলতেষ্টা পায় দুপুর রাতে। অবশ্যি এ ক'দিন আর উঠছে না জল খেতে।

মৃগনয়নী এসে বিছানার ওপর বসে।

বনবিহারীর বুক ঢিপ ঢিপ করে। আর একটি বিড়ি ধরায়। যাক্‌গে দু চারটে কড়া উত্তর দিলেই স্ত্রী ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। স্ত্রীকে ঠাণ্ডা করতে হলে মানে একবারে খুব ইয়ের মত কড়া হতে হবে।

বনবিহারী মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে বসে থাকে।

—আজ ঘুমোলে গায়ে জল ঢেলে দে'ব।—হেসে ওঠে মৃগনয়নী।

হাসিটা দেখে একটু আশ্বস্ত হয় বনবিহারী। তবু মুখখানি তখনও গম্ভীর করেই রাখে।

নাকের ভেতর দিয়ে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে।

মৃগনয়নী ওর আরও কাছে এসে বসে।

বনবিহারী খুব কঠিন হয়ে বসে থাকে।

—কি হোল! কেউ কিছু বলেছে?

বনবিহারী এবার মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে।

মৃগনয়নী ওর কাঁধে একটা হাত রাখে। কাঁধের হাড়েতে হাত লাগে। একটু হেসে বলে, কি রোগা তুমি? শরীরের ওপর একটু যত্ন নিলে তো পারো!

বনবিহারী বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে মাটির মেজেতে।

কথা বলচ না কেন ?

—কি বলব ?—এতক্ষণে কথা বলে বনবিহারী।

—একটা কথা বলব ?

বনবিহারী উত্তর দেয় না।

—মামাশ্বশুর কি মাসে মাসে টাকা দেয় তোমাদের ?

মৃগনয়নী শুনেছে মামাশ্বশুর এখনও মাসে মাসে ওদের সাহায্য করে, তাতেই ওদের সংসার চলে। মামার বাড়ীতে মানুষ হয়েছে, মামা বাড়ী করে দিয়েছে।

—কিছু ধানজমি দিয়েছে। কিছু কিছু টাকাও দেয় মাঝে মাঝে।

কথাটা শুনে মোটেই ভাল লাগেনি ওর। বৃদ্ধা শাশুড়ী বলেছেন মৃগনয়নীকে। বলতে বলতে বুড়ীর গলা ভিজে উঠেছে,—ছেলেরা বড় হোল। এখনও ভাইয়ের কাছে হাত পাততে হয় আমার! কি বরাত করেছিলুম মা!

বুড়ী শাশুড়ীর কথাটা ওর মনকে নাড়া দিয়েছিল। সেদিন ও চুপ করেই ছিল।

তারপর কিছুদিন কেটে গেল। পরে পরে ওর মনে হয়েছে,—বনবিহারীকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। দুর্বল বনবিহারী দাঁড়াতে জানে না। তাকে শেখাতে হবে। এ ভার তার। এই রুগ্ন দুর্বল স্বামীর পিছনে তাকেই দাঁড়াতে হবে। ছায়ার মত তার সর্বসত্তায় শক্তি সঞ্চার করতে হবে। এ দায়িত্বে অবহেলা করলে তার ভবিষ্যতে সফল হবার কোন আশাই আর থাকবে না। মৃগনয়নী মরবে, সবাই মরবে। ও জানে ওর বরাত খারাপ। ভবিষ্যতও খারাপ দেখছে। তাই বিবশা হয়ে গা এলিয়ে দিতে ও পারছে না। ওর জমিদারী-স্নায়ুর আবেগ ওকে যে শক্তি দিয়েছে আজন্ম, তাকে কাজে লাগাতে ওর মন উন্মুখ হয়ে উঠেছে। বনবিহারীকে শক্তিতে সঞ্জীবিত করবার পুরো দায়িত্ব ওর। এ শিক্ষা ও শৈশব থেকে পেয়েছে সংসারে। মনে মনে—অন্তরে অন্তরে।

হাসতে হাসতে খুব সহজ হয়েই তাই জিজ্ঞেস করে মৃগনয়নী,—কত টাকা দেয় ?

—তুমি মেয়েছেলে ; তোমার তাতে কি দরকার।—বনবিহারী অকারণে কঠোর হয়।

মৃগনয়নী মনে মনে খুব হাসে। কি হাস্যকর পৌরুষ!

—তবু শুনি না। তোমাদের টাকা তো আমি কেড়ে নিচ্ছি না।

পিঙ্গল চোখ দুটো তুলে তাকায় বনবিহারী। মৃগনয়নীর দীপ্ত চোখদুটোয় প্রসন্ন হাসি। বড় ভাল লাগে বনবিহারীর।

তবু মুখটা গম্ভীর করেই বলে,—কুড়ি টাকা করে দেয়।

—এরপরে যদি না দেয়, তোমাদের কি হবে?

বনবিহারী প্রশ্নটা শুনে একটু হকচকিয়ে যায়,—তা কখনও হয়? ও যে বাঁধা বরাদ্দ!

মৃগনয়নী বনবিহারীর ফরসা একটি লাল তিল লক্ষ্য করে। তার ওপর আঙুল বুলিয়ে বলে, লেখাপড়া তো কিছু নেই। দয়া করে দিচ্ছেন। দয়া না হলে না দিতেও পারেন। তোমাদের কি কিছু জোর আছে?

—দেবে না মানে!—বনবিহারীর মুখটা শুকিয়ে যায় মুহূর্তে। মৃগনয়নী কি ঠাট্টা করছে? এমন গুরুতর ঠাট্টা?

—ধরো না সামনের মাস থেকে কিছু দিলো না। তখন তোমরা কি করবে?

—তখন? হঠাৎ জবাব দিতে পারে না বনবিহারী। কথাটা কখনও ভেবে দেখিনি ও।

তবু বললে,—তখনকার কথা তখন দেখা যাবে।

—তার চেয়ে একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা করো না?

খুব মিষ্টি করে বলে মৃগনয়নী।

—চাকরি! কোথায় চাকরি পাবো?

মৃগনয়নী একটু ভাবে, বলে,—কেন, কলকাতায় গেলে তো চাকরি পাওয়া যায়।

—কলকাতায়?

—হ্যাঁ। ওখানে আমার দুটি পিসতুতো দাদা আছেন। তাঁরা কাজ কচ্ছেন। মাসে মাসে টাকা পাঠান পিসিমাকে।

—কিন্তু,—বনবিহারী যেন এক একটা ঢেউএর ধাক্কা খাচ্ছে।

—কিন্তু কি?

—মানে ওখানে গেলেই তো আর চাকরি মিলবে না।

—কারো বাসায় গিয়ে উঠবে।

—কার বাসায়?

—ধরো আমার পিসতুতো ভাইয়ের বাসায়।

—না, না, কুটুমবাড়ী গিয়ে ওঠা।

একটু ভাবে বনবিহারী। আর একটা বিড়ি ধরায়। কথাগুলি মৃগনয়নী মন্দ বলেনি। মেজদাকে একবার বলে দেখলে হয়। বিড়ির লাল আগুনের আলোয় ওর পিঙ্গল চোখদুটো চিন্তান্বিত দেখায়।

—অবিশ্যি আমাদের এক জেঠতুতো দাদা ওখানে আছেন।

মৃগনয়নী বলে,—তবে তো তার ওখানেও উঠতে পাবো।

—তা পারা যায়। মেজদাকে একবার বলি।

—বলো না। বুঝিয়ে বলবে। চাকরি না করলে তো তোমাদের চলবে না। আজ হোক কাল হোক, করতেই হবে। আগে থেকে চেষ্টা করাই ভাল।

—একটা কথা আছে। বিড়িটায় খুব জোরে একটা টান দিয়ে বলে বনবিহারী।

—কি?

—আমার জেঠতুতো দাদা এনট্রান্স পাস। ভাল চাকরি তো সে পাবেই। আমরা যে পড়াশুনোয় তেমন—

মৃগনয়নী বলে,—তা হোক। সবাই যে পাস হবে এমন কিছু কথা নেই। একবার চেষ্টা করেই দেখো না।

—আমি তো তবু ফোর্থ ক্লাস অব্দি পড়েছি, মেজদা একবার—ইয়ে।

—তুমি ভাশুর ঠাকুরকে বলেই দেখো না?

বিড়িতে সুখটান দিতে দিতে বনবিহারী আবার জিজ্ঞেস করে—তাহলে বলেই দেখি কি বলো?

—হ্যাঁ বলো।

মৃগনয়নী ওর পিঠটা আস্তে আস্তে চুলকে দেয়।

—যদি তেড়েমেড়ে ওঠে? উঠুকগে, তাহলে কালই বলবো। কি বলো?

বনবিহারী কতখানি দুর্বল তা স্পষ্টই বুঝতে পারে মৃগনয়নী। একে নিয়ে সংসারে সকলের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান যে কত বড় কঠিন তা মনে মনে বেশ বুঝতে পারে।

মৃগনয়নী অভয় দেয়,—বলো না তুমি, তোমায় তো আর মেরে ফেলবে না?

—না, তা নয়, মানে যদি আবার ইয়ে হয়।

—কিচ্ছু ইয়ে হবে না।

—তুমি তাহলে বলছো?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি কালই বলবে।

বনবিহারী বিড়ি শেষ করে একটা হাই তোলে।

—আরও ভাবছি।

—কি ?

—সুন্দরী যদি রাজী না হয়।

মৃগনয়নী হাসে,—তোমরা যদি রোজগার করতে পার, সেত আনন্দের কথা। রাজী না হবার কি আছে ?

—যদি বলে বউ পরামর্শ দিয়ে দু'ভাইকে তাড়ালে।

—তা বলবে—আমায় বলবে। তোমাদের তো বলবে না ?

—আবার একটা অশান্তি।

—একটু অশান্তি হলেও পরে অনেক শান্তি হবে। মাইনে পেয়ে ঠাকুরঝিকে টাকা পাঠালেই দেখবে মুখে হাসি।

বনবিহারী টাকা পাঠাবে। কথাটা ভাবতেও বনবিহারীর বেশ ভাল লাগছে। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—তা বটে! মাকেও ওই বলে বোঝাতে হবে।

—মাকে বোঝাবার ভার আমার।

—তুমি পারবে ?

—তা কেন পারব না ?

বনবিহারী খুব খুশী হয়ে ওঠে। মৃগনয়নীর বুদ্ধির তারিফ না করে পারে না। হাজার হোক, অত বড় ঘরের মেয়ে। তার ভাগ্য বলতে হবে। ও বিগলিত হয়ে পড়ে ধীরে ধীরে। বলে এবার নিজেই,—তোমার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে ?

—কেন ?

—আটকে রইলে এখানে ?

মৃগনয়নীর মুখের হাসি মিলিয়ে যায় না। বলে,—কষ্ট আবার কি ? তুমি আছো।

—তা ঠিক! আমি তো আছি। জানো আমি মাকে বলেছিলুম, মা ওর যেন কষ্ট না হয়।

মৃগনয়নী অবাক হয়,—কই মা তো যাওয়া বন্ধ করেনি ?

—এ মা নয়। আমার মা—কালী মা। আমি তো রোজ সন্ধ্যেবেলা কালীতলায় যাই। ওখানে কেত্তন গাইতে হয়। তাই এত রাত হয়।

—তাই নাকি!—মৃগনয়নী এই সরল মানুষটার ভেতর এক নোতুন জগৎ আবিষ্কার করে ফেলে।

—আমি তো বিয়ের আগে মাঝে মাঝে শ্মশানে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকতুম।

—কি করতে?

—কিছু না, গান গাইতুম। গান গাইতে গাইতে কেমন বেভোর হয়ে যেতুম। রাত বেশী হলে মেজদা গালাগাল করতো।

মৃগনয়নীর চোখদুটো বড় বড় হয়ে যায়। কি গান?

বনবিহারী বলে,—এই রামপ্রসাদী। আমার গান শুনলে তোমার তাক লেগে যাবে। তা শোনাব কি করে বলো?

—একদিন খুব আস্তে আস্তে শোনাবে?

—আস্তে? না, আস্তে গান গাইতে আমি পারি না। আচ্ছা, আমি দাওয়ায় বসে একদিন গাইবো, শুনো।

বনবিহারী মুখর হয়ে উঠছে,—মায়ের কথা কিন্তু সবাইকে বলি না। তোমাকে এই আজ বললুম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে মৃগনয়নী,—চাকরির কথা মাকে জানিও।

—তুমি বলছ? মাকে জানাব?

—হ্যাঁ, জানাবে বই কি?

বনবিহারী হঠাৎ খুব খুশী হয়ে বলে,—ঠিক বলেচ, আগে মাকে জানাই, তারপর মেজদাকে বলব। তবে আর গোলমাল থাকবে না।

মৃগনয়নী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে ওর খুশি ভাবখানা। মায়ের কথায় আনন্দে আটখানা।

অজ্ঞাতে একটা শ্রদ্ধার ভাব আসছে মনে, মানুষটা এত সরল, এত দুর্বল, অথচ এত ভাল! দুর্বল! দুর্বল হয়তো নয়। সংসারের গোলমেলে ব্যাপারগুলোকে একটু এড়িয়ে চলতে চায়। অশান্তিকে ভয় পায়।

বনবিহারীকে নোতুন করে দেখছে মৃগনয়নী।

আর একটা হাই তোলে বনবিহারী,—তোমার কোন কষ্ট হলে আমায় বোল।

মৃগনয়নী তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। কথা বলে না। বনবিহারী আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে। মৃগনয়নী ওর দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আকাশ-পাতাল ভাবনায় ওর মাথাটা ভরে ওঠে। ছমাস আগে কোথায় ছিল। কোথা থেকে কোথায় এলো। জীবনে যাকে স্বপ্নেও কখনও দেখেনি তার কাছে পরম নিশ্চিন্তে একা একা বসে আছে, ভাবলে অবাক লাগে।

একে ভরসা করে জীবনের শেষদিন পযন্ত কাটাতে হবে। কে জানে তাই বা কাটান যাবে কিনা, আবার হয়তো জীবনের অন্য কোন বাঁকে পড়ে অন্য কোথাও গিয়ে উঠতে হবে, হতে পারে। কি না হতে পারে সেইটেই ভাবা যায় না।

যৌবনের উচ্ছসিত চাঞ্চল্যের কোঠায় পৌঁছেও মৃগনয়নীর মনে হয় জীবনের আগাগোড়া এক অবধারিত কতকগুলো গিরোয় বাঁধা। বেশী টানাটানি কববার উপায় নেই, তাতে গেরো থেকে স্বতোটা হয়তো ছিঁড়ে যেতে পারে।

কি এক অমোঘ শক্তি এই সাজানো স্বতোর জালের পিছনে বসে নির্মম হাতে জাল বুনে যায় একে অস্বীকার করবার মত যৌবনের নেশা ধরল না ওর এখনও। সবাই কি এমন সব কথা ভাবে? দিদিও কি ভাবে? পুঁটি ভাবে? কে জানে।

শেষ জীবনে মৃগনয়নী বহুবার আমায় বলত, এমনি সব ভাবনাগুলো কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারতুম না। আগাগোড়া জীবনটাকে এক অবাক চোখে ভাল করে দেখবার অভ্যেসটা আমার অল্প বয়েস থেকেই ছিল। এখন তো বুঝি সকলের এ ভাবনা থাকে না। সংসারে আমোদ আহ্লাদে মেতে থাকবার বয়েসটা ভেবে ভেবেই কাটিয়েছি। অনেকে তো মেতেই থাকে।

মত্ততা আমার ছিল না। সাদা চোখে দেখতে পেতুম সব মুহূর্তগুলো। কারণটা কি জানো? আজ বুঝতে পারি কিছু। আঘাতগুলো এত বেশী করে লাগত মনে যে তার কারণ খুঁজতে গিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে হোত। মনটা খুব নরম ছিল কিনা, ছোট আঘাতগুলোও বড় হয়ে লাগত মনে।

চুপ করে থাকতুম। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর বিশ্লেষণের শক্তি ছিল ওর অসাধারণ। অথচ এক অতি সাধারণ মূর্খ মেয়ে মৃগনয়নী! যাক্ ও কথা। এ সংসারে মৃগনয়নীকে ছটা মাস কাটাতে হল শেষ পর্যন্ত।

মাস পাঁচেক কেটে গেল। শরীরে মনে ওর মাস দুয়েক হোল কতকগুলো অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠল ও। সরলা কিন্তু হেসে অস্থির—আনন্দে প্রায় নাচতে বাকী রেখেছে।

বৃদ্ধ শাশুড়ীকে গিয়ে কানে কানে খবর দিয়েছে,—জানেন মা। ন'বৌ পোয়াতি।

বৃদ্ধার জোলো তাল শাঁসের মত চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, সত্যি, বোধহয় মাস তিনেক।

বৃদ্ধার কুঞ্চিত গাল দুটো হাসিতে টান টান হয়ে ওঠে। এত বেশী হাসি বুড়ী বহুদিন হাসেনি,—বলেছি তো লক্ষ্মী বৌ। এমন মেয়ে আমার পেটে হলে ধন্যি হতুম।

বলেই একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়। প্রমদাসুন্দরী আছে কিনা। প্রমদাসুন্দরী তখন পাড়া বেড়াতে গেছে। সকালে বিকেলে ঘণ্টা কয়েক দুটো চক্কর না দিলে অসুখ হয়ে যাবে ওর।

প্রমদাকে বললে বৃদ্ধা।

খবর শুনে প্রমদার গালে হাত। চোখ বড়,—ওমা আমার কি হবে! বলো কি গো! বিয়ে না হতেই হয়ে। এ সব কি মেয়েমানুষ না কুকুর বেড়াল?

বৃদ্ধা সরে যায় সেখান থেকে।

প্রমদা খবরের মত খবর পেয়ে পঞ্চমুখ।

—ঠিক বলে রাখলুম আমি। লিখে রেখে দাও। বছর বছর কুকুরের মত বিয়োবে ও। কি ঘেন্না! কি ঘেন্না! বাবার জন্মেও তো শুনিনি বাছা। এক মাস যেতে না যেতে পোয়াতি!

কথাগুলো কিছু কিছু কানে আসে মৃগনয়নীর। লজ্জায় কালো হয়ে ওঠে মুখখানা।

সরলা বলে,—বংশে পেথম হচ্ছে, তা মুখ কচ্ছে দেখো। হিংসে। হিংসেতে জ্বলে যায়।

ওর ইচ্ছে ভাইরা সব আইবুড়ো থেকে ওকে মাথায় করে রাখত। খুব ভাল হোত। প্রাণ ঠাণ্ডা হোত।

সরলা অন্তর থেকে খুশী। ননদের সম্বন্ধে এমন স্পষ্ট করে আগে বলতে পারত না। আজ বলতে পারছে। আজ কি যেন এক মস্ত ভরসা পেয়ে গেছে। নিজের বন্ধ্যাত্বের বেদনাও যেন অনেকটা কমে গেছে।

মঙ্গলার মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে পাঠিয়ে দেয় বাঁড়ুয্যে বাড়ীর চাল্‌তে তলায়। চাল্‌তে এনে সরষে বাটা দিয়ে মেখে পাথর বাটি করে রেখে দেয় লুকিয়ে।

বিকেলে মৃগনয়নীর চুল বেঁধে দেয়। গা ধুয়ে আসে দুজনে। হাত ধরে নিয়ে আসে নিজের ঘরে।

—ভারি সোন্দর দেখাচ্ছে তোকে।

সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছে মৃগনয়নীকে। দুপুরে একটু না গড়িয়ে পারেনি। ঈষৎ রক্তাভ বড় বড় চোখ দুটিতে এক স্নিগ্ধ মমতার আবেশ। মাজা সাদা মুখখানি। ছোট মসৃণ কপালে আধলার মত একটি সিঁদুরের টিপ।

শরীর মাজা ভারী হয়েছে একটু। মৃগনয়নী সুন্দর হয়ে উঠেছে। নিজের অন্তর দিয়ে আর একটি ছোট্ট জীবনকে পোষণ করবার আনন্দের স্বাদ বড় মিষ্টি। বুক ভরে উঠেছে।

মৃগনয়নী মা হবে!

নারীত্বের পূর্ণ আস্বাদ পাচ্ছে মনে মনে। বেশ বুঝতে পাচ্ছে ও, কাণায় কাণায় ভরা যৌবন নিয়ে পুরুষকে কামনা করেছে, কোন এক পুরুষ ওর পুষ্পিত যৌবনকে নিষ্পেষিত করুক, কেড়ে নিক। ও উদার হয়ে দান করতে চেয়েছে। এ সব কিছুর পেছনেই একটি মাত্র কামনা ছিল, উজাড় করে যৌবন দান করে আমি মা হবো। তুমি ভোগ করো, গ্রহণ করো, আমাকে একটিমাত্র সম্পদ দিও, আমাকে মা করো।

নিশ্চিত জানে মৃগনয়নী. এই কামনাই প্রথম আর শেষ কামনা। এ কামনা যার নেই, সে মেয়ে নয়। যে মা নয়, সে মেয়ে নয়।

মৃগনয়নী বুঝতে পারছে এই একরত্তি জীবনকে লালন করবার অদম্য আগ্রহ ওকে রোমাঞ্চিত করছে, ওকে দিন দিন নমনীয় স্নিগ্ধরূপে ভরে দিচ্ছে। ওর সর্বশরীর গরম, ওর হাত গরম, ওর কোল গরম, ও সন্তানকে পরমস্নেহে স্পর্শ করবে বলে, সন্তানকে নরম কোলে আরামে শুইয়ে রাখবে বলে। ওর সুপুষ্ট স্তনভার নুয়ে পড়তে চাইছে—সন্তানের ছোট্ট ঠোঁট দুটির আশায়। সব লজ্জা খুইয়ে যাকে ও পাচ্ছে, সেই সন্তানের কাছে ওর কোন লজ্জা নেই। ওর লজ্জা কাম-লোভাতুর ইতর দৃষ্টিকে। সন্তানের কাছে ও যেমন উদার উন্মুক্ত, তেমনি ভ্রূকুটি-কুটিল ও লোভীর কাছে। একহাতে বরাভয়, একহাতে খাড়া। মেয়েদের এই তো চিরকেলে রূপ।

মৃগনয়নী নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব করছে। সব সত্যি। এ ভাবনার একটুকুও মিথ্যে নয়। মৃগনয়নী ভেবে আশ্চর্য হয়, এমন কি বনবিহারীকে পর্যন্ত ওর মাঝে মাঝে নিজের সন্তানের মত মনে হয়। এক অবাক মমতায় ওর মনটা ভরে ওঠে। খুব শিশু মনে হয় তখন বনবিহারীকে। তখন বনবিহারীকে ও আদর করে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ঘুম পাড়ায়। জল ভরে রাখে শিয়রের কাছে। শিশু বনবিহারীর দিকে তাকিয়ে থাকে মা মৃগনয়নী। এ এক অদ্ভুত অনুভব।

লোকের কাছে বললে বিশ্বাস করবে না। বলতে গেলে নিজেই লজ্জায় নুয়ে

পড়বে। তবু এ সত্যি। এ তার প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা। সব চেয়ে মজা এই যে এই সময়টা ও বনবিহারীর কাছে সবচেয়ে সহজ হয়ে ওঠে। সব চেয়ে উদার হয়ে যায়। তখন বনবিহারী যা চাইবে, ও তাই দিতে পারে। কিন্তু যখন বনবিহারীকে পুরুষ মনে হয়, স্বামী মনে হয়, তখন ও নিজেরই অজ্ঞাতে কুটিল হয়ে ওঠে। অনেক সময় নিষ্ঠুরার মত কৌতুক করে বনবিহারীকে নিয়ে। তার কামার্ত মনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, খেলায়। একটুও উদার হতে পারে না তখন।

বড়ই অবাক লাগে মৃগনয়নীর। কে জানে সব মেয়েরই এমন হয় কিনা! কিন্তু নিজের জীবনে এভাব মর্মে মর্মে অনুভব করেছে, নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখেছে।

মৃগনয়নী তাই সরলার কথা শুনে মনে মনে হাসে।

—তুই খুব সোন্দর হয়েচিস।

সে সুন্দর হয়েছে, তার পেটের ওই ছোট প্রাণটুকুর জন্যে।

ওকে ঘরে ধরে আনে সরলা। চৌকীর নিচ থেকে পাথর বাটিতে চালতে মাখা বার করে।

—নে খা।

—তুমিও খাও মেজদি।

—ওলো আমি অনেক খেয়েছি। তুই খা। তোকে এখন তো এই সবই খেতে হবে। ভাত তো একটাও মুখে রোচে না।

মৃগনয়নী হাসে,—কেমন বমি বমি লাগে। মাছের বড্ড আঁসটে গন্ধ লাগে।

—আ মরণ! সরলা হেসে ফেলে,—মাছে আসটে গন্ধ লাগবে না তো কি দুধের গন্ধ পাবি?

—বড্ড বেশী আঁসটে। কোনমতে গিলে ফেলি।

—তা না হয় না খাবি, তোর ভাশুরকে বলব তোর জন্যে আলু এনে রাখবে। আলু ভাতে আলু ভাজা করে দেব।

মৃগনয়নী লজ্জায় বলে,—না, না, ও সব আর তোমার ভাশুরঠাকুরকে বলতে হবে না।

—সে যা বলব, আমি বলব। তোর লজ্জা কিসের?

—না, ঠাকুরঝি আবার—,

—কলা করবে। রান্না তো আমার হাতে।

চালতে মাখা মুখে দেয় মৃগনয়নী। খুব ভাল লাগে।

—সব চেয়ে ভাল লাগে—

—কিলো?

লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে মৃগনয়নী।

—কি বল না! আমার কাছে আবার লজ্জা কি?

মুখনীচু করে বলে ও,—উনুনের পোড়া মাটি।

—ও মা আমার কি হবে! সে কি লো! তাই বলি, রোজ উনুন লেপতে গিয়ে উনুনের এপাশ ওপাশ ভাঙা দেখি।

—আমি তো খাই। চালতে খেতে খেতে বলে মৃগনয়নী।

—থাক বাবু, তোমার আর উনুনটা খেয়ে খেয়ে শেষ করে দরকার নেই। আমি ঠাকুরপোকে দিয়ে কুমোর বাড়া থেকে ভাঁড় আনাব। যত খুশী খেয়ো।

খুব হাসতে থাকে সরলা।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। প্রমদাসুন্দরী বেড়াতে বেরিয়েছে। শাশুড়ী বোধ হয় জপে বসেছেন।

ঝির ঝির করে একটু বৃষ্টি শুরু হয়। আকাশটা ঘোলাটে হয়ে রয়েছে। এবার সহজে থামবে না। ঠাণ্ডা বাতাসে গায়ের ভেতরটা শিরশির করে। বাইরে গাছের ডালপালাগুলো বর্ষায় বাতাসে চঞ্চল হয়েছে। টিনের ওপর শব্দ হচ্ছে বর্ষণের। মাঝে মাঝে বড় বড় ফোঁটার টপটপ শব্দ।

সরলা তাকিয়ে আছে মৃগনয়নীর দিকে। মৃগনয়নী মুখ নিচু করে চালতে খাচ্ছে। কারো মুখে কোন কথা নেই।

সরলার মুখটা যেন ক্রমশঃ গম্ভীর হয়ে ওঠে। চোখ দুটো আকাশের মত ঘোলাটে হয়ে ওঠে। হঠাৎ ও মৃগনয়নীর একখানা হাত ধরে ফেলে।

—একটা কথা বলব?

মৃগনয়নী চমকে তাকায়।

—কথা রাখবি?—সরলার গলাটা কাঁপছে।

মৃগনয়নী সরলার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। এত গম্ভীর মুখ সরলার ও কখনও দেখেনি।

—বলো না?

সরলা একটু সময় চুপ করে থাকে।

ঝমঝম করে শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টি বেড়েছে।

সরলা হাতখানা ধরেই বলে,—তোর ছেলে হলে আমায় দিবি?

মুহূর্তে মৃগনয়নীর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

মুখের চালতে বিস্বাদ লাগে। এই জন্যেই কি চালতে খাওয়াল? এই জন্যেই কি এত?

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সরলা কি বুঝে মুখটা নামায়।

মুখ যখন তোলে গাল দুটো ওর জলে ভেসে গেছে।

—আমায় তো ভগবান দিলে না। ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপে। গলা বন্ধ হয়ে যায়।

মৃগনয়নী হঠাৎ উঠে পড়ে। কি ভেবে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বৃষ্টিতে ভিজে চলে যায় নিজের ঘরে। ঘরে গিয়ে দোর ভেজিয়ে দেয়। অন্ধকার ঘরে কেমন ওর ভয় ভয় করে। ঘরের ভেতর চুপ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ। বাইরের বর্ষার মতই সরলার চোখে বর্ষা নেমেছে। সরলার কথাটা সইতে একটু সময় নেয় মৃগনয়নী। নিজেকে ধীরে ধীরে শাস্ত করার চেষ্টা করে। সময় কাটে।

বৃষ্টি ধরে আসছে। গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি পড়ছে তখনও। আকাশটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। মৃগনয়নী আবার ঘর থেকে না বেরিয়ে পারে না। ধীর পায়ে খুব আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে সরলার ঘরের সামনে যায়। ঘর বন্ধ। বাইরে থেকে শিকল সরলা ঘরে নেই।

কোথায় গেল। বুকের ভেতরটা ওর মোচড় দিয়ে ওঠে। সরলার চোখের জলে ভেজা মুখখানি মনের ওপর ভেসে ওঠে ওর। গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টিতে মায়ের ঘরের কাছে যায় মৃগনয়নী। বৃদ্ধা চুপ করে বসে আছে। প্রদীপের আলোয় দেখা যায় সরলা নেই।

রান্নাঘরের কাছে আসে। ল্যাম্পো জ্বলছে রান্নাঘরে। উনুনের কাঠ যোগাড় করে নিয়ে বসে আছে সরলা। পিছনে গিয়ে চুপ করে দাঁড়ায় মৃগনয়নী।

বারে বারে চোখ মুছছে সরলা।

—মেজদি।

মৃগনয়নীর ডাকে সরলা মুখ ফেরায়। চোখ দুটো ওর টুকটুকে রাঙা। কালো গাল দুটো তখনও ভিজে।

—তুমিই মানুষ কোর মেজদি। ছেলে হোক, মেয়ে হোক, তুমি ছাড়া কে মানুষ করবে বলো?

মৃগনয়নী সরলার পাশে গিয়ে বসে।

সরলা কথা বলতে পারে না। নাকের পাতা দুটো ফুলে উঠছে, ঠোঁট কাঁপছে।

মৃগনয়নী ওর হাত ধরে,—চলো চালতে মাখা খানিকটা রয়েছে, ওটা শেষ করে দুজনে রান্নাঘরে আসব।

সরলা ওর সঙ্গে সঙ্গে ওঠে। কিন্তু একটা কথাও বলে না।

সন্ধ্যাটা নীরবে নিঃশব্দে কেটে যায়। রাত্রে আজও বনবিহারীকে ঠেলতে হয় মৃগনয়নীর—কই, শুনছ ?

চোখ দুটো বুজেই বলে বনবিহারী,—বলো, শুনছি।

—বলেছিলে ?

—কি ?

বাঃ! ভুলে গেলে এর ভেতরেই ?

—উ ?

—এমনি শুয়ে বসেই কি চলবে ?

—হুঁ।

মৃগনয়নী আবার বিরক্ত হয়, ঠেলা দেয়,—উ আর হু, কথার উত্তরটাও দেবে না!

বনবিহারী এতক্ষণে চোখ কচলে উঠে বসে,—বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

—আমার যে ঘুম যাবার দশা!

—কেন? কেউ কিছু বলেছে ?

—বলবে আবার কি ?

—তবে ?

—কতদিন ধরে তো বলবো বলবো কোচ্ছ, বলেছ ?

—অ! সেই কথা! মনে পড়ে বনবিহারীর,—না, ঠিক জুত মত সময় পাচ্ছি না। মানে একটু ইয়ে করে বলতে হবে তো।

—আর ইয়ে করেছ।—হতাশ হয় মৃগনয়নী।

একটু থেমে বলে,—তোমাকে তো কত করে বললাম। কলকাতা যাবার খরচা আমি দোব। আমার গয়নাগুলো বেচে টাকা নিয়ে কলকাতায় যাও। কিছু টাকা হাতেও থাকবে। চাকরির চেষ্টা করতে পারবে।

বনবিহারী কানের পাশটা চুলকে নেয়।—মেজদা তোমার গয়নার টাকা নিতে যদি রাজী না হয় ?

—গয়নার টাকা বলবার তো দরকার নেই। তুমি বলবে, আমার কাছ থেকে টাকা পেয়েছ। আমার বাপের বাড়ী তো বড়লোক, ধরে নেবে তারাই না হয় টাকা দিয়েছে।

—ধরলাম না হয়।

আবার বিরক্ত হয় মৃগনয়নী,—তোমাকে ধরতে বলেছে কে ? তুমি তোমার মেজদাকে বলো।

—বেশ মেজদাকে তাই বলব।

—বলবে তো আজ বিশদিন ধরে বলছ।

—কালই বলব।

মৃগনয়নী একটু আশ্বস্ত হয়। বনবিহারীর ফরসা পিঠের ওপর লাল তিলটার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলে,—গয়না কি হবে ? তোমরা যদি চাকরি পাও। টাকা রোজগার করো। গয়না আবার গড়িয়ে দেবে।

বনবিহারী চুপ করে থাকে।

—আর একটা কথা ছিল।

—কি ?

—ওরা তো একখানা চিঠিও দিল না।

—ওরা কারা ?

—বাবা, কর্তাবাবু ওরা।

—তাই তো দেখছি। ভাবছি তোমার গয়না নিলে তাঁরা আবার রাগ করবেন না তো ?

—সে আমি যা হয় বলে ঠিক করে নোব। তুমি একটা কাজ করবে ?

—কি ?

—একখানা খাম এনে দেবে ? কর্তামাকে একখানা চিঠি লিখব। অনেকদিন গেছলাম। ওখানে একবার যেতে ইচ্ছে হয়।

বলতে বলতে গলাটা একটু ভারী হয় মৃগনয়নীর।

বনবিহারী কথা বলে না।

—এখান থেকে যেতে দেয়নি বলে ওরাও বোধহয় রাগ করেছে ?

বনবিহারী একটা নিঃশ্বাস ফেলে,—করতে পারে।

—ভাবছিলুম কি, আমি না হয় একখানা চিঠি লিখি লুকিয়ে।—এতে তোমাদে মান খোয়া যাবে না। আমি কর্তামাকে লিখব নেবার জন্যে লোক পাঠাতে।

—তোমার ছেলে হবার কথাও কি লিখবে?

মৃগনয়নী লজ্জায় একটু সঙ্কুচিত হয়,—ধ্যেৎ! তা কখনও লেখা যায়!

বনবিহারী হাসে,—একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে না হয় লিখো। তাছাড়া তুমি কি লিখতে জানো?

—দ্বিতীয়ভাগ অব্দি পড়েছি তো! একটু একটু পারি। না হয় আমার জবানীতে তুমি লিখে দেবে?

—তা হয় না। ওরা বুঝতে পারবে।

—তবে না হয় আমিই লিখব।

—বেশ, খাম একখানা এনে দোব। আমার কাছে আবার এখন পয়সা নেই।

—আমার কাছে আছে। বিয়ের আশীর্বাদীর টাকার একটা এখনও আছে কয়েকটা টাকা লুকিয়ে রেখেছিলাম।

বনবিহারী খুশী হয়,—বেশ তাই হবে। টাকাটা দিও। আমার বিড়ি দোকানেও ধার হয়েছে এগারো পয়সা। শোধ করে দেওয়া যাবে।

মৃগনয়নীও খুশী হয়। ঝুপ করে শুয়ে পড়ে। বলে,—আলোটা নিভিয়ে দাও।

বনবিহারী উঠতে উঠতে বলে,—বারে বা! আমায় ঘুম থেকে তুলে নিজে শুয়ে পড়ছ। আলোটা নিভিয়ে দেয় বনবিহারী।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে। মনটা ওর চলে গেছে বাবার কাছে। বাবা নিশ্চয়ই জপে বসেছেন এখন। হৃদয়দার কাছ থেকে সবাই সব কথা নিশ্চয়ই শুনেছে। বাবা কিছু বলেন নি হয়তো। চুপ করে জপে মগ্ন হয়ে আছেন।

কর্তাবাবু নিশ্চয়ই রেগে গেছেন। কর্তামা হয়তো বলেছেন,—মেয়েটাকে জলে ফেলে দিয়েছি।

মা হয়তো বলেছে,—ভাবব মেয়েটা মরে গেছে।

সবাই বলবে। ওটা হতভাগী!

মৃগনয়নীর চোখ দুটো ভিজে ভিজে লাগে! চোয়াল দুটো আঁট হয়ে আসে। বনবিহারীর একটা হাত এসে পড়েছে ওর গায়ের ওপর। ভাল লাগে না। হাতটা সরিয়ে দেয়।

দিদি নিশ্চয়ই এর ভেতর দু-তিনবার ঘুরে গেছে। মনে মনে হাসছে মৃগনয়নীর ...র শুনে। আর পুঁটি? আয়না মহলের ছাদে দাঁড়িয়ে চোখ মেলে আছে সামনের ...ন্তরে। সামনে আমবাগান ছাড়িয়ে অনেক পরে সড়ক, তারপর সরু খালের ক্ষীণ ...াত সাদা একটানা সুতোর মত, তারপর ক্ষেত, ধু ধু ক্ষেত। অনেক অনেক দূরে ...র মত সীমানার বটগাছ। তারপর ছড়ান আকাশ। নীলে নীল। নিঃসীম।

মৃগনয়নী মগ্ন হয়ে আছে চোখ বুঁজে।

...-চার বার ঠেলে সাড়া না পেয়ে বনবিহারী ঘুমিয়ে পড়ে।

মেজদাকে অগত্যা বনবিহারীকে বলতেই হোল। টাকা মজুত আছে শুনে রাজী ... মেজদাদা। পৌষ নয়। মাঘ মাসে ভাল দিন দেখে কলকাতায় যেতে কোন ...পত্তি তার নেই। সেখানে যদি চাকরি মেলে, তবে ন'বৌমার টাকাটা ফেরত ...লেই চলবে। ধার হিসেবেই নেওয়া যাক এখন।

...ইতো ধার ছাড়া আবার কি! বনবিহারী আরও খুশী। যাই বলুক না কেন ...। নবৌমা লক্ষ্মী! তা নিজের ইয়ের কথা আর নিজে কি করে বলে বনবিহারী। ...মায়ের কৃপা।

...খানে গিয়ে প্রথম জেঠতুতো ভাই যামিনীর ওখানেই ওঠা যাবে। যামিনীদা নিশ্চয়ই খুশী হবেন? খুশী না হলেও থাকতে হবে। দায়টা এখন ওদেরই। সব ... হলে ঠিকঠাক। পাকাপাকি কথা হয়ে যায়।

কথাটা প্রমদাসুন্দরীর কানে যায়। প্রায় লাফাতে লাফাতে মৃগনয়নীর সামনে ...জির।

মৃগনয়নী রান্নাঘরের কাছে ছিল।

—বলি, হ্যাগা এততেও মন ভরল না? এখন ভাই দুটোকে শহরে তাড়িয়ে দিয়ে ... করবার ফিকির?

চমকে ওঠে মৃগনয়নী। ঘরে বসে বনবিহারী আর ওর মেজদা মুখ চাওয়া-চাওয়ি ...করে।

প্রমদাসুন্দরী বলে চলেছে,—এত জিলিপী প্যাঁচ ভেতর ভেতর? জানো, তোমাকে জন্মের মত দূর করে দিতে পারি? ন'দাকে আমি আবার বিয়ে দোব।

মৃগনয়নী কথা বলে না। বৃদ্ধা শাশুড়ী বেরিয়ে আসেন। সরলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে মৃগনয়নীর পাশে দাঁড়ায়।

—দিব্যি করে বলছি, ন'দাকে আবার বিয়ে না দিই তো আমার নামে গাধা পুষবি। তোকে দূর করে দিয়ে জলস্পর্শ কোরব। পিতিজ্ঞে করে বললুম।

বনবিহারী ঘরে বসে চমকে ওঠে। মেজদা বেরোয় বাইরে।

চ্যালা কাঠ একগাদা শুকোচ্ছিল উঠোনে। প্রমদা রাগে জ্ঞান হারিয়ে একখান কাঠ তুলে নিয়ে আসে,—বল হারামজাদী, কে তোকে আমার ভাইদের তাড়াবার পরামর্শ দিয়েছে। নয়তো আজ তোর হাড়-মাস আলাদা কোরব।

মেজদা তাড়াতাড়ি এসে প্রমদার হাত থেকে কাঠটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বেশ কড়া করে বলে,—বড্ড বাড় বেড়েছিস। বৌমা আমার লক্ষ্মী। ওর গায়ে হাত দিলে সব যে উড়ে পুড়ে যাবে রে পাগলী!

প্রমদা হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে—ওগো দেখে যাও গো। মেজদা আমায় মারলে! নক্কি বউয়ের জন্যে মেরে ফেললে আমায়।

মেজদা আকাশ থেকে পড়ে,—মারলুম কোথায় তোকে?

—হাত মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে। আবার মারলুম কোথায়! মার কি আবার গাছ থেকে পড়বে! ভগবান দেখবে! সব ছারখার হয়ে যাবে। সাতদিন যাবে না। যে আমায় মার খাওয়ালে সে যেন গলা দিয়ে রক্ত উঠে মরে।

আশে পাশের বাড়ীর মেয়েরা ছুটে আসে। মেজদা বনবিহারী আবার ঘরে ঢোকে দোর ভেজিয়ে দেয়। শাশুড়ী ঘরে দোর দেয়।

সরলা ভয়ে ভয়ে বলে,—চ' তোর ঘরে গিয়ে খিল দি।

মৃগনয়নী গম্ভীর মুখে বলে,—কেন মেজদি, ভয়ে?

—হ্যাঁ তাই, আমার গা কেমন কাঁপছে।

মৃগনয়নীর মুখখানা কালো হয়ে উঠেছে। তবু হাসে, বলে—আমার একটুও ভয় করছে না। দু-ঘা মারলে তো আর মরে যাব না।

চোয়ালদুটো ওর কঠিন হয়ে আসে, বলে,—তুমি জানো না মেজদি। ওকে আমি দুদিনে ঢিট করে দিতে পারি।

—চুপ! শুনে ফেলবে!

—শুনিয়েও বলতে পারি।

সরলা ওকে রান্নাঘরের ভেতরে টেনে নেয়। বাইরে উঠোনে প্রমদা চিৎকার করতে থাকে।

শুধু চিৎকার করেই শান্ত হোল না প্রমদা। ওর শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করেছে এবার

সেদিন জলস্পর্শ করলে না। পরের দিন দুপুর পর্যন্ত কিছু খেল না। বুড়ী মা দুবার বলতে গেল। ধমক খেয়ে চলে এল। সরলা একবার ভয়ে ভয়ে গেল।

—ও ঠাকুরঝি!

—দূর হও। দূর হও—প্রমদা মারমুখো। সরলা ভয়ে পালিয়ে এল।

শেষ পর্যন্ত মেজদা আর বনবিহারীকেই যেতে হোল। ছোটভাই গেল পিছন পিছন। ও বাইরের আড্ডায় থাকে বেশী সময়। সাতে পাঁচে যায় না। তবু এ ব্যাপারে যেতে হোল। প্রমদা কি শেষকালে না খেয়ে মরবে। কিছুতেই কিছু খেল না।

—ও বউকে না তাড়ালে জলগ্রহণ করবে না প্রমদা। কিছুতেই নয়।

তা কি করে হয়! অসম্ভব কথা বললে তো চলে না! মেজদা' রাজী হতে পারে না। প্রমদা যা বলছে তাই। নড়চড় হবে না। না খেয়ে মরা যদি কপালে থাকে, তবে তাই হোক। কিন্তু এমন একটা অন্যায় জিদ্ করা কি ঠিক? মেজদা অনেক বোঝাল।

না। কিছুতেই নয়।—দিন কেটে গেল। প্রমদা কিছুই খেল না।

সন্ধ্যায় মেজদা' বনবিহারীকে ডেকে নিয়ে বলাল,—তুই বরং এক কাজ কর।

বনবিহারী সব কাজ করতে রাজী। ন'বৌমাকে নিয়ে তবে বনবিহারী কাল চলে যাক। ওকে বাপের বাড়ী রেখে আসুক। এসে ওর কলকাতায় রওনা হবে।

কথাটা মন্দ নয়। তবে সেধে বউকে বাপে বাড়ী পাঠান'

তা' উপায়ই বা কি!

মেয়েটা কি শেষ অব্দি না খেয়ে মরবে?

কলকাতা যাবার টাকাটা না হয় মেজদার কাছে রেখে যাক বনবিহারী!

না। তা হয় না।

বনবিহারী বলে,—আমি ঘুরে এসে টাকা দোব।

তবে তাই হোক।

পরামর্শটা মেজভাইকে দিয়েছিল সরলা। বড ভাল বুদ্ধি দিয়েছে'

মেজভাই অবশ্য কথাটা ফাঁস করে না। যেন নিজের বুদ্ধিতেই ওর এমন উপায়টা পাওয়া গেছে।

মৃগনয়নীকে রাত্রে বলে বনবিহারী সব কথা খুলে বলে।

বোনটা বড জেদী। একগুঁয়ে। মৃগনয়নী না গেলে হয়তো না খেয়ে মরেই

যাবে। রাত্রেও প্রমদা কিছু খায়নি। মাথায় নাকি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে ওর, মা বললে। মাথায় জলটি দিচ্ছে। মাঝে মাঝে আঁচলটা এঁটে বাঁধছে মাথায়।

—কি আর করা যায় বলো!

মৃগনয়না চুপ করে সব শোনে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

—যা ভাল বোঝ, করো।

এ ছাড়া আর কিই বা বলতে পারে মৃগনয়না। এ ভাবে যাওয়াটা তার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু যাওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি! কি অদ্ভুত কালের প্রভাব! কাল কি হবে, আজ জানা যায় না। গতকাল ভাবতেও পারেনি মৃগনয়না যে আগামী কাল তার এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে। সবই মেনে নিতে হবে। কেন মেনে নিতে হবে প্রশ্ন করাও চলবে না।

একটু হেসে বলে মৃগনয়না,—তোমার মা যে এমন করবেন জানতাম না।

গলায় বেদনার আভাস।

বনবিহারী মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলে,—মা আমার ভালই করছে। দেখো ভাল হবে।

কি বিশ্বাস! এক স্থির আলোর প্রকাশ যেন।

বনবিহারী অকারণে খুশী হয়। ওটা ওর স্বভাবই।

—দেখো না। তোমার গয়নাটা তো আর এখুনি নিতে হচ্ছে না!

—তা বটে।—স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে মৃগনয়না,—হয়তো ওখানে কর্তাবাবুকে জানিয়ে কিছু টাকা পেলেও পাওয়া যেতে পারে।

—তবে তো ভালই হবে। গয়নাটা আর যাবে না। বনবিহারী খুব খুশী।

মৃগনয়নী কথা বলে না।

এমন অকস্মাৎ তাকে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে, ভাবতে কিছুতেই ভাল লাগছে না। ও বুঝতে পারছে, মনের সঙ্গে কোথায় যেন এ বাড়ীর প্রতিটি বিন্দু বাঁধা পড়েছে। মনে টান লাগছে ছেড়ে যেতে। টন টন করছে। আবার কবে এ বাড়ীতে আসবে, কে জানে? মেজদিকে ছেড়ে যেতে হবে। ওকে ছেড়ে থাকতে হবে। আর বুড়ী! নীরব অসহায় বুড়ী শাশুড়ীকে যে সে এ কদিনেই এতখানি ভালবেসেছে, ভাবতেও পারেনি।

ছোট চৌকো জানালাটার কাছে যায়। কলা গাছটা এবার বর্ষায় পচে নষ্ট হয়ে গেছে। চৌকো এক ফালি আকাশ। গাঢ় নীলে ভরা। চোখদুটোয় আকাশের

—ল ছায়া নামে। বড বড চোখদুটো ওর দু-আঙুলে একবার ডলে নিয়ে মুখ ফেরায় মৃগনয়নী।

—কাল কখন যেতে হবে?

বনবিহারী বিড়ি ধরিয়েছে,—এই দুপুরের আগে। খাওয়া দাওয়া সেরেই —ং গাড়ীতে উঠব।

আবার জানালার দিকে তাকায় মৃগনয়নী। ভেতরটা কেমন যাঁকা ফাঁকা —। কোথায় কি যেন একটা কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। শ্বশুরঘর কি হারিয়ে —? স্বামী কি আবার বিয়ে করবে? আর কি এখানে আসা হবে না? মনটা — হয়ে ওঠে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মৃগনয়নী। মুখ ফিরিয়ে দেখে। বনবিহারী শুয়ে —পড়েছে। ও আলোটা বাড়িয়ে তোরঙ্গটা খোলে। কাপড় চোপড় আজ —রে রাখলেই ভাল। কাল সময় পাবে কিনা কে জানে। আজই সব গুছিয়ে —বে।

রাত কেটে যায়। পরদিন সকালে বাড়ীটা যেন থমথম করছে। কেউ কারও —র কথা বলে না। মৃগনয়নীও হাসতে পারে না আর। গম্ভীর হয়ে যায়।

সরলার মুখটা একরাত্তিরেই যেন শুকিয়ে গেছে। চোখদুটোয় নিদারুণ অসহায় —। কোন কথা বলে না সরলা। মুখ নীচু করে কাজ করে যায়। খাওয়া শেষ —। মৃগনয়নীও খেয়ে নেয়। গলা দিয়ে ভাত আর নামে না। দুটিখানি খেতে — উঠে।

—বার সময় হয়ে এসেছে। বাইরে গরুর গাড়ীতে মাল তুলছে গাড়োয়ান। —বিহারী মালপত্র তুলতে ব্যস্ত!

এবারে তাহলে প্রস্তুত হতে হয়। বনবিহারী তাড়া দেয় একবার।

সরলা ঘরে গিয়ে খিল দিয়েছে। কেন কে জানে? মৃগনয়নী মাথার ওপর —টা তুলে সরলার ঘরের দিকে এগোয়।

ঘর ঠেলে। বন্ধ।

কি হোল? ও মেজদি! মেজদি!

কিছুক্ষণ ডাকবার পর দোর খোলে সরলা। চোখদুটো ফুলো ফুলো রাঙা। —ক কেঁদেছে। অনেকক্ষণ।

মৃগনয়নী প্রণাম করে। মুখখানি থমথমে মেঘলা।

সরলা কথা বলতে পারে না। সর্বশরীর ওর কাঁপছে। নিজেকে সামলে নি ওখান থেকে বেরিয়ে শাশুড়ীর ঘরে যায় মৃগনয়নী। শাশুড়ী গালে হাত দি বসেছিলেন দাওয়ার ওপর। মুখ আমসীর মত বিশুষ্ক।

মৃগনয়নী প্রণাম করে। বুড়ী দুহাত মৃগনয়নীর পিঠের ওপর রাখে।

ফিসফিস করে বলে,—আমাকে আর দেখতে পাবে না মা। আমি আ বাঁচব না। বুড়ীর অসহায় ভোলো চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে নিজেকে আ চেষ্টা করে সামলায় মৃগনয়নী। ওখান থেকে সরে আসে।

উঠোনে মেজভাশুরকে প্রণাম করে। ছোট দেওর ওকে প্রণাম করে।

আস্তে আস্তে এগোয় বাড়ীর বাইরে গরুর গাড়ীর দিকে। পিছন ফি ঘরগুলোর দিকে তাকায় একবার। তাকায় রান্নাঘরের দিকে।

বুকের ভেতরটা মোচড়াতে থাকে যেন। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নেয়। বাই গিয়ে গরুর গাড়ীতে উঠে বসে।

দুর্গা। দুর্গা। গরুর গাড়ী চলতে শুরু করেছে। ফুল গাছটা পেরিয়ে য তারপর বেতঝোপ। মঙ্গলার মায়ের ঘর পেরিয়ে গেল। পেরিয়ে গেল ওদের নি স্নান করবার গা-ধোবার পুকুর। মৃগনয়নী চোখে দেখতে পাচ্ছে না আর। ঝাপসা। বনবিহারী শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাকায়। দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপি ফুঁপিয়ে কাঁদছে মৃগনয়নী। আশ্চর্য!

বনবিহারী পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরায়।

আট

ভাগ্যি মানুষ ভুলে যেতে পারে। জীবনে বহুবার মৃগনয়নীকে বলতে শুনেছি—ভাগ্যি ভুলে যাওয়া যায়। ভাগ্যি সব মনে থাকে না। নইলে মানুষ বড় ব আঘাতের স্মৃতিগুলোর ব্যথাবেদনায় মরে যেত।

কথাটা যে কত বড় সত্য নিজেও টের পেয়েছি। মৃগনয়নীর কাছে সত্য উদ্ভা হয়েছে অভিজ্ঞতার আলোয়।

মানুষ যদি কিছুই ভুলে না যেত, জীবনের বড় বড় বেদনা, কঠোর অভাবের ক সবসময় তাকে জ্বালিয়ে দিত। কালের প্রলেপ পড়ে স্মৃতির ওপর। ভুল হ

যায়। অতীত বিলীয়মান হয়ে যায়। তা না হলে সংসারটা দুদিনে নরক হয়ে উঠত।

কাল তার নির্মম হাতে সব বেদনার চিহ্ন ধুয়ে মুছে দেয়। আবার স্নিগ্ধ সরস করে তোলে মানুষকে। আশ্চর্য তাঁর কঠোর করুণা। যেমন কঠিন, তেমনি করুণ। সংসারের সব বিধানের ভেতর এমন শুভ বিধান বোধহয় দুটি নেই।

না জেনে কত আক্ষেপ করি! কেন ভুলে গেলাম। জীবনের সবচেয়ে যে প্রিয়, তাকে কেন ভুলে গেলাম। জীবনে অনেক মুহূর্তে যাদের কাছে অনেক পেলাম, দিলামও অনেক, তাদের কেন ভুলে গেলাম! কেন ভুলে যেতে হয় অনেক ভালবাসা সুখের দিনগুলো!

এ আক্ষেপ—আক্ষেপই। ভুলে না যেতে পাবার চেয়ে যন্ত্রণা সংসারে কল্পনা করা যায় না। মৃগনয়নীর জীবনের বহুদিনের কাহিনী এ সত্য প্রকাশ করে দিয়ে গেছে।

ভুলে যেতেই হবে। মৃগনয়নীও ভুলে গেল ধীরে ধীরে ওর শ্বশুরঘরের অনেক স্মৃতি। বাপের বাড়ী পৌঁছে প্রথম প্রথম সরলার ভ্রমর কালো মুখখানা, সজল ম্লান চোখদুটো কিছুতেই ভুলতে পারত না ও। শাশুড়ীর শেষ কটি কথা ওর চোখদুটোকে ভাসিয়ে দিত জলে। কিন্তু কদিন? মাত্র কয়েকটা দিনেই ভুলতে শুরু করল মৃগনয়নী।

দিনদুই মাত্র থাকবে বনবিহারী। কথাটা কর্তাবাবুকে বলতে হয়। কর্তাবাবু বছর খানেকের ভেতরেই যেন অনেকটা স্থবির হয়ে গেছেন। কাণের একটু গোলমাল হয়েছে। জোরে না বললে শুনতে পান না।

নায়েব মশাইকেই কথাটা চেঁচিয়ে বলতে হয়।—জামাই বলছে কাল চলে যাবে।

—কাল? কর্তাবাবু ঘাড় নাড়েন,—না, তাকি হয়। কতদিন পর এলো। দিনকতক থেকে যাও বাবা।

কর্তাবাবুর মুখের ওপর কথা বলা চলে না—এটা যেন চিরকালের নিয়ম।

বনবিহারীও কথা বলে না।

মনে মনে একটু খুশীই হয়। যে-কটা দিন থাকা যায়। এর পর আর কতদিন মৃগনয়নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না— কে জানে।

দিন সাতেক থাকাই ঠিক করে ফেলে বনবিহারী।

রাত্তিরের আগে মৃগনয়নীর মুখ দেখার উপায় নেই। বাইরের ঘরগুলোতেই শুয়ে বসে কাটাতে হয়। বসে বসে বিড়ি টানতে হয়। বিড়ির পয়সা নায়েব-মশাইয়ের কাছ থেকে নেয় হৃদয়। দরকার হলে শুধু হৃদয়কে বলা, এক বাণ্ডিল নিয়ে এসো ত' হে!

রাত্তিরে শুতে যাবার জন্যে ডাকতে আসে হৃদয়। তাও অনেক রাত্রে। এ বাড়ীর খাওয়া চুকতে চুকতে রাত দেড়টা। প্রায় দুটোর সময় শুতে যাওয়া। এ নিয়ম। রাত নটা দশটা তো সন্ধ্যে। বিকেলের জলখাবারের ক্ষীর চিঁড়ে তখনও পেটে পাক খেতে থাকে। কাজেই খেতে যেতে হয় বারোটায়। কখনও সাড়ে বারোটায়।

মৃগনয়নী মাকে একবার বলবে ভেবেছিল,—রোগা মানুষ। অত রাত্রে শোওয়া সইবে না! বলতে কিন্তু পারল না। কিছুতেই পারল না বলতে।

শুতে সেই রাত দুটো। ভোরে উঠতে হয় আবার। রোদ্দুর ওঠবার পর যদি ঘরের দোর বন্ধ থাকে, তবে তার রক্ষে নেই। কর্তামা খুড়িমা ওরা তাকাবে বিরক্ত হয়ে। আর সমবয়েসী বৌ বোনদের মুচকী হাসির জ্বালায় টেকা যাবে না। দেখবে আর হাসবে।

মৃগনয়নীকে ভোরে উঠে বেরোতেই হয়। বনবিহারী দোর খোলা ঘরে একা একা কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে আরও। অত ভোরে কিছুতেই উঠতে পারে না।

তাতেও বৌঠান বলে বসে মৃগনয়নীকে—আহা বেচারীকে বোধহয় একদম ঘুমুতে দাও না?

—ধ্যেৎ! বড্ড বাজে বলো! —মৃগনয়নী চটে যায়।—যার যা অভ্যেস। অত রাতে শুয়ে ভোরে উঠতে ও পারে না।

বৌঠান তবু হেসে বলে যাবে,—কর্তামাকে বলি তবে তোমাদের সন্দে-সন্দি শোবার ব্যবস্থা করতে। বলেই চলে যায়।

মৃগনয়নী বিরক্ত হয়। জানে বৌঠান বলবে না। তবু বিরক্ত হয়।

পুঁটি আজ মাস তিনেক শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে। নিতে আসেনি এখনও শ্বশুরবাড়ী থেকে। তরঙ্গিণী আসেনি। একবার এসে দিন সাতেক ছিল তাতেই নাকি অস্থির।

—না গেলে ওরা রাগ করবে কর্তামা।

কর্তামা হেসে বলেছিলেন—পাগলী! এর ভেতর শ্বশুরঘরের ওপর এত টান!

কিছুতেই থাকবে না তরঙ্গিণী। পুঁটিকে নাকি বলেছে ও,—যাই বলিস ভাই, থাকতে পারি না ওকে ছেড়ে। মাথা-টাথা সব গরম হয়ে যায়।

পুঁটি অবাক। বৌঠানও টিপ্পনী কাটে। তরঙ্গিণীর ভালই লাগে।

বিয়ের পর রূপ যেন ওর ফেটে পড়ছে। আরও গতরে ভারী হয়েছে। রঙ হয়েছে যেন পাকা সিঁদুরে আমের মত। চোখে যেন দুটো কালো ভ্রমর ভাসছে! উড়ি-উড়ি। পালাই পালাই ভাব। ফুলের খোঁজে উধাও। ফুলের ওপরে ধীর। ...গে অস্থির।

—থাকতে-টাকতে পারব না বাপু!

চলে যায় তরঙ্গিণী। ওর বর এসে নিয়ে যায় ওকে। সুশীলকে বৌঠানের সামনেই নাকি ধমকে উঠেছিল।—না এলেই পারতে! জন্মভোর থাকতুম এখানে।

সুশীল মাথা চুলকেছিল। বৌঠান হেসে লুটোপুটি। পুঁটি দেখে স্তম্ভিত। ঢেকঢেক করে জল খেয়ে ফেলে এক গেলাস।

ভাবগতিক বুঝতে পেরেছিল কর্তামা ওরাও। কেউ আর অমত করলে না। পরের দিনই সুশীলের সঙ্গে তরঙ্গিণী চলে গেল। আর আসেনি।

পুঁটি মাস তিনেক এসেছে। একা একাই থাকে বেশীর ভাগ সময়। বৌঠান ওরাও কাছে ঘেঁষে না বেশী। ওর কাছ ঘেঁষে আরাম নেই। মজা নেই। হোত তরঙ্গিণী? হাসিয়ে নাচিয়ে অস্থির করে তুলত।

মৃগনয়নী এসে পুঁটিকে দেখে খুব খুশী,—খুব কিন্তু রোগা হয়ে গেছিস পুঁটিদি! পুঁটি ভয়ে ভয়ে তাকায় ওর দিকে।

—ওকিরে! অমন করে তাকাচ্ছিস কেন?

ও কথার জবাব না দিয়ে পুঁটি বলে,—তোকে বুঝি এ্যাদ্দিন ছাড়ে নি?

—না, তা নয়। আমিই আসিনি। আসবার লোকও ত চাই! দূর ত' কম না!

—তা বটে! ওখানকার সবাইকে কেমন লাগলরে?

—ভাল। খুব ভাল লেগেছে। আমার জা'র মত মানুষ হয় না।

—আর আমার জা'। ওরে বাবা! আমার বিয়ের পর থেকেই বলে বাড়ীঘর ভাগ করো। আর আমার দিকে এমন চোখ বড় বড় করে তাকাত ভাই!

পুঁটির ভয় দেখে মৃগনয়নী হেসে ফেলে—অত যদি শখ তবে ভাগ করতে বললেই পারতিস।

—কি হবে বলে!—পুঁটির স্বরটা একটু অস্বাভাবিক মনে হয়।

—কেন? বলবি তোর বরকে!

—বরকে? ম্লান হাসে পুঁটি।

মৃগনয়নীর একটু কেমন কেমন লাগে ওর ভাব-সাব। চট করে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না।

হঠাৎ কানের কাছে মুখটা এনে পুঁটি বলে,—হ্যাঁরে। তুই নাকি পোয়াতি? বৌঠান বলছিল।

চোখদুটো নামায় মৃগনয়নী। ঘাড় নাড়ে।

পুঁটির মুখটা যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বলে তেমনি ফিস্‌ফিস করে,—ক' মাস

—চার। দিদির খবর কিরে? ও নাকি বরকে ছেড়ে একদম থাকতে পারে না?

—না। তুই?

—কি করে বুঝব বল?

—তবু কি মনে হয় তোর?

মৃগনয়নী একটু চুপ করে থেকে বলে,—মনে হয়? মনে হয় রোগা মানুষ। এখান থেকে এ মাসেই কলকাতা যাবে। অসুখ বিসুখ কিছু হয়ে পড়ে যদি। ভয় হয়। বলতে বলতে সত্যিই মৃগময়নীর গলাটা একটু নরম হয়ে আসে। পুঁটি কথা বলে না। নিজের মনেই কি যেন ভাবে। মৃগনয়নী পা দুখানা মুড়ে ওর পাশে ভাল করে বসে। কতদিন পরে পুঁটিদির সঙ্গে নিরালায় আলাপ!

—মানুষটা বড় দুবল। বাড়ীতেও ওকে কেউ মানে না। বাইরেই থাকে বেশী।

বনবিহারীর গালভাঙা মুখের ওপর পিঙ্গল চোখদুটি ওর মনের ওপর পরিষ্কার ভেসে ওঠে।

—আর এমন সোজা মানুষ আমি কখনও দেখিনি। একটু যদি সংসারী বুদ্ধি থাকে!

—তাই নাকি?—পুঁটিও সরে আসে ওর আরও কাছে।

—হ্যাঁ, এখন ত' সবকিছু আমাকেই বলে কয়ে করাতে হয়।

—তোকে বুঝি খুব মানে?

মৃগনয়নী একটু রাঙা হয়ে ওঠে,—ঠিক তা নয়। মানে নিজে ত' ওসব বোঝে না। যদি বলি ছেলেপুলে হলে কি করে চলবে? বলবে,—মা জানে।

—মা কে? তোর শাশুড়ী?

—না। ও আবার মা কালীর ভয়ানক ভক্ত কিনা?

—সত্যি? বড় সুন্দর মানুষটি ত'?

স্বামীর প্রশংসায় মৃগনয়নীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বলে,—মনটা একেবারে সাদা। দোষের ভেতর একটুও ভাবনা চিন্তা করবে না।

পুঁটির কিন্তু খুব ভাল লাগে বনবিহারীর কথা শুনতে। বলে,—ভাবনা চিন্তা বেশী নাই বা করল?

—তা কখনও হয়? সংসার করতে গেলে সবই ভাবতে হয়।

—তা বটে।—পুঁটি সায় দে অগত্যা।

মৃগনয়নী চুপ করে বসে থাকে। কলকাতায় গিয়ে বনবিহারী যদি ভাল একটি চাকরি পায়। তবেই মঙ্গল। কলকাতায় বাসা করবে। ছেলে কোলে নিয়ে ও উঠবে নোতুন বাসায়। নোতুন বাসা! কথাটার ভেতরও যেন এক রোমাঞ্চকর নোতুন স্বাদ আছে। কি যে আস্বাদ মুখে বলে বোঝাতে পারে না ও।

পুঁটির দিকে তাকিয়ে আপনমনেই একটু হেসে ফেলে। চাপা খুশি উপচে পড়ে ওর চোখে মুখে। হঠাৎ পুঁটির মুখটার দিকে নজর পড়ে। পাংশু মুখে বসে আছে ও।

—পুঁটিদি!

পুঁটি তাকায়।

—তোর বর কবে আসবে রে?

পুঁটি ভীতু চোখ দুটো তুলে তাকায়,—জানি না ত'।

—সেকিরে! কিছু বলেনি?

—না।

—কেন? কবে আসবে, করে নেবে, কিছু বলেনি?

পুঁটি চোখদুটো নামায়।

ঝগড়া হয়েছে বুঝি?—মৃগনয়নী জিজ্ঞেস করে।

—ঝগড়া!—পুঁটি চোখ তোলে,—কই না ত'?

—তবে? আসবার আগে কিছু কথা হোল ত'?

—কথা হয়েছে।

—বল না। কি কথা?

পুঁটি চুপ করে থাকে একটু সময়। কি যেন ভাবে অন্যমনস্ক হয়ে।

—কি ভাবচিস? আমার কথা সব শুনে নিজের কথা কিছু বলবি না?

পুঁটির মুখটা ম্লান হয়ে যায়। মৃগনয়নীর হাতখানা নিজের রোগা ঠাণ্ডা হাত দুটো ভেতর নেয়। একটু চাপ দের সস্নেহে। বলে,—আমার যে কিছু বলবার নেই ভাই

মৃগনয়নী কৃত্রিম রাগে হাত ছাড়িয়ে নেয়।

বলে,—বললেই ওমনি বিশ্বাস করব।

পুঁটি মুখখানি নীচু করে বসে থাকে।

আস্তে আস্তে বলে,—ও ত' কথা খুব কম বলে।

—তুই ও বলতিস না?

—আমার কথা বলতে ভয় করত।

—কেন?

মৃগনয়নীকে কি আর বলবে! বেদনায় ওরও মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে। বড় বড় জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে চোখ থেকে গালের ওপর।

মৃগনয়নী অবাক হয়ে বলে,—সেকি পুঁটিদি। কেন?

—ও যা চাইত, আমার কাছ থেকে পেত না। ওকে দেখলেই রাত্তিরে তখনি কাপড় মুড়ে কুঁকড়ে পড়ে থাকতুম।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে।

—বড্ড ভয় করত ভাই, বিশ্বাস কর।

পুঁটি চোখদুটো তোলে,—কি আর বলব বল? আমাকে বিয়ে করে ও সুখী হয়নি শেষ অব্দি রাত্তিরে—

বলতে বলতে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে পুঁটির পাণ্ডুর গালের ওপর,—শেষ অব্দি রাত্তিরে আমায় মারত। পিঠে লাথি মেরে ঘর থেকে বাগানে বেরিয়ে যেত অনেক রাত্তিরে। তবু আমি—!

গলাটা বন্ধ হয়ে আসে পুঁটির।

এক পশুর কাহিনী শুনছে মৃগনয়নী। মৃগনয়নীর চোখদুটোও জলে ভরে ওঠে পুঁটির চোখের জল অনেক পড়ে। অনেক। আঁচলে চোখ মোছে। আবার গালদুটো ভিজে যায়। অনেক সময় কেটে যায়। একবার ডাকে মৃগনয়নী —পুঁটিদি।

পুঁটি চোখ তুলতে পারে না।

এখন তুই কি করবি পুঁটিদি?

পুঁটি সময় নেয়। আরও সময় নেয়।

মৃগনয়নীও ওকে সময় দেয়।

অনেক পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনা গলে পড়ছে আজ। এতদিন কাউকে এ কথা বলতে পারেনি পুঁটি। জমাট আক্ষেপের ভারে নুয়ে পড়ে সময় কাটাচ্ছিল। আজ বুকটা যেন অনেক ফাঁকা লাগছে।

মৃগনয়নী ওকে বাঁচাল। মৃগনয়নীর হাতখানা আবার ধরে ওঠে। হাতদুখানি ওর বরফের মত ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে একটু একটু কাঁপছে। মৃগনয়নী নিজের হাতের মধ্যে ওর হাত দুখানা নিয়ে চেপে ধরে।

—কি করবি পুঁটিদি?

পুঁটি বলে, আচ্ছা, রোজ শিব পুজো করতে বড্ড মন চায় কেন বলত?

—তবে শিব পুজোই কর।

পুঁটি চুপ করে থাকে।

—তাই কর পুঁটিদি। কাল থেকেই কর।

পুঁটি তেমনি চুপ করে বসে থাকে।

মৃগনয়নী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে বলে,—তোর বিয়ে না হলেই ভাল হোত।

—ঠিক বলেছিস। একটুও ইচ্ছে ছিল না আমার।

মনের মত কথা শুনে একটু মুখর হয়ে ওঠে পুঁটি,—সত্যি বলছি, সংসার করতে একটুও শখ হয় না। ওসব আমোদ যেন ভালই লাগে না।

ওর মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকে মৃগনয়নী। মনে মনে ভাবে, আশ্চর্য।

রাত্রে বনবিহারীকে বলছিল মৃগনয়নী,—আশ্চর্য মেয়ে পুঁটিদি। বলে সংসার করতে একটুও ইচ্ছে করে না।

—তাই নাকি! বনবিহারী বিড়ি ধরিয়ে পুঁটির কাহিনী শুনছিল।

—আমার ত বাপু অদ্ভুত লাগে। ওর এমন কেন বলোত?

বনবিহারী বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে। বলে—কে জানে! মায়ের ইচ্ছে। আমরা কি করে বুঝব বলো? কাল বাদে পরশু তো চলে যাচ্ছি। তোমার মনটা খারাপ লাগছে না?

মৃগনয়নী চুপ করে শুয়ে থাকে।

বনবিহারী বলে,—আমার কিন্তু মনটা বড্ড ইয়ে লাগছে। কি রকম জানো, মানে ইয়ে মত লাগছে।

—থাক আর বোঝাতে হবে না! হেসে ফেলে মৃগনয়নী বনবিহারীর অবস্থ দেখে।

বনবিহারী ব্যথিত হয়,—তুমি হাসছ?

—তবে কি ডাক ছেড়ে কাঁদব? শোন চুড়ি বার গাছা দিয়ে দোব। ওখানে বিক্রি করতে পারবে তো?

বনবিহারী বিড়ি ধরায়,—তা পারা যাবে।

—দেখো ঠকে যেও না যেন। ওজনটা ঠিক দেখে নেবে। তুমি যা মানুষ!

বনবিহারী বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে।

—ওখান থেকে কলকাতা যাবে কবে?—জিজ্ঞেস করে মৃগনয়নী।

—দিনকতকের ভেতরেই।

—দিনকতক মানে মাস দুইও হতে পারে।—বলে মৃগনয়নী।

বিড়ি কেমন তেতো লাগে। ছুড়ে ফেলে দেয় বনবিহারী। বলে,—এই ধরো হপ্তা খানেকের ভেতরেই রওনা হবো।

—চিঠি দিও কিন্তু।

—হ্যাঁ, দোব। তোমার নামেই দোব?

—তবে আবার কার নামে দেবে?

—না, এমনি বলছিলুম? তোমার নামে চিঠি দিলে যদি কোনও কথা ওঠে।

মৃগনয়নী ঠোঁট ওলটায়,—ওঠে তো উঠবে। ভারি বয়ে গেল। চিঠি না দিলে চলবে না।

বনবিহারী একটা হাই তোলে।

—চলে গিয়ে আর যে খোঁজ খবর করবে না, তা চলবে না।

বনবিহারী তাকায় মৃগনয়নার দিকে। প্রদীপের আলোয় চোখ দুটোয় ভয়ের ভাব দেখতে পায় স্পষ্ট।

—অত ভয় কিসের?

উত্তর দেয় না মৃগনয়নী। বনবিহারীর হাতটা কাছে টেনে আনে। ওর রোগা ফরসা হাতখানা নিজের মুখের ওপর রাখে। চোখের ওপর। তারপর ফিসফিস করে বলে,—পুঁটিদিকে দেখে ভয় করে।

বনবিহারী হাসে। ওর ভয়েতে বনবিহারীর আনন্দ হয়—খুশীও হয়।

শুধু বলে,—খেপেছ!

মৃগনয়নী ওর হাঁটুদুটোর কাছে মুখটা আনে। শুয়ে পড়ে। বনবিহারী চুপ করেই থাকে।

আজ যে মানুষটা কাছে বসে আছে, এত কাছে। পরশু আর সে থাকবে না। ...ক দূরে চলে যাবে। আবার কবে আসবে কি আসবে না কে জানে! কলকাতা ...বে যাবে, সেখানে শোনা যায় মেয়েমানুষরা যাদু জানে। শেষকালে যদি একেবারে ... দেয় সব কথা। মৃগনয়নীর কথাও।

...সব বোধহয় বাজে কথা। বাবাকে একসময় জিজ্ঞেস করবে মৃগনয়নী। বাবা ...র কলকাতায় গিয়েছিলেন এক মোকদ্দমার ব্যাপারে। বাবা ঠিক বলতে ...রেন শহর কলকাতার হাবভাবগুলো। জেনে রাখা ভাল।

...নবিহারী চাকরি পেয়ে, অনেক টাকা রোজগার করে যদি এদিককার কথা সব ... যায়, বদলে যায় টাকার গরমে? তবে কি পাঠাবে না কলকাতায়! দেবে ...না! না তা কি করে হয়! নিজের স্বার্থের জন্যে সে একটা এতবড় সংসারকে ...রবে? মামাদের পালিত হয়ে গ্রামের এক অতি দরিদ্র পরিবার হয়েই থাকবে ...ল। তবে আর তার ভাগ্য ভাল বলবে কেন সবাই। পোড়াকপালের বদনাম ...ও বইতে পারবে না। ছোটবেলা থেকে বয়েছে। আর নয়। তাতে যা হয় ...। চেষ্টা ওকেই করতে হবে, এতে কপাল যদি একেবারে পোড়ে ত' পুড়বে। ...নীর মনটা বেশ কঠিন হয়ে ওঠে এবার।

...নবিহারীর হাঁটুর ওপর থেকে মুখটা তুলে নেয়। বালিসের ওপর মুখ রাখে। ...রা পাশে শুয়ে চুপ করেই থাকে।

...পটার বুক পুড়ে যাচ্ছে। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয় মৃগনয়নী। ঘরের অন্ধকার ... হয়ে আসে। বাতাস নেই আজ। একটু গরম লাগে। কানদুটো দিয়ে ... বেরুচ্ছে যেন। হাতের তালু জ্বলছে। পায়ের তালুও। বনবিহারী পাশ ...রে।

—ঘুমুলে?—জিজ্ঞেস করে মৃগনয়নী।

—না।

—চাকরি পেলে—।

—কি বলো। থামলে কেন?

—চাকরী পেলে প্রথম মাইনে থেকে পাঁচটা টাকা পাঠাবে?

—কেন বলোত?

মৃগনয়নী উত্তর দেয় না। বনবিহারী আস্তেই আবার জিজ্ঞেস করে,—কেন?

—পুজো দোব। মা কালীকে।

বনবিহারী ভারি খুশী,—নিশ্চয়ই পাঠাব। ঠিক পাঠাব। চাকরি যদি হয় মায়ের ইচ্ছেয়। ঠিক পাঠাব।

ঠিক জায়গায় ঘা পড়েছে। ইচ্ছে করে যে মৃগনয়নী কথাটা বলেছে তা নয়, হঠাৎ মানত করেছিলো, তাই বললো। কিন্তু কথাটা যে বনবিহারীর মর্মে গিয়ে স্থায়িভাবে বসে যাবে ধারণাও করতে পারেনি। এখন বোঝে যে বনবিহারী চিরদিন মনে রাখবে কথাটা। মৃগনয়নীর জন্যে নয়। ওর মায়ের জন্যে। মা বলতে আনন্দে ভরে ওঠে বনবিহারী শিশু সন্তানের মত।

মাঝে মাঝে মৃগনয়নীরও ভাবটি বড় ভাল লাগে। বড় সহজ মনে হয়।

আজীবন নানা ভাবতরঙ্গে উঠে নেমে মৃগনয়নী একথা স্থির জেনেছিল যে সহজ হওয়া বড় সহজ নয়। সংসারের ভাববিলাসে মত্ত হয়ে উঠলে মনের অনেক ত্রিকোণ চতুষ্কোণ ভাব থেকে এড়ান যায় না। মাঝে মাঝে বেঁকে মুচড়ে ওঠে মন। অনেক অস্থির হয়ে যেতে হয়। কোন কোন তীব্র ঘটনা মনের সতীব্র বেগ সামলান কঠিন হয়ে পড়ে। সহজ হওয়া বড় সহজ নয়।

শেষ জীবনে একথা মৃগনয়নী বহুবার বলত আমায়—। ওর ভেতরে ঘোরপ্যাঁচ ছিল না। এত সরল আর সহজ হতে পারত কি করে ভেবে আশ্চর্য হতুম। অনেক দেখে দেখতাম। খুব কঠিন বিপদে পড়লেও ও একটুও ভেঙে পড়ত না। বিশ্বাসের এক অসাধারণ শক্তি এসে পড়ত ওর ভেতর। বলত, মা যা করেন, তাই হবে। মায়ের ওপর কি যে বিশ্বাস, বলে বোঝাতে পারব না।

আমিও জানতাম। কথাগুলো বনবিহারী সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মৃগনয়নীর জীবনের সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছিল এইখানেই। এই বিশ্বাসের ছোঁয়া লেগে লেগে ওর মনও ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসছিল।

তবু মৃগনয়নী মেয়েমানুষ। মানুষ কিন্তু মেয়েমানুষ। এ কথা যাক। পরে হবে।

সেদিন রাত্রে বনবিহারীর মনের সঠিক তারে সুর তুলেও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি ও। ও জানে এ সুর কলকাতায় গিয়েও বনবিহারীর কানে বাজবে। তবু ভয় মাকেও যদি ভুলে যায়। খারাপ সঙ্গে পড়ে! যাকগে, যা হয় হবে। আর ভাবতে পারে না মৃগনয়নী।

বনবিহারী আস্তে আস্তে একবার বলে,—আচ্ছা, এখানে আরও দিনকত থাকলে না?

—কেন?

—বারে। কেন আবার কি?—ওই ইযের জন্যে বলছিলুম। চট্ করে যেতে ভাল লাগছে না।

বনবিহারীর বুকের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে মৃগনয়নী হাসতে থাকে।

—তুমি একবার বলে দেখতে পারো।

—আমি! হাসতে হাসতে বালিস থেকে গড়িয়ে পড়ে মৃগনয়নী।—তুমি কি ক্ষেপেছ? বৌঠান কি তাহলে আর টিঁকতে দেবে ভেবেছ? তাছাড়া—দূর! কি যে বল। তোমার কথার কোন মাথামুণ্ডু নেই।

বনবিহারী চুপ করে থাকে। তা ছাড়া আর কি বা ওর বলবার আছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে,—ছেলে হলে কি করে জানব?

— আবার ওই সব বাজে কথা আরম্ভ হোল।

—তুমি লিখে জানাবে?

—আঁতুড়ে আমি চিঠি লিখতে বসব। কোথায় দোয়াত কলম, কোথায় কাগজ, কোথায় কি—চুপ করো বাপু। কিযে সব আকাশভাঙা কথা বলো।

—তবে কি খবর পাব না? হতাশ হয়ে বলে বনবিহারী।

মৃগনয়নী হেসে ফেলে আবার,—পাবে গো পাবে। কর্তাবাবুই লিখবেন তোমার মাকে। তাঁর কাছ থেকে তোমরা খবর পাবে। কোন নিয়ম নেই না।

বনবিহারীর মনটা আশ্বস্ত হয় এবার। পাশ ফিরে শোয়। কিছুক্ষণের ভেতরই ঘুমিয়ে পড়ে।

জেগে থাকে মৃগনয়নী।

বনবিহারীর অন্তরের রূপটি ওর চোখের সামনে ভাসে। এত সোজা আর সরলশীল মানুষ! ভালবাসার চেয়ে স্নেহের ভাবই যেন বেশী জাগে মৃগনয়নীর। শিশুহৃদয়ের মত বনবিহারীর কথাগুলো। একটি শিশু যেন বাস করছে ওর অন্তরে। কামনামেশান ভালবাসা নয়, সস্নেহ ভালবাসা আসে ওর ওপর।

বনবিহারীর রোগা পিঠখানায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে মৃগনয়নী।

এক ঘুমে ভোর। উঠতে একটু বেলাই হয়ে যায় আজ। চারিদিকে উঁকি দিয়ে দেখে এক ছুটে চলে যায় ঘাটে।

ঘাটে এসে পুঁটিকে দেখতে পায়। পুঁটির চুল তখনও ভিজে। খুব ভোরে বোধহয় স্নান করেছে।

হাতে পুঁটির ওটা কি? ফুলজল সমেত একটি পঞ্চপাত্র আর ছোট একখানা থালা মৃগনয়নীর মনে পড়ে পুঁটিদি বলেছিল আজ থেকে শিবপুজো করবে। না করে আর উপায়ই বা কি? ও নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়। পুজোর কথা তার মনে থাকলে বড় ভাল হোত। পুঁটিদির পুজোয় ওকে সাহায্য করা উচিত ছিল।

পুঁটির মুখখানি যেন উজ্জ্বল আজ। অনেক স্নিগ্ধ। চোখদুটি আজ ঠাণ্ডা শান্ত বেশ লাগে মৃগনয়নীর।

পুঁটি একটু হেসে বলে,—এই এলি বুঝি?

একটু সলজ্জ হেসে মৃগনয়নী বলে,—হ্যাঁ।

—পুজো করলুম।

—কোথায় করলি?

—ভোর রাতে উঠে ভাবছিলুম কোথায় পুজো করি। তারপর স্নান সেরে মাটির শিব বানিয়ে নিয়ে করলুম। পুজোর মন্তর তো জানাই আছে ছোটবেলা থেকে।

—কালী বাড়ীর শিবমন্দিরে গেলেই পারতিস?

—অত ভোরে একা একা ভয় করছিল। দুজন হলে হোত।

মৃগনয়নীকে আবার সলজ্জ হাসতে হয় একটু। ওর ভোরে ওঠা উচিত ছিল।

মুখটা নীচু করে বলে,—শিবের কাছে কি চাইলি রে পুঁটিদি?

চাইলুম!—একটু থেমে পুঁটি বলে,—চাইলুম ওর যেন ভাল হয়। ওর যেন সুমতি হয়। পুঁটির মুখখানা নিষ্প্রভ হয়ে আসে বলতে বলতে।

মৃগনয়নী অবাক। যে স্বামী লাথি মারে, তার ভাল কামনা! পুঁটিদির কি মাথা খারাপ?

পুঁটি ওর মনের ভাবটা যেন বুঝতে পারে,—ওর কোন দোষ নেই রে! আমিই ওকে সুখী করতে পারিনি। দোষ আমার। আমারই দোষ। ঠাকুরকে বললুম, এমন করে দাও আমায়, যেন ওকে সুখী করতে পারি।

চোখদুটো ভিজে ভিজে মনে হয় পুঁটির।

মৃগনয়নী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে পুঁটিদির দিকে।

নয়

প্রায় মাস দেড়েক কেটে গেছে। বনবিহারী চলে গেছে কতদিন। মৃগনয়নীর মনে হয় বহুদিন—বহুদিন চলে গেছে। মাত্র একখানা চিঠি এসেছিল কলকাতা থেকে। … একটুখানি চিঠি। মন ভরল না। আরও ভেঙে পড়ল যেন। লেখাটা পড়ে যেন বুকের ভেতরটা মোচড়াতে লাগল মৃগনয়নীর।

"পরম কল্যাণীয়া, নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছি জানিবা। টাকা বেশী কাছে নাই। একটি … ট ঘর ভাড়া লইয়া আছি। গত দুইদিন হইল রাত্রে ভাত জুটে নাই। দাদা আর … মুড়ি খাইয়া আছি। কাজ হইলে জানাইব। সাবধানে থাকিবা। ঠিকানা …লাম। উত্তর দিবা। ইতি আঃ বনবিহারী দেবশর্ম্মণ।"

কি চিঠি! রাগে দুঃখে কান্না পায় মৃগনয়নীর। জীবনে স্বামীর এই প্রথম পত্র। চিঠিখানি তবু তিনবার, চারবার পাচবার ছ'বার পড়ে মৃগনয়নী। তারপর পা ছড়িয়ে বসে থাকে চৌকীর ওপর প্রদীপটা জ্বালিয়ে।

পুরুষের কাছ থেকে ওর জীবনে এই প্রথম চিঠি পাওয়া। চিঠিতে কয়েকটা সহজ …ের কথা আশা করেছিল মৃগনয়নী। কোন্ মেয়েই বা আশা না করে!

অন্ততঃ লিখতে তো পারত, "তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে বড়ই কষ্ট হইতেছে জানিবা। বুক ফাটিয়া যাইতেছে"—লিখলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?

কিছু না লেখাতে মৃগনয়নীর এ কথা অবশ্য মনে হচ্ছে না যে ওকে ছেড়ে থাকতে বনবিহারীর একটু কষ্টও নেই। তা—হতেই পারে না। ও নিশ্চয় করে বলতে পারে যে রোজই অন্ততঃ রাত্তিরে অনেকবার তার কথা মনে হবে বনবিহারীর। স্বপ্ন দেখাও বিচিত্র নয়। তোমাকে স্বপ্নে দেখি—লিখলেও ত' মৃগনয়নীর মনটা ভরত। ভরত মধুরবেদনায়। দূরের মানুষের জন্য এক অপরূপ ভালবাসায়। কল্পনা করতে ও পারে। বেশ কল্পনা করতে পারে যে তাহলে বনবিহারীর জন্যে ওর বুকের ভেতরটা শূন্য বোধ হত।

কিন্তু হোল উল্‌টো। বুকটা যেন জ্বলছে। জ্বালাটা ক্ষোভে, খানিকটা বা ওদের অসহায় অবস্থা কল্পনা করে, নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে।

গত দুইদিন হইল রাত্রে ভাত জুটে নাই। কথাটা যেন জ্বালাচ্ছে মনের খুব সূক্ষ্ম সুতোগুলো।

মুড়ি খেয়ে কাটিয়েছে দুটো রাত্রি! রোগা মানুষ। তার ওপর দুবল, মাঝে মাঝে ফিট হয়ে যায়। শেষকালে চাকরির জন্যে ঘুরতে ঘুরতে কোথাও পড়ে যায় যদি অজ্ঞান হয়ে কেউ তো চিনবেও না। কেউ জানবেও না মানুষটা কে, কোথায় ঘর।

মনে মনে জ্বালাটা আতঙ্কের রূপ নেয়। প্রদীপটা কমিয়ে দেয় মৃগনয়নী। না। অন্ধকারটা ভাল লাগছে না। যেন দমটা আটকে যাচ্ছে।

উঠে পড়ে মৃগনয়নী। বাইরে দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। না। বাতাস নেই একটুও। পৃথিবীতে হঠাৎ বাতাস এত কম হয়ে গেল।

মৃগনয়নীর চোখের ওপর ভেসে ওঠে বনবিহারীর ফ্যাকাশে রোগা মুখখানা অসহায় দুটি পিঙ্গল চোখ। ছেলেমানুষের মত চাউনী।

নিজের অজান্তে ওর চোখদুটো কখন জলে ভরে ওঠে, ও টেরও পায় না।

সন্ধ্যা উত্‌রে গেছে। দয়াময়ী কালীবাড়ীর আরতির বাজনা ভেসে আসে কানে।

মনে মনে দয়াময়ী কালীবাড়ীর চাতালে গিয়ে দাঁড়ায় মৃগনয়নী। মা কি তার ছেলেকে বিপদে দেখবে না। মায়ের যে এত নির্ভর করে, তাকে আগলে রাখবে না মা?

আবার মন চলে আসে ঘরের অন্ধকার দাওয়ায়। চোখদুটো ভাল করে মুছে দাওয়া থেকে নেমে পড়ে মৃগনয়নী। সোজা চলে আসে বাইরের ঘরে। বাপের ঘরে।

রামতারণ জপে বসেছিলেন।

মৃগনয়নী আস্তে আস্তে এসে বাবার পাশে বসে। কষ্টে ভেঙে পড়বার মুহূর্তে এই একটি মাত্র জায়গা যেখানে এলে ওর মনটা আপনাআপনি অনেকটা হালকা হয়ে আসে। বাতাস পায়। বুক ভরে নিশ্বাস নেবার মত বাতাস।

খানিক বাদে রামতারণের জপ বন্ধ হয়। হয়ত বা মৃগনয়নীকে দেখে ইচ্ছে করে একটু থামেন রামতারণ। চোখদুটোয় ভরা আনন্দ নিয়ে চুপ করেই বসে আছেন।

মৃগনয়নী বাবার দিকে তাকায়।

—কিছু বলবে মা? খুব মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে রামতারণ।

—না, বাবা। কিছু নয়।

রামতারণ ওর মনোভাবটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেও বসে থাকেন চুপ করে।

মৃগনয়নী একটু নড়ে বসে,—আচ্ছা, বাবা তুমি তো কলকাতায় ছিলে?

—হ্যা।

—কলকাতায় মানুষগুলো কেমন?

রামতারণ ওর অর্থহীন প্রশ্ন শুনে একটু হাসেন।

—শুনেছি নাকি পাশে কেউ মরে গেলেও চোখ ফিরিয়ে দেখে না? মৃগনয়নীই আবার বলে।

—সব মানুষই যে এমন তা নয়। ভাল মানুষও আছে।

—তবে বোধহয় বেশীর ভাগই এই রকম?

—তাও ঠিক নয়।—রামতারণ আস্তে আস্তে বলেন,—কি জান। সবাই কাজে ব্যস্ত। বসে থাকবার, চোখ ফেরাবার সময় মানুষের কম।

মৃগনয়নী কর্মব্যস্ত মানুষের চেহারাগুলো কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করে।

রামতারণ বলেন,—কিন্তু হঠাৎ কলকাতার কথা কেন?

মৃগনয়নী বাবার কাছে যেন ধরা পড়ে গেছে।

বলে,—এমনি। কলকাতায় জিনিসের দাম বুঝি খুব বেশী।

—এখানকার চেয়ে বেশী। শহর কিনা? মানুষের টাকাও বেশী।

—টাকা কি করে বেশী হয় বাবা?

—ওখানে ব্যবসাবাণিজ্য বেশি কিনা, টাকার লেনদেন বেশি হয়।

—চাকরি বোধহয় একটু খুঁজলেই পাওয়া যায়?

রামতারণ মৃদু মৃদু হাসেন,—কেন বলতো? তোর এত খোঁজে কি দরকার পড়ল?

মৃগনয়নী বলে ফেলেই লজ্জিত হয়।

আর না। ভাগ্যিস বাবা জানেন না বনবিহারী কলকাতায় গেছে! জানলে কি লজ্জায় পড়ত!

—কলকাতার কথা এত কি দরকার?

—এমনি,—বলেই উঠে পড়ে মৃগনয়নী।

উঠে বাড়ীর ভেতর চলে আসে। একবার ভাবে পুঁটিদির ঠাকুর ঘরে যাবে। কিন্তু কারো সঙ্গ ভাল লাগে না। সোজা শোবার ঘরে চলে আসে।

প্রদীপটা বাড়িয়ে দেয়।

আবার পা ছড়িয়ে বসে। চিঠিখানি পেটকোমরের আঁচল থেকে বার করে আবার তারপর পড়তে থাকে।

কতক্ষণ চিঠিটার দিকে তাকিয়ে ছিল কে জানে! হঠাৎ দরজার কাছে পায়ের শব্দ পেয়ে চিঠিটা মুঠোয় লুকিয়ে ফেলে। বৌঠান!

বৌঠান ডাকতে এসেছে,—খাবে এস ঠাকুরকন্যা!

একটু ইতস্তত করে মৃগনয়না।

মনের ওপর কথাটি ভেসে ওঠে, রাত্রে ভাত জুটে নাই! বনবিহারীর বিষণ্ণ মুখ।

—না, বৌঠান একদম খিদে নেই আজ।

—তা হোক, দুটিখানি মুখে দিয়ে যাও।

—পেটটা ভাল নেই বৌঠান। খেতে পারব না।

—খাবে না তবে?

—না।

বৌঠান চলে যায় খেতে।

চুপ করে বসে থাকে মৃগনয়নী। বনবিহারীর অসহায় পিঙ্গল চোখদুটি ওকে বিভ্রান্ত করে তোলে। হাতদুটোর তালুর ঘামে চিঠিখানা ভিজে ওঠে। মৃগনয়নীর মাথাটার ভেতর কেমন যেন ফাঁকা মনে হয়। কিছু ভাবতেই পারে না। চুপ করে শুয়ে পড়ে ও।

শুয়ে পড়লে কি হবে, ঘুম আর আসে না। চোখদুটো অকারণেই বুঁজে থাকে। ইন্দ্রিয়গুলো অকস্মাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠেছে। কানের পাশে একটা মশা ভনভন শব্দ করে পাক খায়। একটা মশার জ্বালায় যেন অস্থির হয়ে ওঠে মৃগনয়নী। উঠে বসতে হয় ওর।

একটু পরে পুঁটি আসে ঘরে।

পুঁটি আর মৃগনয়নী এক ঘরেই শোয়।

একটা পান চিবোতে চিবোতে আসে পুঁটি,—হ্যাঁরে, আজ কিছু খেলিনে?

মৃগনয়নী ও কথার উত্তর না দিয়ে বলে,—কি মশা দেখেছিস পুঁটিদি?

পুঁটি বিছানায় এসে বসে।

ও কথার উত্তর না দিয়ে পুঁটি আবার বলে,—খেলি না কিছু?

—না। শরীরটা ভাল নেই।

পুটি এক গেলাস জল গড়িয়ে খেয়ে আর কথা না বলে শুয়ে পড়ে। চোখদুটো বোজে। মৃগনয়নীই আবার ডাকে,—কিরে ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? ও পুঁটিদি!

—উঁ!

—রোজ শিবপুজো করে তোর কি মনে হয় রে?

—বেশ ভাল।—পুঁটির ঘুম পেয়েছে।

হঠাৎ বলে মৃগনয়নী,—আমিও কাল থেকে কোরব।

পুঁটি চোখ বুঁজেই বলে,—বেশত'।

—কাল ডাকবি কিন্তু আমায়।

পুঁটি হুঁ, বলে পাশ ফেরে।

মৃগনয়নী বোঝে পুঁটিদির ঘুম পেয়েছে।

কব খোঁজ নেয় না, তবু ঘুম পায়। কি মেয়ে পুঁটিদি!

বোধহয় শিবপুজোর গুণে। তাই কি? হ্যাঁ, তাব আগে পুঁটিদির ঘুম ছিল না চোখে। পুঁটিদি নিজেই বলেছে। মনের ভেতরটা মনে হোত বড্ড ভার-ভার।

এখন যেন পুঁটিদি অনেক হাল্কা। অনেক সহজ।

শিবপুজো করবে মৃগনয়নী। নিশ্চয়ই করবে।

নিয়মগুলো সব শিখে নিতে হবে পুঁটিদির কাছ থেকে। সোমবার বোধহয় উপোস করতে হবে। একটি জীবন যে ধীরে ধীরে তার গর্ভে বড় হয়ে উঠছে। উপোস করলে সেই ছোট্ট প্রাণটুকুর যে কষ্ট হবে! কর্তামা এ অবস্থায় তো উপোস করতে দেবেন না।

কিন্তু বনবিহারী? বনবিহারী যে রাত্রে ভাত খেতে পায়নি? হয়ত আরও কতদিন পাবে না।

এরপর দুবেলায়ই যদি ভাত না জোটে? ভাবতে পারে না মৃগনয়নী। ময়লা বালিসের ওয়াড়ের ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। ওয়াড়টা ভিজে ওঠে একটু পরেই।

এমনি করেই কি রোজ রাত কাটবে?

কাটলও তাই। অনেকগুলো রাত কেটে গেল। আরও দুমাসের ওপর।

এর ভেতরে কি আর একখানাও চিঠি দিতে নেই? আর একটা মানুষ যে তার জন্যে ভেবে ভেবে রাতের পর রাত চোখ চেয়ে কাটাত একথা কি একবারও মনে করতে নেই?

রাগে দুঃখে মৃগনয়নী যেন অবসন্ন হয়ে পড়ে।

পুঁটি ইদানীং কিছুটা আন্দাজ করতে পারছে।

বলে,—হ্যাঁরে, চিঠিপত্তর কিছু পাসনি তার?

মৃগনয়নী যেন বিরক্ত হয়। পুঁটিদি কি ওকে নিজের দলে টানতে চাইছে?

পুঁটিদি কি জানে না যে বনবিহারী ওর বরের মত নয়। বনবিহারীর সঙ্গে ক… তুলনা হয়!

—মন খারাপ করে কি লাভ বল?

মৃগনয়নী ফস্ করে রেগে ওঠে,—মন খারাপ হলে তো দরদ দেখাবে। আন্দা… দরদ দেখাতে এসেছ কেন বলতো?

পুঁটি বলে,—না, তা নয়। চিঠি না পেলে তো অমন হয়।

মৃগনয়নী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে,—ভেবেছ বুঝি সবাই তোমার মত?

পুঁটির মুখখানায় অকস্মাৎ যেন মেঘ করেছে মনে হয়। মৃগনয়নী বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

বেরিয়ে গিয়ে সোজা চলে যায় কর্তামার ঠাকুর ঘরের দিকে।

ঠাকুর ঘরে ঢোকা আর হয় না। যেতে যেতেই মনে ওর তোলপাড় করতে থাকে। ছি, ছি, এ কি কথা বলে এলো ও। কি করে ও এমন কঠিন কথা উচ্চারণ করতে পারল! নিজের মাথাটা নিজের ঠুকতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আবার ফিরে আসে ঘরে। এসে দেখে পুঁটি উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। রোগা ফরসা শরীরটি ওর থেকে থেকে কাঁপছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মৃগনয়নী। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল তারপর।

মৃগনয়নী পুঁটির রোগা পিঠের পাঁজরের ওপর হাত রাখে। আহা, কি রোগা হয়ে গেছে পুঁটিদি!

—আমার অন্যায় হয়েছে। ওঠ পুঁটিদি।

পুঁটির ওঠবার আগেই বাড়ীর ভেতরে একটা বিরাট সোরগোল পড়ে যায়। চিৎকার আর গোলমাল। পুঁটি ধড়মড় করে উঠে পড়ে। মৃগনয়নীও।

উঠে দরজার বাইরে এসে ওরা দেখে সবাই ছুটোছুটি করছে।

কি ব্যাপার? হোল কি?

কারো জবাব দেবার ফুরসতটুকুও নেই। ঝি, চাকর, বামুন সব দৌড়ুচ্ছে।

কি হোল? ডাকাত পড়ল নাকি?

—বলি, অ সনকা কি হোল ?

সনকা ঝি যেতে যেতেই বলে—কর্তাবাবু মরে গেছে বোধহয়।

বোধহয় ? মরে গেছে বোধহয় মানে কি ?

পুঁটি আর মৃগনয়নীও দৌড়োতে থাকে। সকলের পেছনে পেছনে এগোয়। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে। পুঁটি যেন নিশ্বাস নিতেই পারছে না।

লোকে লোকারণ্য। মেয়ে পুরুষে ঠেলাঠেলি। ওর ভেতর যাবেই বা কি করে ?

নায়েব মশায়ের ছেলে সত্য দাঁড়িয়ে ছিল। সুন্দর ছেলে। ওদের বয়েসী। বড অমায়িক।

কর্তাবাবু পায়খানায় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন। ওই কোবরেজ মশাই এসে গেছেন। ধন্বন্তরী কবরেজ নিরাপদ সেন।

গোড়ালী উঁচু করে মুখটা বাড়িয়ে একটু দেখবার চেষ্টা করে মৃগনয়নী। চোখের সামনে শুধু মাথা।

—সরো—সরো—সামনে থেকে সরো।

আবার হট্টগোল।

কর্তাবাবুকে ধরে আছে দু'জন লোক। বিশাল শরীর কর্তাবাবর। চোখদুটি বুঁজে আছেন। মাথার টাক জলে ভিজে।

মৃগনয়নীর ইচ্ছে হোল আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয়। কিন্তু যা ভিড !

ক্রমে বাইরের লোক সব এধার ওধার দুচারজন করে জমায়েত হোল। বাড়ীর লোক ভেতরে ঢুকল।

ভিড কমে যাবার পর চোখে পড়ল দাঁড়িয়ে আছেন রামতারণ। মুখে আতঙ্কের চিহ্নমাত্রও নেই। এত মানুষের মুখের সঙ্গে এ মুখের তুলনা হয় না। নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ঘরে ঢুকলেন। মৃগনয়নী উঁকি দিয়ে দেখল ঘরে ঢুকে বাবা বসলেন, চোখদুটো বুঁজলেন।

পুঁটি আর মৃগনয়নী চলে এল বাড়ীর ভেতর। যে মনোমালিন্যের একটু ছোঁয়া লাগছিল ওদের মনে, সেটুকু যেন কর্তাবাবুর অসুখেতেই চাপা পড়ে গেল।

মরলেন না কর্তাবাবু। বাঁ দিকটা একেবারে অবশ হয়ে গেল। বাঁহাতের আঙুলটি পর্যন্ত নাড়াতে পারেন না। মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে পড়েন। মরে যাবার এক করাল ভয় তাঁর মনকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বড় বড় চোখদুটো সব সময়ই ভয়াবহ আতঙ্কে ভরা।

কর্তামা যতটুকু সময় কর্তাবাবুর কাছে থাকেন, বড একটা কথা বলেন না। ঠাকুরঘরেই তাঁর সময় কাটে বেশি।

মৃগনয়নী দেখেছে কর্তাবাবু কর্তামার দিকে তাকিয়ে বলেন,—বুকের ভেতরটা সবসময় কেমন করছে। আর বোধহয় বাঁচব না।

কর্তামা বিশুষ্ক মুখে তাকিয়ে থাকেন শুধু। উত্তর দেন না।

ডানহাতটা বুকের কাছে এনে বলেন কর্তাবাবু,—দেখ বুকের ভেতরটা কেমন করছে। দেখ একবার।

কর্তামা বুকের ওপর হাত বুলিয়ে দেন। উত্তর দেন না।

দিনরাতে স্বস্তি নেই আর। অন্য কোন চিন্তা করবার অবকাশ নেই। কর্তাবাবুর অসুখ ভারাক্রান্ত করে রেখেছে সকলের মন।

মৃগনয়নীর মনেও কর্তাবাবুর এমন ভয়াল ব্যাধি যেন পাথরের মত চেপে আছে। বনবিহারীর কথাও ভাববার অবসর হয় নি। বনবিহারীর চিঠি নেই আজ কতদিন। দিনের পর দিন। রাতের পর রাত কাটছে। কালো আলকাতরার মত সময়ের স্রোত বয়ে চলেছে।

পালা করে রাত জাগতে হয় সবাইকে। পুঁটিই রাত জাগে বেশী। সেবা করতে ওর তুলনা নেই। পরম যত্নে সেবা করবার এক অসাধারণ গুণ ওর আয়ত্তে।

মৃগনয়নীকে রাত জাগতে দেয় না কেউ। ওর সন্তান হতে আর দেরি নেই। এ অবস্থায় ঘুম না হওয়া ঠিক নয়।

ঘুম মৃগনয়নীর হয় না। তবু কর্তাবাবুর কাছে বসে রাত জাগতেও হয় না।

সেদিন রাত জাগবে খুড়ীমা। পুঁটি শুতে এসেছে। মৃগনয়নী জেগে শুয়েছিল। পুঁটি এসে ওর পাশে শুয়ে পড়ে।

—ঘুমুলি ?

মৃগনয়নী বলে,—না।

—কর্তাবাবুর কথা ভেবে বড় কষ্ট হয়রে! রাতে কত বার যে চমকে চমকে ওঠেন। দম ফেলতে পারছি না মরে গেলুম বলে ওঠেন।

মৃগনয়নী বলে,—কি অসুখ বলত' ?

পুঁটি কিছুক্ষণ ভেবে বলে,—কবরেজ মশাই বলছেন বায়ু পিত্ত বড়ই বেশি। বায়ুর চাপটাই নাকি সবচেয়ে বেশি। কাল রাত্রে শুনছি বিড়বিড় করে বলছে চোখ বুজে, —রাধা, মারব না তোকে। তোর কোন দোষ ছিল না। দোষ আমার। রাধা, রা

...ান থেকে, যা। বলতে বলতে চমকে জেগে উঠলেন। আমার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন, ভাখত, দোরের সামনে কেউ এসেছে কিনা। আমি বলি, কই ...? আবার চুপ করে চোখ বোজেন।

রাধা মানে রাধারাণী। মুহূর্তে মৃগনয়নীর মনের ওপর ভেসে ওঠে বজরার ওপর ...েব জলে কালো ডাগর একজোড়া চোখ। ভীত বিহ্বলা থরো থরো। কাঁপা দুখানি ...। রূপসী রাধারাণীর মৃত্যু! আসান চাকলাদার সদারই দেহটা থেকে ওর ...া বিচ্ছিন্ন করেছিল রামদায়ের একটা কোপে। কর্তাবাবুর পায়ের ওপর মুখ রেখে ...ই আর্তনাদ!

মৃগনয়নীর ভয় ভয় করে।

—রাধারাণীর কথা তোর মনে আছে পুঁটিদি?

—হুঁ।—বলে পুঁটি মৃগনয়নীর গায়ে একখানা হাত রাখে। বোধহয় ভয়ে। ...নীর বড্ড ভয় করে! পুঁটির আরও কাছ ঘেঁষে শোয়।

কর্তাবাবুর ভয়াবহ যন্ত্রণা নিদারুণ আতঙ্কের আসল রূপটা যেন আবছা আবছা ...ের ওপর ভেসে ওঠে। পর পর ভেসে ওঠে মনে এক অসামান্যা রূপোপজীবিনীর ...বহ মৃত্যুর কথা।

জীবনে অনেক দেখবার পরই বলেছিল, শেষ বয়সে বহুবার আমায় বলেছিল, ...াবুর সে কষ্টের তুলনা দেখি না। রাতের পর রাত, দিনের পর দিন যেন এক ...ধিকার আতঙ্কে ডুবে থাকতেন। ঘোর কৃষ্ণ তমিস্রার ভেতরে এক বিন্দু আলোর ...া তার সেই নিদারুণ আকুলতা চোখে দেখা যেত না।

বলত মৃগনয়নী, জীবনে কোন অন্যায় করে এড়িয়ে যাবার জো' নেই বাবা। নিজের ...ই বিচার করে। মনের কাছে মাথা পেতে বিচারের রায় শুনতে হবেই। বাইরে ...র তার কতটুকুই বা দেখতে পায়! যাকে ভাবছি সোনায় দানায় মহাসুখী, মনে ...ে যে কত অসহায় অবস্থায় পড়ে জ্বলতে হতে পারে, ধারণাও করতে পারবে না ...।

মৃগনয়নীর কথাগুলো আজও আমার কানে বাজছে। জানি, এ উপন্যাস তত্ত্বকথা ...। জীবনও তত্ত্বকথা নয়। তবু জীবনের অনেক তথ্য থেকে তত্ত্ব পাওয়া যায় এ ...া অস্বীকার করতে পারিনে। মৃগনয়নীর জীবন জীবনের অনেক সত্যকে প্রমাণ ...েছে। এক অতি সাধারণ কন্যা মৃগনয়নী। অতি সাধারণ তার জীবন।

রাজকন্যার রূপকথা নয়, ডাইনীর ভয়াল কাহিনী নয়। বিশ্বপ্রবাহের অনন্ত কোটি জীবনপ্রবাহের ভেতর এক বিন্দুতম বিন্দু একটুখানি জীবনের কথা। তাতে কি জীবনের অনন্ত জিজ্ঞাসার কথা থাকে না? চিরকালের এই চৈতন্যপ্রবাহের সংকেত ছায়া দেখা যায় না? উত্তর কিছু দিতে চাই নে। মৃগনয়নীর কথাই বলছি, সেইটেই শোনাই।

কর্তাবাবুর অসুখ দিন দিন বেড়েই চলল। কলকাতা থেকে ডাক্তার আনার কথা স্থির হোল। কলকাতা থেকে ডাক্তার ডাকা হবে?

কথাটা মৃগনয়নীর কানে গেল। কে যাবে? কবে যাবে?

বড় বেশি অস্থির হয়ে উঠল মৃগনয়নী। কাউকে জিজ্ঞেস করলে ভাল হয়। কে বা জানবে?

ও তাড়াতাড়ি গেল কর্তামার ঘরে। কর্তামা নেই। বোধহয় ঠাকুর ঘরে।

ঠাকুর ঘরে গেল মৃগনয়নী।

কর্তামা বসে আছেন রাধাগোবিন্দ যুগল মূর্তির সামনে।

জপ করছেন না কি? শুধু বসেই আছেন।

—কর্তামা?

চমকে তাকাল কর্তামা। টুকটুকে আমের মত রঙ যেন ঝলসে গেছে একদিনে।

—কলকাতায় ডাক্তার আনতে যাবে নাকি কর্তামা?

—জানিনে ত। অত্যন্ত নির্লিপ্তস্বরে কর্তামা জবাব দেন।

—তুমি জান না কিছু?

—না।

আর কিছু বলতে সাহস হয় না মৃগনয়নীর। কর্তামা মুখ ঘুরিয়ে নেন।

ধীরে ধীরে নিজের ঘরে আসে। এসে দেখে বৌঠান পান সাজছে। বৌঠানকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হয়। কিন্তু মনের কৌতূহলের বেগ এতই তীব্র যে লজ্জা ভেসে যায়।

—হ্যাঁ গো। কলকাতায় কে যাবে বৌঠান?

বৌঠান তাকায়। মুখ টিপে হাসে,—কেন বলোত?

—এমনি।

—কবরেজ মশাইয়ের এক ভাগ্নে যাবে।

মৃগনয়নী হতাশ হয়ে পড়ে কথাটা শুনে।

ভেবেছিল জানাশুনো কোন মানুষ কলকাতায় গেলে তার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে দেবে। ঠিকানাটা দিয়ে দেবে। যদি দেখা করে আসতে পারে বনবিহারীর সঙ্গে।

কিন্তু কি করে দেবে? কবরেজ মশায়ের ভাগ্নেকে ত ও চেনে না।

নিজের অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

বৌঠান চারটে পান সেজে হাতে নিয়ে ফিক করে হেসে ফেলে ওর দিকে তাকিয়ে।

—মন যে তোমার কলকাতায় পড়ে আছে জানি। সুবুদ্ধি দিই শোন।

মৃগনয়নী লজ্জা পেলেও হাসতে পারে না।

বৌঠান বলে,—হৃদয়দাকে দিয়ে একখানি চিঠি কবরেজ মশায়ের ভাগ্নের হাতে পাঠিয়ে দাও। আমি ডেকে দিচ্ছি হৃদয়দাকে।

বলে বৌঠান ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কথাটা মন্দ নয়। বৌঠানের বুদ্ধিকে তারিফ না করে পারে না ও।

হৃদয়দা' একটু পরেই আসে। রাজী হয় কাল সকালে চিঠিখানা কবরেজ মশায়ের ভাগ্নের হাতে দিয়ে আসবে। কলকাতা থেকে সে এলে তার কাছে গিয়ে জেনে আসবে কিছু উত্তর আছে কিনা।

সেদিন রাত্রেই দোয়াত কলম নিয়ে বসতে হয় মৃগনয়নীকে। অনেকবার অনেক ভেবে বড় বড় বাংলা হরপে অতি কষ্টে লেখে,—"শ্রীশ্রীচরন কমলেষু, আমার শতকোটি প্রনাম লইবা। তোমার কুসল সম্বাদ দিয়া পাঠাইও। আমি ভাল নাই। ইতি চিরসেবিকা মৃগনয়নী।"

এইটুকু লিখতেই সন্ধ্যে কাবার। চিঠিখানি ভাঁজ করে একখানা খামে পুরে জুড়ে ওপরে ঠিকানাটা লিখে দেয়। সেই পুরোনো চিঠির ঠিকানা। চিঠিখানি বালিসের ওয়াড়ের ভেতরে রেখে এই প্রথম সেদিন রাত্রে বেশ আরাম করে ঘুমোতে পারে। নিশ্চিন্তে ঘুমোয়।

পরদিন সকালে উঠে হৃদয়দাকে চিঠিখানা দিতে ভুল হয় না। হৃদয় চিঠি দুভাঁজ করে ওর কাঁধের গামছায় বেঁধে নেয়।

—ঠিক পৌছে দিও কিন্তু হৃদয়দা'!

হৃদয় কোন জবাব দেয়া প্রয়োজন মনে করে না।

মৃগনয়নী মনে মনে ঠিক করে রাখে হৃদয়দার জন্যে গোটাকতক শুকনো লঙ্কা বেশী

করে ভেজে রাখবে। হৃদয়দা লঙ্কা ভাজা দিয়ে ভাত খেতে ভালবাসে। ওকে খুশ করে রাখতে পারলে পরে হয়ত ওকে অনেক কাজে লাগবে।

কবরেজ মশায়ের ভাগ্নে আজ চলে গেল কলকাতায়। বিকেলের দিকটা চঞ্চলত বড় বেশী হয় মৃগনয়নীর। কাল নিশ্চয়ই চিঠি পাবে। কি জবাব দেবে ভাবতে থাকে মৃগনয়নী। নানা কল্পনায় মন কখনও উত্তেজিত হয়, কখনও অবনমিত হয়। বৃথ কল্পনা। মিথ্যে কল্পনা। জেনে শুনেও এই কল্পনার বেগ রোধ করতে পারে ন মৃগনয়নী।

কেই বা পারে? এমন সংযম মানুষের ভেতর দেখাই যায় না।

অথচ এমন সব কল্পনার থেকে জীবনে যে কত বিপদ হয়, তা দেখেছে মৃগনয়নী জীবনে বহুবার। সংসারে এক একটা ঘটনার পর এক একটা ঘটনা এমন আকস্মিক ভাবে আসে যে অনেকটা যেন সাজান মনে হয়।

মৃগনয়নী যেদিন চিঠি দিল, পরদিনই বনবিহারীর খবর এলো।

আরও অনেক ঘটনায় দেখেছে। ধৈর্য নষ্ট হবার পর মুহূর্তেই কাজ হয়ে যায়। একটু ধৈর্য ধরে থাকতে পারলে যে কত ভাল হোত—মনে করেও কোন লাভ হয় না। তবু মৃগনয়নীর মনে হয় চিঠিটা মিছিমিছি না দিলেই হোত।

যাক্ যা হয়ে গেছে তাকে আর ফেরাবার উপায় নেই।

পরদিন খবর শুধু নয়। মৃগনয়নীর নামে পাঁচটা টাকা মণিঅর্ডার এলো।

কুপনটা ছিঁড়ে হাতে দিল ডাকপিওন। আর টাকাও। পাচটা রূপোর টাকা যেন পাঁচগণ্ড অমৃত। কুপনে লেখা ছিল। "চাকরি হইয়াছে টাকা পাঠাইলাম। মায়ের পূজা দিও।" আর কিছু লেখা নেই।

বনবিহারীর ঠিক মনে আছে। মায়ের পুজোর জন্যে টাকা চেয়েছিল মৃগনয়নী। কথাটা ভোলেনি বনবিহারী। মায়ের পুজোর কথা যে ভুলবে না এটা যেন আন্দাজ করেছিল মৃগনয়নী।

টাকা কটা যেন পাঁচটা বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটার মত আতপ্ত মনের ওপর শীতল স্পর্শ।

বৌঠান ছুটে এলো। মা শুনলেন, বাবা শুনলেন, কর্তামা শুনলেন।

বনবিহারীর চাকরি হয়েছে। মিষ্টি খাবার টাকা পাঠিয়েছে। চৌষট্টিটা রসগোল্লা একটাকা তখন।

পাঁচটাকা পাঠিয়েছে নিশ্চয়ই রসগোল্লা খাওয়াতে। কথাটা রটাল বৌঠান। শুনে সবাই খুশী হোল। হাসল।

কুপনের লেখাটা আর দেখাতে পারল না কাউকে মৃগনয়নী। যত কথাটা রটতে লাগল, ততই যেন ও কুপনটা লুকাতে লাগল।

মা বললেন,—প্রণাম করে এসো কর্তামাকে। কর্তামার হাতে টাকা দিয়ে এসো।

মৃগনয়নী কিছুতেই বলতে পারল না যে টাকা মিষ্টি খাওয়াবার জন্যে নয়। মা কালীর পুজো দেবার জন্যে। কিছুতেই কথাটা মুখে এলো না।

সকলের এত হাসি এত আনন্দ নষ্ট করতে মন কিছুতেই চাইল না। ওকে নিয়ে এত কথা এত হাসি এত ঠাট্টা এই লোভটা সামলান ওর পক্ষে সম্ভব হল না।

পুজোর টাকা বললেই এত হাসি আর থাকবে না, এত কথা আর হবে না।

অগত্যা কর্তামার কাছে গিয়ে প্রণাম করল মৃগনয়নী।

কর্তামা মুখ তুললেন,—শুনেছি। খুব আনন্দের কথা।

টাকা পাচটা কর্তামার হাতে দিল।

—কিসের টাকা?

মৃগনয়না মুখটা নীচু করে রইল।

—টাকা কি হবে রে?

—ও পাঠিয়েছে।

—পাঠিয়েছে? কে? বনবিহারী?

মণিঅর্ডারের কথাটা তখনও বোধহয় কর্তামার কানে যায়নি।

—ওরা সব জানে। বলে লজ্জায় পালাল মৃগনয়নী।

এক সুমধুর লজ্জায় ভরে উঠেছে ও। এ লজ্জাটুকু দেখাতেও যেন আনন্দে ভরে উঠেছে মন। ছুটতে ছুটতেই প্রায় চলে এল ঘরে। বসে হাঁপাতে লাগল।

সব আনন্দের মধ্যেও কোথায় যেন মনের এক অলক্ষ্য কোণে একটা কথা ঘোরাফেরা করতে লাগল। টাকাটা পুজোর। পুজো না দেয়া কি ঠিক হোল? এতে কি ভাল হবে? রাত্রে বারবার মনে মনে মা কালীকে প্রণাম জানাল মৃগনয়নী।

দশ

সূর্য চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে বললেও বিশ্বাস হোত। তার চেয়েও এক ভয়াবহ খবর এলো সেদিন। তরঙ্গিণীর বরের রাজযক্ষ্মা হয়েছিল। গতকাল সুশীল মারা গেছে। বারো দিন ভুগেছিল।

বিরাট বাড়ীখানা স্তব্ধ হয়ে গেল। বোবা হয়ে গেল। মানুষগুলো একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। কদিনই বা বিয়ে হয়েছিল এর ভেতরি—।

বড্ড অত্যেচার চলছিল। তরঙ্গিণীর সভ্যতা বলে কি একটু কিছুও ছিল না?

সমালোচনাও চলেছে। অমন জোয়ান সোয়ামী। রাজযক্ষ্মা হয়ে গেল! পুরুষখেকো মেয়েমানুষ বাপু!

আহা রে? অমন সুন্দর জামাই!

মেয়েটারও কপাল দেখ? এত যার শখ আহ্লাদ! এত যার সাজ-সজ্জে তার বরাতে এই?

কর্তাবাবুকে খবরটা দিতে সবাইকে বারণ করে দেয়া হোল।

কর্তামাই ঠিক করলেন, কাউকে টাকা সঙ্গে দিয়ে পাঠাতে হবে তরঙ্গিণীর শ্বশুরবাড়ী।

কে যাবে? কেউ যেতে চাইছে না। বাড়ীর ছেলেরা সব যেন কেমন ভয় হয়ে পড়েছে, আতঙ্কে মুষড়ে পড়েছে।

কর্তাবাবুর অসুখ। তরঙ্গিণীর এমন অবস্থা। সংসারে হোল কি?

কর্তামা ঠিক করলেন, নাযেব মশায়ের ছেলে সত্য যাবে তরঙ্গিণীকে আনতে সঙ্গে অন্ততঃ পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দিতে বললেন। কর্তামার আদেশ। নায়েব মশাই স্বীকার করে চলে গেলেন।

কর্তামার কঠিন পাষাণের মত মুখখানার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল মৃগনয়নী। একটু কাঁদলে না। স্থির কণ্ঠে আদেশ করলেন যা কিছু করবার সেগুলো সুনিপুণভাবে করতে।

মা কেঁদে কেঁদে মুখখানা ফুলিয়ে ফেললেন। দুদিন জল পর্যন্ত খেলেন না।

কথাটা রামতারণের কানে এলো।

রামতারণ ডেকে পাঠালেন মৃগনয়নীকে।

মৃগনয়নীও কাঁদছে। দিদির এমন অবস্থায় চোখের জল আর রাখতে পারছে না। কান্নার আর একটা কারণ, অবচেতন মনে ওর ভয় বাসা বাঁধছে।

তারও যদি এমন অবস্থা হয়? বনবিহারী যদি না বাঁচে? যদি খবর আসে কিছু? দিদির বরের কি চেহারা, হাতের কব্জি দুটি কত চওড়া! আর বনবিহারী? হাতখানা যেন দুটি সরু পাতলা বাঁশের মত পলকা। কখন বুঝি ভেঙে যায়। চোখ মুছতে মুছতে বাবার কাছে যায় মৃগনয়নী।

রামতারণ বসেছিলেন একখানি কম্বলের ওপর। শান্ত ঠাণ্ডা চোখদুটি তুলে বললেন,—সুশীল কি মারা গেছে?

মৃগনয়নীর চোখ বেয়ে টস টস করে জল পড়তে লাগল আবার নোতুন করে।

রামতারণের বলবার আর কিছু ছিল না। একটু সময় চুপ করে বসে রইলেন শুধু, তারপর ধীরে ধীরে একখানি ছোট বই খুলে বসলেন।

বইটি সর্বদাই রামতারণের কাছে দেখেছে মৃগনয়নী। বইটি পড়তে পড়তে মগ্ন হয়ে যান তিনি সময় সময়। এত মগ্ন হয়ে যান যে অনেক সময় ডেকেও সাড়া পাওয়া যায় না। বইটি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা।

রামতারণ দেখতে দেখতে বইটির ভেতরে ডুবে গেলেন। মৃগনয়নী চোখদুটি মুছে চলে এলো। চোখদুটো ওর রাঙা হয়ে উঠেছে। কানদুটো দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে যেন।

কি যে হচ্ছে সব। একটার পর একটা অঘটন। পরিষ্কার দেখতে পায় ও রূপসী চঞ্চলা তরঙ্গিণীর খঞ্জনের মত নাচুনে চোখদুটো। সেই তরঙ্গিণীর কি রূপ দেখবে! ভাবতেই মাথাটা ঝিমঝিম করে।

দিনদুয়েকের ভেতরই সত্য নিয়ে এলো তরঙ্গিণীকে।

ভেতর বাড়ীর যে ঘরে কর্তাবাবু থাকেন, সে ঘর থেকে অনেকটা দূরে, অনেকটা তফাতে একখানা ছোট ঘরে তরঙ্গিণীকে রাখা স্থির হোল।

ব্যবস্থা করলেন কর্তামা। বারণ করা হোল সবাইকে কেউ যেন চীৎকার করে না কাঁদে। মাকেও বুঝিয়ে বললেন খুড়ীমা।

মা চুপ করে যেমন পড়েছিলেন, তেমনি পড়ে রইলেন।

তরঙ্গিণী এলো। এসেছে। এসেছে তরঙ্গিণী। ফিসফিস চাপা আওয়াজে ভরে গেল বাড়ীখানা। এসেছে।

পুঁটির কাছে বসে চুল বাঁধছিল মৃগনয়নী। শুনে লাফিয়ে উঠল— পুঁটিদি চ'।

পুঁটি উঠেই আবার বসে পড়ল— মাথার ভেতরটা কেমন করছে রে। এক গেলাস জল দিবি ?

—তুই তবে শুয়ে পড়! আমি আসছি।

পুঁটি নিজেই উঠে এক গেলাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ল। হাঁটবার একটুও শক্তি নেই ওর পায়ে। পাদুটো যেন অবশ হয়ে গেছে।

মৃগনয়নী ততক্ষণে বাইরে চলে এসেছে। অনেকেই এসেছে। সত্য দাঁড়িয়ে আছে। তরঙ্গিণীকে ধরে পাল্কী থেকে বার করা হোল।

কালো একরাশ চুল কেটে ফেলেনি তার? আগোছাল চুলের ভেতর দিদির মুখখানা দেখতে পাচ্ছে মৃগনয়নী। সেই মুখ। সেই চোখ। চোখের কোলে নীলাভ ছায়া। পাণ্ডুর বিশুষ্ক ঠোঁট দুটি কাঁপছে কি ?

তরঙ্গিণী কাউকে জড়িয়েও ধরল না। চীৎকার করে কেঁদেও উঠল না। বৈধব্যকে ও যেন ঠিকমত স্বীকার করে নিতে পারেনি আর সব মেয়ের মত। শুধু ক্লান্তি আর দিনগুলোর একঘেঁয়েমিতে যেন একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

তরঙ্গিণী মুখটা নীচু করে বাড়ীর ভেতরের দিকে এগোয়।

এত শোকাবহ হাওয়ার ভেতরেও লক্ষ্য করল মৃগনয়নী দিদির রূপ যেন আরও বেশী করে চোখে পড়ে। শুভ্র বসনা হয়ে ও যেন আরও অসামান্যা হয়ে উঠেছে।

চোখের নীলাভ ছায়া মুখের শ্রান্তি ওকে যেন কারুণ্যে আরও মধুময়ী করে তুলেছে।

আহা রে! এই রূপ! এই যৌবন! ব্যর্থ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিলে তিলে এ-যৌবনের সমাধি হয়ে যাবে।

এতক্ষণে আবার কাঁদতে পারে মৃগনয়নী।

তরঙ্গিণীর হাত ধরে এসে। তরঙ্গিণী তাকায়। কথা বলে না।

মৃগনয়নী ওর হাত ধরতেই সবাই যেন বেঁচে যায়। মৃগনয়নীই নিয়ে যাক ওকে ওর ঘরে। এখন আর কারো সঙ্গে দেখা না করাই ভাল।

ঘরে এসে দেখে পুঁটি শুয়ে আছে। এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল, তরঙ্গিণীকে আসতে দেখেই চোখ দুটো বুজে ফেলে। ও দেখতে পারবে না।

কি করে ও তাকাবে দিদির দিকে? জল তেষ্টায় গলাটা আবার কাঠ হয়ে উঠেছে।

তরঙ্গিণী আর মৃগনয়নী এলো ঘরে।

— অ পুঁটিদি, ওঠ না।

পুঁটি পিটপিট করে তাকায়। তরঙ্গিণী চৌকীর ওপর বসে। বাইরে লোকের সামনে এতক্ষণ যে গাম্ভীর্য ওর দেখেছিল, সেটা একটু সহজ হয়ে আসে। ঘরে পুঁটি আর মৃগনয়নী।

তরঙ্গিণী বলে,— মা কই রে?

মৃগনয়নী উত্তর দেয়,— মায়ের ঘরে। দুদিন ত জলস্পর্শ করেনি। কি যে অবস্থা!

একটা বড় নিশ্বাস ফেলে তরঙ্গিণী।— তুই কবে এলি?

—আমি?—একটা ঢোক গিলে বলে মৃগনয়নী।— তা প্রায় পাচ ছ'মাস হল। এসেই ত বিপদের ওপর বিপদ। কর্তাবাবু একেবারে শয্যাশায়ী।

—কি হোয়েছে তাঁর?

পুঁটি এতক্ষণে উঠে বসেছে।

বলে,— কর্তাবাবু তো মরো মরো। এই যায় এই যায়!

তরঙ্গিণী অবাক হয় একটু। ও খবরটা জানত না।

—পুঁটি বুঝি সেই থেকেই আছিস?

পুটি মুখটা নীচু করে বলে,—হ্যাঁ।

আমায় একখানা কাপড় দেনা ভাই। কাপড়টা ছেড়ে নি।

—কাপড়!—বলেই মৃগনয়নীর মনে পড়ে শাড়ী দিলে তো পরতে পারবে না। শাড়ী পরা জন্মের মত ঘুচে গেছে। চোখদুটো ছলছল করে ওঠে ওর।

তরঙ্গিনী আর একটা দীঘশ্বাস ফেলে বলে,—বাবার একখানা কাপড় নিয়ে আয়।

মৃগনয়নী ভেবে উঠতে পারছিল না কোন্ কাপড় দেবে। দিদির কথায় ও যেন বেঁচে যায়। ছুটে যায় মায়ের ঘরের দিকে। দেখে মায়ের ঘরে সত্য বসে আছে আর কর্তামা।

মৃগনয়নী যেতেই ওরা চুপ করে যায়। সত্য একটা তোরঙ্গের ওপর বসেছিল। সরে বসে।

কর্তামা বলেন,—ওরা এমন ব্যাভার করলে?

সত্য একবার মৃগনয়নীর দিকে তাকিয়ে বললে,—তাই তো দেখলামই যখন চলে

আসি, কেউ তো একবার গাড়ীতে তুলে দিতেও এলো না। তাদের ধারণা সুশীলবাবু মরেছে বৌয়ের দোষে। দুদিন নাকি ওকে কেউ ছোঁয় নি।

মৃগনয়নীর বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। এ অবস্থার পরেও এত অবহেলা পেয়ে এসেছে! মা কেঁদে ওঠেন আবার।

—কেঁদোনা ন'বৌ।—কর্তামা বলেন।

মৃগনয়না বাবার একখানা ধুতি বগলে করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। নিজের ঘরে এসে দেখে তরঙ্গিনী পা দুখানা মুড়ে বসেছে চৌকীর ওপর। আগে যেমন বসত।

পুঁটি খুব কথা বলে চলেছে। এতক্ষণে বোধহয় ভয় ভেঙেছে পুঁটির।

—তারপর?—তরঙ্গিনী জিজ্ঞেস করছে।

পুঁটি বলে চলেছে,—তারপর ভয়ে মরি! রাধা তোর কোন দোষ নেই—বলে বিড়বিড় করে বকে চলেছে কর্তাবাবু। আমায় আবার জেনে বলে দ্যাখত দোরের কাছে কেউ দাঁড়িয়ে কিনা। ভয়ে আমার হাত পা এখন কাঁপছে।

তরঙ্গিনী অবাক হয়ে শোনে।

—নে দিদি, কাপড়টা ছেড়ে নে।

তরঙ্গিনী কাপড়টা নেয় মৃগনয়নীর হাত থেকে।

পুঁটির পাশে গিয়ে বসে মৃগনয়নী। তরঙ্গিনী কাপড় বদলাচ্ছে।

পুঁটি জিজ্ঞেস করে,—দিদি কোথায় থাকবে রে?

—বোধহয় উত্তরের ঘরে।

—আর কে থাকবে?

—জানি না তো!

—দিদি তারচেয়ে এ ঘরেই থাক না। তিনজনে শোব।—বলে পুঁটি।

মৃগনয়নীর বিধবার কাছে শুতে ভাল লাগে না। হোলই বা দিদি। সদ্য সদ্য বিধবা হয়েছে। যদি ছোঁয়া লেগে তার আবার কিছু—।

তরঙ্গিণী বুকের ওপর আচল তুলে বলে—আমি একাই শোব। উত্তরের ঘরেই শোব।

একা কেন! বোধহয় মা থাকবে তোমার কাছে।—বলে মৃগনয়নী।

মৃগনয়নী আবার চৌকীর ওপর বসে। হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় তরঙ্গিণী। মুখটা নীচু করে চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

পুঁটি একটু উসখুস করে। এই নীরব ভাবটা ওর ভাল লাগে না। তবু কথা

বলতে পারে না একটিও। মৃগনয়নী তরঙ্গিণীর দিকে যত তাকায় ততই ভয় হয় ওর।

তরঙ্গিণী মুখটা তুলে বলে,—হ্যাঁরে। বাবার সরু পাড়ওলা কাপড় পরেছি। শাশুড়ী কিছু বলবে না ত?

মৃগনয়নী হতবাক হয়ে যায়। একথার কি উত্তর দেবে ও। চোখদুটো ছলছলিয়ে ওঠে।

তরঙ্গিণী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখটা নীচু করে ফেলে। ফরসা হাতখানা কোলের ওপর পাতা। তার ওপর টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা চোখের জল পড়ে।

পুঁটি আস্তে আস্তে উঠে পালায়। ও কান্না সহ্য করতে পারে না। বুকের ভেতরটা কেমন করে কারো কান্না দেখলে। মৃগনয়নীর গলা বন্ধ হয়ে এসেছে।

শেষে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলে—জামাইবাবুর কি হয়েছিলরে?

—যক্ষ্মা।—সামলে নিয়েছে তরঙ্গিণী। মুখ তুলে তাকায়। একটু যেন ম্লান হাসে।

—অমন স্বাস্থ্য!

—ডাক্তার বললে চেহারা খুব ভাল হলে তাদের রোগটা মারাত্মক হয়।

—আর রোগাদের?

—রোগাদের হলেও টিকতে পারে।

—তুই কি পাশে বসেছিলি শেষ সময়।

—না।—তরঙ্গিণী আবার মুখটা নীচু করে।

—কেন?—অবাক হয়েছে মৃগনয়নী।

—থাকতে দেয়নি।—গলাটা বেশ ভারী ঠেকছে তরঙ্গিণীর।

—কেন রে?

—জানি না।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ।

আবার বলে—তুই কেন জোর করে গেলি না?

চোখদুটো জলে ভরলেও মুখের ম্লান হাসির রেখা মিলোয় না তরঙ্গিণীর। জবাবে বলে,—আমার দেওরকে জানিস না তো। জোর করলে হয়ত বেঁধেই রাখত।

মৃগনয়নীর চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে যায়।

তরঙ্গিনী বলে,— তোর বর কই?

—কলকাতায়।

—কেন ?

—চাকরি করছে।

তরঙ্গিনী শুধু হুঁ—বলে চুপ করে থাকে।

একটু পরে বলে,—আর পুঁটির ?

—দেশে।

ভাল আছে ?

মৃগনয়নী কথাটা আর চাপতে পারে না। ফিসফিস করে বলে,— যেন বলিস নি কাউকে! ওর বর ওকে নেয় না। ও ত' সেই থেকে এখানে।

একটু অহঙ্কার প্রকাশ পায় মৃগনয়নীর কণ্ঠে। এটা যে খুব ঠিক হোল না, নিজেই যেন পরমুহূর্তে বুঝতে পারে। তরঙ্গিণী চুপ করেই বসে থাকে।

দিনকতক কাটবার পরই তরঙ্গিণী একটু হালকা হয়ে এলো। এক আধ সময় নিজেরই অজ্ঞাতে হেসেও ফেলত।

মৃগনয়নী আজ দুপুর থেকে বড়ই মুষড়ে পড়েছে। কলকাতায় যে গিয়েছিল তার কাছ থেকে খবর পেয়েছে—বড়ই খারাপ খবর। খবরের প্রয়োজন ছিল না। টাকা তো এসেছিলই।

তবু হৃদয়দা এসে গায়ে-পড়া হয়ে বললে,—একটা খবর বলা হয়নি তোমায় ?

হৃদয় তার আঙুলকাটা হাত কচলাতে কচলাতে বলে,—এ্যাদ্দিন ভেবেছিলাম বলব না।। আজ দেখছি বলাই ভাল।

—কি বলো না ?

—কবরেজ মশায়ের ভাগ্নেকেও পাচকান করতে বারণ করে দিইছি। আমিও কাউকে বলব না। তুমিও কাউকে বোল না।

—খবরটা কি ?

—বললে, কলকাতায় একতলা বাসায় ও যখন গেল তখন জামাই নাকি নেশা করেছিল। ওর দাদা এসে কবরেজ মশায়ের ভাগ্নেকে আপ্যায়িত করেছিল।

—নেশা ? কি নেশা ?—স্তম্ভিত হয়ে গেছে মৃগনয়নী।

হৃদয় মুখটা নীচু করে বললে,—কিছু নয়। একটু আধটু মদ-টদ বোধহয় খাচ্ছে।

মদ! মদ খাওয়া ধরেছে বনবিহারী ?

হৃদয় চলে গেছে। মৃগনয়নী সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ।

বনবিহারী মদ খাচ্ছে! শুধু মদ হলেও সান্ত্বনা ছিল! মদ হলেই তার সঙ্গে মেয়ে এসে জুটবেই, একথা ত' মৃগনয়নীর অজানা নেই। তার কর্তাবাবুকে দেখেছে। তার কাকাকেও একআধ সময় দেখেছে। তাদের বাড়ীতে এমন ঘটনা ত' ঘটেছে। শেষ কালে এই হোল!

যেটুকু অহঙ্কার ওর মনে এসেছিল সেটুকু নির্মূল হতে চলেছে। ভেবেছিল পটিদি, দিদি ওদের চেয়ে তার বরাত কত ভাল! অবচেতন মনের কোথায় যেন এই অহঙ্কারের ধোঁয়া জমে উঠেছিল। এ খবর সে ধোঁয়াকে ঝড়ের মুখে উড়িয়ে দিলে। হয়ত ভালই হোল। কিন্তু মৃগনয়নী হারতে জানে না।

তাকে কলকাতায় যেতে হবে। যত শীঘ্র পারে যেতে হবে। এখন যাওয়া যে কিছুতেই সম্ভব নয়। ও যে সন্তান-সম্ভবা। তবু এখন থেকেই চেষ্টা করতে হবে। যাবার চেষ্টা করতে করতে যতদিনে যাওয়া যায়।

পরের দিন চিঠি লিখল বনবিহারীকে। চিঠিটা বড় বড় হরপে প্রায় দুপাতা হয়ে গেল। ও সব কথা নয়। শুধু যাবার কথা।

সব প্রস্তুত রেখো। আর মাসখানেকের ভেতর কিছু হলেই আঁতুড় তুলে আমি যাব। না গেলে আর থাকতে পারছি না। শুধু যাওয়ার কথা। কিন্তু কথা কথাই। মন নয়।

এগারো

একটি ছেলে হয়েছে মৃগনয়নীর। আঁতুড়ে তরঙ্গিণীই রাত জাগল।

বাড়ীর উঠোনের একটা কোণে চালা তুলে দেওয়া হোল। সেটাই আঁতুড় ঘর। একটুখানি একটা প্রাণ ধুকধুক করছে। তাকিয়ে দেখে মৃগনয়নী। বেশ বড়-সড় হয়েছে ছেলেটি। দেখতে মৃগনয়নীর মতই কালো রঙ, কালো চুলে মাথা ভর্তি, কালো চোখদুটি বড় বড়। বনবিহারীর মত পিঙ্গল চোখ, ফরসা রঙ নয়।

ভালই হয়েছে। ওর মত হলে হয়ত রোগাও হোত। অসুস্থ হোত। মৃগনয়নী খুব খুশী। এ অবস্থায় বেশী নড়ে শোবার বসবার হুকুম নেই।

তরঙ্গিনীকে বলে,—একটু এদিকে দে না দিদি!

—কাকে?

আঙুল দিয়ে ছেলেকে দেখায় মৃগনয়নী।

তরঙ্গিণী একটু হেসে ওর কাছে শুইয়ে দেয় ছেলেকে।

হাতের ওপর টেনে নেয় ছেলেকে। তাকিয়ে থাকে। দেখতে বেশ লাগে। অনেকক্ষণ দেখেও যেন দেখবার আকাঙ্ক্ষা মেটে না। বুকের কাছে টেনে নেয়।

হঠাৎ মনে হয় কালোবৌ সরলার কথা। তোর ছেলে হোক মেয়ে হোক আমায় দিবি? কথা দিয়েছে ও দেবে। কালোবৌকে দেবে। এই ছেলেকে কালোবৌকে দিতে হবে। কথা দিয়েছে। কেন কথা দিল? তখন কি একটু ভাবতে পেরেছিল যে এমন সুন্দর হবে ছেলেটা! কথা না দিলেই হোত তখন।

যদি কলকাতায় যাবার পর দেখে কালোবৌ এসেছে। যদি তখন চেয়ে বসে ছেলেকে? বুকের কাছে আরও টেনে নেয় ছেলেটাকে। মুখটা ওর শুকিয়ে যায়।

হৃদয়দা' এক গামলা গরম জল এনে দিয়ে যায় ঘরের সামনে।

তরঙ্গিণী বলে,—নে, ওঠ। ছেলেকে আমার কাছে দিয়ে কাপড় ছেড়ে নে।

—থাক না এখন।—মৃগনয়নী উঠতে চায় না। এই মুহূর্তে ছেলেকে ছাড়তে চায় না।

তরঙ্গিণী ধমকায়,—সবই তোর আদিখ্যেতা। জল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে! উঠে পড।

—একটু দুধ খেয়ে নিক।

—পরে খাবে।—বলে তরঙ্গিণী ওর বুকের কাছ থেকে ছেলেকে তুলে নেয়।

অগত্যা উঠতে হয় মৃগনয়নীকে, কিন্তু তরঙ্গিণীর ভাবটা যেন ভাল লাগে না।

রাত্রেও তরঙ্গিণী ছেলেকে কোলে করে নিয়ে মধু চোষায়। নিজের কোলে রাখে। তাকিয়ে থাকে মুখের দিকে একদৃষ্টে। কি যেন ভাবে অন্যমনস্ক হয়ে। মৃগনয়নীকে তার আগেই বলে।—চোখ বোঁজ। ঘুমো। ঘুম না হলে শরীর সারবে না।

দিদির কথায় চোখ বোঁজে মৃগনয়নী। কিন্তু ঘুম ওর আসে না। পিটপিট করে তাকিয়ে দেখে তরঙ্গিণী তাকিয়ে ছেলের মুখের দিকে ছেলেকে কোলে নিয়ে।

কিছু বলতে সাহস হয় না। কি ভাববে আবার।

একএকবার মনে ভাবে দিদি যদি চেয়ে বসে—দে না তোর ছেলেটাকে, আমি পালব। সদ্য বিধবা দিদিকে ও কি বলে বিমুখ করবে?

মৃগনয়নী ভয় পায়। মিছিমিছি ভয় পায়। তরঙ্গিণী ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল একেবারে অন্য কথা। তারও তো একটা ছেলে হতে পারত। তাও হোল

না। এ যৌবনের অসহনীয় ভার নিয়ে একা একা সে কি করে কাটাবে? একটা সন্তানের কামনাও কি তার থাকতে নেই আর?

একটি পুরুষের আকস্মিক মৃত্যু দিয়ে তার ভবিষ্যৎ জীবনকে এত নিষ্ঠুর ভাবে বিচার করা হবে। সে জীবনের যৌবনের আর কোন সুযোগ পাবে না। কেন পাবে না? তার পিনোন্নত পয়োধর, তার যৌবনরসসিঞ্চিত নিতম্বের ভার। এ সে কেমন করে বইবে। সে কি পাগল হয়ে যাবে না?

চোখদুটো জ্বলছে তরঙ্গিণীর। ছেলেটার দিকে তাকিয়েই রয়েছে।

জোর করে তার ওপর যে আজীবন কঠোর সংযমের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হোল, একে রক্ষণ করবার সামর্থ্য তার থাকবে কিনা কে জানে!

মনের স্ফুরিত যৌবন-জ্বালা বিকৃত হয়ে উঠছে দিনদিন। বেশ বুঝতে পাচ্ছে তরঙ্গিণী ও কিছুতেই এ ভাবে চলতে পারবে না। সব মিথ্যা হয়ে যাবে। সব মিথ্যা। মানুষগুলো সব মিথ্যে মুখোশ পরে রয়েছে। এক অকারণ ঘৃণা আর ক্রোধে ফুলে ওঠে তরঙ্গিণী।

—কি হোল রে দিদি, বিড়বিড় করে কি বলছিস?—মৃগনয়নী ভয় পেয়ে বলে ফেলে।

—কিছু নয়ত।—তরঙ্গিণীর চিন্তার গতি সংহত হয়। বলে,—তুই ঘুমো।

মৃগনয়নী অগত্যা আবার চোখ বোঁজে। দিদির ভাবগতিক ওর একেবারেই ভাল লাগে না।

এমনি দিনকটা কেটে গেল। আরও কিছুদিন কাটতে চলল।

কলকাতা থেকে চিঠির উত্তর নেই। কোন সাড়াশব্দ নেই। এক অস্বস্তি আর অশান্তি এসে বাসা বেঁধেছে মৃগনয়নীর মনে।

বনবিহারী মদ খায়। মাতাল হয় আজকাল। সংবাদটা পাবার পর থেকে অস্বস্তি ওর বেড়েই চলেছে। নিজেকে শান্ত করবার কোন সান্ত্বনাও যেন খুঁজে পাচ্ছে না আজ।

খেতে বসে বার বার মনে হয় বনবিহারী কি খাচ্ছে কে জানে। মদ খাচ্ছে হয়ত এখন। তারপর কি বাড়ী ফিরে আসবে? না আসতেও পারে, হয়ত কোথাও গেছে। অন্য কোথাও। অন্য কোন মেয়েমানুষের বাড়ী। সেখানে বনবিহারী গিয়ে কি করতে পারে। হয়ত আরও মদ খাবে। নাঃ। আর ভাবতে পারছে না। হাত ঝেড়ে উঠে পড়ে মৃগনয়নী। ছেলে কেঁদে উঠবে এখুনি।

পুঁটি বলে,—কি হোল রে ?

—যাই ছেলে বোধহয় কাঁদছে।—বলে বেরিয়ে পড়ে মৃগনয়নী।

অন্ধকার রাত। দয়াময়ী কালীবাড়ীতে কাঁসর ঘণ্টা বাজছে এত রাত্রে। আজ বোধহয় তবে অমাবস্যা। কি ভীষণ অন্ধকার। একটা লোকজনের সাড়াও নেই এদিকটায়।

উত্তর দিকে হনহন করে এগিয়ে আসে মৃগনয়নী। আজ আর ঘাটে যাবে না। ইঁদারার পাড়েই আঁচিয়ে নেবে।

এঁটো হাতে এগোতে এগোতে হঠাৎ ওর নজরে পড়ে একটা মানুষ ঢুকল তরঙ্গিণীর ঘরে। তরঙ্গিণীর ঘরটা ইঁদারার একটু তফাতে। ঘাটের দিকে একেবারে উত্তরে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মৃগনয়নী। তরঙ্গিণী রাত্রে একটু ফল মিষ্টি খেয়ে শুয়ে পড়েছে। সঙ্গে শোয় সনকা ঝি। সনকা ঝি অবশ্য এখনও খাওয়া মিটিয়ে ঘরে আসেনি।

কে ঢুকল ঘরে।

আস্তে আস্তে ঘরের কাছাকাছি এগোল মৃগনয়নী। ভয় ভয় করছে। তবু এগোল।

কথা কানে আসছে। দিদির গলা। আরও কাছে এগোয় ও। ঘরের পিছনের দিকটায় দাঁড়িয়ে কান পাতে। নিজের বুকের শব্দ ও নিজেই শুনতে পারছে। ভয়ও করছে। কিন্তু এ কৌতূহলকে নিবৃত্ত করবার শক্তি নেই ওর।

—কেন বারে বারে ডেকে পাঠান ?—লোকটার গলা। গলাটাও যেন চেনা-চেনা।

—কেন তা' কি আজও বুঝিয়ে বলতে হবে ? ছোটবেলা বর-বৌ খেলতাম আমরা মনে আছে।

এ যে দিদির গলা !

—আপনি কি চান ?—গলাটা বেশ চেনা।

তরঙ্গিণীর হাসির শব্দ শুনতে পায়।

—এখুনি তো ঝি এসে পড়বে।

—পড়ুক। ওর হাত দিয়েই তো চিঠি পাও।

—কিন্তু আমার বড ভয় করছে। আপনি সর্বনেশে কিছু করবেন না।

—ছিঃ। তুমি পুরুষ মানুষ সত্য। তোমার মুখে এসব কথা সাজে না।

সত্য ! নায়েব মশায়ের ছেলে সত্য ! সত্যই তো দিদিকে শ্বশুরবাড়ী থেকে আনতে গিয়েছিল। মৃগনয়নীর বুকের শব্দ বন্ধ হবার উপক্রম।

—আমার দিকে তাকাও সত্য। ছাখো।

মৃগনয়নীর হাত পা ঘেমে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এ সব কি শুনছে ও। স্বপ্ন দেখছে না ত'? এ কি সত্য হতে পারে? মাত্র কয়েকমাস আগে জামাইবাবু মারা গেছেন এর ভেতরে সব ভুলে গেল দিদি। এই ভালবাসা? দিদির প্রাণে কি একবিন্দু ভালবাসাও ছিল না জামাইবাবুর জন্যে?

মৃগনয়নীর বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। কানে শুনেও অনেক কথা অবিশ্বাস্য মনে হয়, এ তাই।

—আপনার দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এমন রূপ আপনার অথচ এমন মন! আশ্চর্য!

—মন আমার বশে নেই সত্য।

—কেন?

—আমার মনে একটা জ্বালা আমাকে এমন করে তোলে। এ যে কিসের জ্বালা জানিনে। বিশ্বাস করো সত্য, আমি চেষ্টা করেও মনকে বশে আনতে পারিনি।

দিদির মুখে এমন কথা! এবার অবাক হতে হয়।

দিদিও তাহলে নিজের মনের দিকে মাঝে মাঝে তাকায়। মনকে দেখবার চেষ্টা করে। তবে কেন দেখে না তার উগ্রকামনার রূপকে।

দেখে। আর দেখে বলেই জ্বলে। জীবনের এ সত্য মৃগনয়নী অনেকবার টের পেয়েছে যে মনকে চোখে চোখে রাখা বড়ই কঠিন।

অনেক বছর কাটিয়ে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে ওর স্থির ধারণা হয়েছিল, মনের স্বভাব পাঁচ বছরের ছেলের মত। চঞ্চল অবুঝ। বোঝালে বেঁকে বসে। না বোঝাতেই হয়ত' ঠাণ্ডা হয়। ওকে চোখে চোখে না রাখলে জীবনের অনেক সম্পদকে ভেঙে তচনচ করে দেবে।

তরঙ্গিণী অসহায়। মৃগনয়নী আজ বোঝেনি, পরে বুঝেছিল। মনের দৌরাত্ম্যে আর অসংযত আব্দারে বিভ্রান্ত হয়েছিল তরঙ্গিণী। কেন হয়েছিল এ প্রশ্নও মূর্খামী। সংসারে অনেক কিছু হয়, হতে হয় বলেই হয়, কেন হয় তার জবাব মেলে না।

আজ রাত্রে মৃগনয়নী সইতে পারছে না তরঙ্গিণীর এই উগ্ররূপ! সত্যও মরবে। ওর বরকে ও মেরেছে। সত্যকে মারবে। ওর আগুনের মত রূপে কত পুরুষ যে দগ্ধ হয়ে নিশ্চিহ্ন হবে কে জানে?

অমাবস্যার অন্ধকার আলকাতরার মত চুঁইয়ে পড়ছে। পায়ের নীচে মাটি দেখা যায় না। সামনের কামরাঙা গাছটাকে মনে হয় দৈত্যের মত।

আর সাড়া শব্দ নেই। মৃগনয়নী আস্তে আস্তে ঘরের পিছন থেকে সরে আসে; ইঁদারায় গিয়ে আঁচিয়ে গুটিগুটি চলে আসে নিজের ঘরে। দিদির ওপর এক বিজাতীয় ঘৃণা বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে ওকে। ছেলে তখনও নিরুদ্বেগে ঘুমোচ্ছে। ছেলের কাছে গিয়ে শোয়।

পুঁটি ততক্ষণে এসে শুয়েছে। ওকে দেখে বলে,—কিলো, আচাতে এত দেরি।

মৃগনয়নী ছেলের কাঁথাটা পাল্টে দেয় নীরবে।

—কোথায় ছিলি ?

মিথ্যে বলবে, না বলে দেবে সব কথা পুঁটিদিকে ? বলবে সব কথা কর্তামাকে মাকে ? বলতেও যেন গলা ধরে আসছে।

—কতক্ষণ এসে শুয়ে আছি। তোকে তো খুঁজেও এলুম পুকুর ধারে আঁচাতে গিয়ে।

—পুকুর ধারে ছিলুম না।

—কোথায়।

—ইঁদারার ধারে।

—এত দেরি ওখানে ?

—বেশ লাগছিল। অন্ধকারে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ ভালই লাগে।

পুঁটি হাসে—তোর কি মাথা খারাপ নাকি ? অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে থাকা! রক্ষে করো বাবা! ভয়ে হাতপা গুটিয়ে আসবে আমার।

মৃগনয়নীও হাসে,—তোর মত অমন আলগা ভয় আমার নেই! বললে একা একা কালীবাড়ী থেকে ঘুরে আসতে পারি।

পুঁটি হেসে ওঠে,—বলিস কিরে! দশটাকা দিলেও আমি ওই চাঁপা ঝোপের পাশ দিয়ে যেতে পারব না। আর ওই পাঁচিলটা ?

মৃগনয়নী হাসতে হাসতে শুয়ে পড়ে। পুঁটি আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে। মৃগনয়নী মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে তরঙ্গিণীর চিন্তায়।

এরপর প্রতিদিনই ও তরঙ্গিণীর ঘরের দিকে লক্ষ্য রাখে। বিশেষ করে রাত্রিবেলা। আর কাউকে দেখতে পায় না। ব্যাপার কি ? আর কি আসে না সত্য ?

ও কথায় কথায় তরঙ্গিণীকেই সেদিন জিজ্ঞেস করে বসে,—দিদি, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

—কি?

—তোর ঘরের সামনে সেদিন এমন ভয় পেলুম।

তেঁতুল আর লঙ্কা ডলতে ডলতে তরঙ্গিণী চোখ বড় বড় করে বলে,—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—কি দেখে ভয় পেলি? ভূত-টূত?

—না। মনে হোল একটা লোক আমার পাশ দিয়ে মানে—একবারে ই'য়ে হয়ে গেল!

তরঙ্গিণীর গালদুটো রাঙা হয়ে ওঠে। চোখের কোলে নীলছায়ার ভেতরে তারা দুটো জলে ওঠে চঞ্চলতায়। খিলখিল করে হেসে ওঠে,—ওমা, তাই নাকি? মানুষ কি রকম বলত?

—তা কি করে বলব? অমাবস্যার অন্ধকার।

—অ। তাই বল। ইঁদারার ওদিকে রাতবিরেতে আর যাসনি যেন। আমাদের সনকা ঝি ভূতচালা জানে। অমাবস্যায় ও আবার কি সব মন্তর তন্তর করে রাখে পুষে। নানারকম সব মূর্তি দেখা যায়। আবার দুপুর রাতে বাইরে বেরিয়ে চাল ভাজা-টাজা দিয়ে ওদের ঠাণ্ডা করে।

মৃগনয়নী ধাক্কা খায় যেন। তবে কি সনকা ঝির ভূতকেই সে দেখেছে? কিন্তু ভূত অত কথা বলবে কেন?

তরঙ্গিণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। বলে,—ও সব ভূতগুলো আবার চেনাজানা মানুষের মত কথাবার্তাও বলে!

সবনাশ! তবে বোধহয় মৃগনয়নী ভূতই দেখেছে! জিজ্ঞেস করতে হবে সনকা ঝিকে।

তরঙ্গিণী নিজেই যেন ভয় পেয়ে বলে,—আমি ত' ভয়ে সনকাকে একদিন বলেছিলুম আমার ঘর থেকে চলে যাও। সনকা আমায় একটা মন্তর শিখিয়ে দিলে, তারপর থেকে আমার আর ভয় হয় না। কিছু দেখিও না।

তেঁতুল মাখা একটু হাতে তুলে বলে,—ত্থাখতো আর লঙ্কা দোব নাকি? তোকে কিন্তু বেশী দোব না। কাঁচা পোয়াতি!

মৃগনয়নী হতভম্ব হয়ে গেছে। হাত পেতে তেঁতুল মাখা নেয়। মুখে দিতে ভুলে যায়।

—কি হোল রে? চেখে ছাখ?

একটু মুখে দেয়। ঝালটকে তেমন কোন স্বাদই পায় না। সমস্ত স্নায়ু ওর আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

—আর লঙ্কা ডলবো?

মাথা নাড়ে মৃগনয়নী।

—যাই বৌঠানকে আর পুঁটিকে ডাকি। তরঙ্গিণী বেরিয়ে যায়।

মৃগনয়নী অনেকক্ষণ এইভাবে বসে থাকে। একটা কথা বলবার ক্ষমতাও ওর থাকে না।

কয়েকদিনের ভেতরই তরঙ্গিণী সম্বন্ধে ঘৃণাকে সংযত করে নিয়েছে মৃগনয়নী। ও ভেবে স্বস্তি পায় যে ও তাহলে ভুলই দেখেছে। ভাগ্যিস ভুল দেখেছে, নইলে দিদি তার কাছে কত ছোট হয়ে যেত।

সনকা ঝিকে জিজ্ঞেস করেছিল। সনকা হেসে বলেছিল,—দিদি ঠিকই বলেছে। কাউকে যেন বোল না।

স্বস্তি পেয়েছে মৃগনয়নী। একটা মাত্র অস্বস্তি বনবিহারীর কোন খবর পাচ্ছে না, আজ অনেক দিন। দুচারদিনের মধ্যেই আর একখানা চিঠি লেখে মৃগনয়নী। এবারে আরও অনুনয়। কিছুটা বা কড়া।

"কিছুতেই আর থাকিতে পারিতেছি না। খবর না দিয়া একা একাই কলিকাতায় যাইব। পত্রপাঠ উত্তর দিবা।" আরও অনেক কথা।

তারপর আবার দিনের পর দিন উত্তরের প্রতীক্ষা।

আরও মাস দুয়ের ওপর কেটে যায়। কর্তাবাবুর অবস্থা হঠাৎ যেন খারাপের দিকে যায়। দিনকতক হোল কিছুই খেতে পারেন না। খাওয়াতে গেলে চীৎকার করে ওঠেন। চুপ করে শুয়ে থাকেন। একভাবে। অবস্থা ভাল নয়।

সমস্ত বাড়ীখানা আবার থমথমে হয়ে ওঠে। সমস্ত গ্রামখানাও। কর্তাবাবুর অবস্থা খারাপ। কবরেজ মশাই বলে গেছেন, বিশেষ আশা দেখছিনে আর। যন্ত্রতে কাজ কিছুই হচ্ছে না।

হাতপায়ের পাতা ফুলে উঠেছে। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠছেন।

কর্তামা পাশে বসে আছেন আজ প্রায় দুদিন। খাওয়া নাওয়া ভুলে গেছেন। শুধু ঠাকুর ঘরে এক আধবার যান। গিয়ে অজস্র কাঁদেন। ফিসফিস করে বলতে

শুনেছে মৃগনয়নী। ঠাকুরের সামনে বলছেন কর্তামা,—ওর এ যন্ত্রণা আর চোখে দেখতে পারছিনা ঠাকুর। হয় ওকে নাও, না হয় সারিয়ে দাও।

কুঞ্চিত গালদুটো ভেসে যায় চোখের জলে। মৃগনয়নী তাড়াতাড়ি সরে যায় ঠাকুর ঘরের সামনে থেকে।

আজ সন্ধ্যায় কর্তাবাবু চোখ মেলে তাকিয়েছেন। চারদিকে তাকাচ্ছেন। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছেন ঘোলা চোখে।

—কাউকে খুঁজছ?—কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেন কর্তামা।

যেন হতাশ হয়ে চোখ বোঁজেন কর্তাবাবু।

—ডাকব কাউকে?

কর্তাবাবু আবার চোখ মেলেন। নিদারুণ কষ্ট হয় তাকাতে। মৃগনয়নী সামনে যায়। ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন অন্য কাউকে দেখে।

—রাম! রাম কই?—এতক্ষণে অস্ফুটস্বরে বলেন কর্তাবাবু।

কর্তামা মৃগনয়নীর দিকে তাকান।

—বাবাকে ডাকব?—বলে মৃগনয়নী বাবাকে ডাকতে যায়।

ছোট ভাই রামতারণকে ডাকেন কর্তাবাবু। রামতারণ অতি অল্প সময় আসেন ঘরে। সবদাই আত্মস্থ। এক আধবার হয়ত খাবার পরে বা শোবার আগে ঘুরে যান। দেখে যান দাদা কেমন আছেন।

রামতারণ ধীর পায়ে ঘরে ঢোকেন। পিছনে মৃগনয়নী। কর্তামা সরে বসেন।

কাছে আসেন রামতারণ,—দাদা ডাকছ?

কি মৃদু শান্ত স্বর। কর্তাবাবু তাকান এবার। ইশারায় ডাকেন,—কাছে আয়।

রামতারণ ঠাণ্ডা অচঞ্চল হাতখানি রাখেন কর্তাবাবুর কপালের ওপর। কর্তাবাবু জড়িয়ে ধরেন হাতখানা। বলেন আস্তে আস্তে,—রাম?

রামতারণ তাকান। মৃদু হাসি মুখে।

কর্তাবাবুর চোখদুটো ভিজে ওঠে, ঠোঁট দুটো কাঁপে,—রাম! হাতখানা ধরে বলেন,—আমার জন্যে একটু জপ করবি রাম?

রামতারণ নীরবে তাকিয়ে থাকে। কর্তামা কেঁপে ওঠেন। মৃগনয়নীও।

কর্তাবাবুর চোখের কস্ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে বালিসে। বালিস ভিজে ওঠে। আবার চোখ বোঁজেন কর্তাবাবু। নিথর হয়ে পড়ে থাকেন কিছু সময়।

নিজের হাতখানা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেন রামতারণ। ওঠেন। কর্তামা তাকান রামতারণের দিকে। ভয়ে ভয়ে।

রামতারণ হাসেন, ভয় নেই বৌঠান। দাদার কল্যাণে জপ আমি করব। কারো জন্যে করি না। দাদার জন্যে করব।

কর্তামা আস্তে আস্তে গিয়ে বসেন কর্তাবাবুর কাছে। রামতারণ চলে গেলেন। নিজের ঘরে গিয়ে জপে বসলেন।

বেশ মনে আছে মৃগনয়নীর যতবার বাবার কাছে গেছে ও, দেখেছে চোখ বুঁজে জপ করছেন বাবা। খেতে ডাকতে গিয়ে সাড়া পায় নি। বিছানা পেতে দিতে গিয়ে সাড়া পায় নি। সমস্ত রাত এক ভাবে বসে চোখ বুঁজে জপ করেছেন বাবা।

ভোর রাত্রে কর্তাবাবু মারা যাবার পর রামতারণকে ডাকতে গিয়ে মৃগনয়নী অবাক। এইমাত্র জপ রেখে তাকালেন।

—বাবা, কর্তাবাবু—। মৃগনয়নী আর বলতে পারেনি।

পাদপূরণ করেছেন রামতারণ,—দেহত্যাগ করে গেছেন, দেখেছি।

'দেখেছি' কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল মৃগনয়নী। কিছু বলতে সাহস পায়নি। চলে গেছে ওখান থেকে আর কথা না বলে।

কর্তাবাবুর মৃত্যুর পর সবাই ভাবল, এবার রামতারণকেই এ জমিদারীর হাল ধরতে হবে। কথাটা রটেও গেল চারদিকে।

রামতারণ একটু হেসে ডাকলেন ছোটভাইকে। বললেন নায়েবকে,—ওই-ই সব দেখাশুনো করবে। যখন যা সই করবার দরকার হয়, করে দোব আমি।

নায়েব মশাই আড়ালে একবার ছোটভাইয়ের নামে দুটো কথা বলতে এসেছিলেন, —মানে, বুঝলেন না, এতে কি কারো ভাল হবে? উনি একটু কূটবুদ্ধি!

—তা হোক। যা বলেছি, তাই করুন।

নায়েব চলে গেলেন অগত্যা। সব সংসারের ভার নিলেন খুড়োমশাই।

খুড়ীমা নিশ্চিন্ত হয়ে মুখে দুটো পান পূরলেন। মা মনে মনে অজস্র দোষারোপ করলেন তার বরাতকে। এমন জপের মালা যার স্বামী যেন সাতজন্মের শত্রুরও না হয়। দেওরের হাতে সব ছেড়ে দেয়া, এটা কি ভাল কাজ হোল।

খুড়োমশাই সংসারের কর্তৃত্ব কর্তামার ওপরেই রাখলেন। কর্তামা আপত্তি করেছিলেন,—আমাকে আর কেন ঠাকুরপো।

খুড়োমশাই মুখখানা গম্ভীর করে বললেন,—তুমি ভেঙে পড়লে কি করে চলবে বোঠান ?

কর্তামা আর কথা বলেননি।

সবচেয়ে ভেঙে পড়ল পুঁটিদি। কর্তাবাবুর মৃতদেহটা জড়িয়ে ধরে এমন কান্না বোধহয় আর কেউ কাঁদেনি। সবাই কর্তাবাবু বলে, তাই ছোটবেলা থেকে বাবাকে ও কর্তাবাবুই বলত।

সেই থেকে পুঁটিদি'র ফিটের ব্যারাম হোল। মাঝে মাঝেই হঠাৎ পড়ে অজ্ঞান হয়ে যেত। মুখে একটা অব্যক্ত শব্দ হোত। মৃগনয়নীর সামনেই কতদিন হোল, চোখে মুখে একটু জল দিলেই একটু পরে আবার স্থির হয়ে পড়ত।

তরঙ্গিণী কারো সঙ্গে বেশী কথা বলা বন্ধ করে দিলে। বেশীর ভাগ সময়ই থাকত নিজের ঘরে। একা একা। কথা বললে বড় একটা উত্তর দিত না। কেমন একটা অন্যমনস্ক ভাব পেয়ে বসেছে যেন তাকে। একটা ঘটি মাজছে ত' মাজছেই। বার বার মাজছে।

মৃগনয়নী অবাক,—কিলো দিদি কবার মাজছিস ঘটি ?

—অ !—একটু যেন চমকে ওঠে তরঙ্গিণী। একটু লজ্জাও পায় মনে হয়।

দাওয়ায় বসে মাটি খুঁটতে খুঁটতে হয়ত বিকেলটাই কেটে গেল।

সন্ধ্যার একটু আগে গা ধুতে যায়। গা ধুয়ে বাড়ী ফিরতে ফিরতে হয়ত বা সন্ধ্যে পার।

মা বলেন,—গা ধুতে এত রাত হোল ?

কথা বলে না। ভিজে কাপড়খানি বুকের ওপর ভাল করে জড়িয়ে নিজের ঘরে ঢোকে তরঙ্গিণী। মা একটু বিরক্তই হন।

মৃগনয়নী হাঁপিয়ে ওঠে। শ্রাদ্ধাদির পরে যেন শূন্য হয়ে যায় বাড়ীখানা। যেন দেহ আছে প্রাণ নেই।

সমস্ত প্রাসাদ নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। দেবতাহীন মন্দিরে যেন কতকগুলো বাদুড় ঝুলে আছে। নিজের নিজের একটু একটু প্রাণ নিয়ে ঝুলে আছে কোনমতে। নিজেকে সামলাতে এখন ব্যস্ত সবাই।

বর্ষা এল। সড়কের পাশে খাল ডুবে গেল ঘোলা জলে। জল এবার উঠে এল বাইরের বিস্তীর্ণ আমবাগানে। জল থৈ থৈ আমবাগানে ঝিরঝিরে বর্ষণের শব্দ। টুপটাপ দু একটি জলে-ভেজা পাতার শব্দ। আয়না মহলে উঠলে দেখা যায় যতদূর চোখ যায় শুধু জল।

বটগাছটা দেখা যায় যেন ভাসছে জলের ওপর। ক্ষেত পুকুর ঝোঁপ ঝাড় সব একাকার। ছোট ছোট ডিঙি নিয়ে চলেছে বাজারে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জলে ভেজা বিরক্ত মানুষ। পশ্চিমপাড়ার ঘরের উঠোনে জল উঠেছে বন্যার মত।

কদিনই বা। দেখতে দেখতে জল কমতে শুরু হয়। ভেজা পিছল আমগাছের গুঁড়িগুলো দেখা যায় আবার। আমবাগান থেকে জল সরে যায়। জল গিয়ে থামে সড়কের মাথায়। গেরুয়া রঙের ঘোলা জলের রঙ ফিকে হয়ে আসে ক্রমে। আবার দেখা যায় সবুজ। ভিজে পচা গাঢ় সবুজ এধারে ওধারে।

আরও দিন যায়। সড়ক থেকে জল নেমে এসে এলো খালে। খাল টইটুম্বুর। জোরালো স্রোতে ডিঙিগুলো সামলানো দায়। টাল খেতে খেতে সিধে হয়। আয়না মহলের ছাদে দাঁড়ালে দেখা যায় গোছাগোছা কাশবন খেতের পাশে পাশে, বিলের ধারে ধারে দুলছে বাতাসে। একটানা বাতাসে তুলোর মত কাশফুল উড়ে যায়। উধাও হয়ে যায়।

ঘোলাটে পাংশু আকাশে দেখা দিয়েছে সুনীল টুকরো মেঘ। কিছু কিছু বা তুলোর মত নরম মেঘের টুকরো।

পুজো এসে গেল। ঢাকের বাজনার কথা মনে হলেই আজও বুকটা নেচে ওঠে মৃগনয়নীর। সবচেয়ে ভাল লাগে সপ্তমীর দিন ভোরের ঠাণ্ডা শীতল বাতাসের সঙ্গে ভেসে-আসা সানাইয়ের আওয়াজ।

গায়ের শাড়ীটা ভাল করে জড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। এক এক অব্যক্ত অনুভূতি প্রাণে আসে যে কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে হয় না। মনে হয় কি যেন অনেক নেই—অনেক অনেক নেই-য়ের ভেতর কি যেন এক আরামে বুক ভরে ওঠে। কিছুতেই উঠলো না মৃগনয়নী।

তরঙ্গিণী এসে ডাকল,—কই'রে ওঠ।

উঁ! বলে আবার পাশ ফিরে শোয় মৃগনয়নী।

পুঁটি ভোরে উঠে চলে গেছে শিবপুজোয়।

ছেলের কাঁথাটা পালটে দিয়ে চলে যায় তরঙ্গিণী। ঘাটের দিকেই যায়। ভোরে স্নান করে আসতে হবে। কর্তামার সঙ্গে পুজোর কাজে বসতে হবে। নাড়ু খইমুড়কী মোয়া, তক্তি এমন গঙ্গাজলী পর্যন্ত করে দিতে হবে।

একমাস আগে থেকে খাটতে শুরু করেছে তরঙ্গিণী। রোজ দুপুরে ভোগের রান্না করে। তরঙ্গিণীর কাজ বড় পরিষ্কার। কর্তামা তাই ওর ওপরই বেশী কাজ চাপান।

পুঁটিকে একটু কাজ করতে বললে ঘেমে অস্থির হয়ে ওঠে। ওকে দিয়ে ফুলের সাজ, থালা সাজান এ ছাড়া আর কিই বা হতে পারে!

কর্তামা মানুষ বুঝে কাজ দেন। তাঁর বিচক্ষণতার তুলনা দেখতে পায়নি আর মৃগনয়নী।

এবার কর্তামা একটু বিমর্ষ। কর্তাবাবু নেই। তাছাড়া খুড়োমশাই টাকার দিকটা একটু চেপেছেন এবার।

—তেমন আদায় পত্তর হোল না বৌঠান। মহলে গিয়ে অবস্থা দেখে চক্ষুস্থির।

কর্তামা চুপ করে থাকেন।

খুড়োমশাই নিজে নিজেই হাসেন,—একটু টেনেটুনে কি করা যায় না?

তা কেন যাবে না?—কর্তামার মুখখানা শুকিয়ে গেলেও বলতে হয়।

—তা নয়, মানে, ধরো ডাকের সাজ না করে এবার না হয় মাটির সাজ হোক।

কর্তামা দৃঢ়স্বরে আস্তে বলেন,—না। ডাকের সাজ হবে। যেখানে কমাবার আমি কমাব।

খুড়োমশাই হাসতে হাসতে চলে যান,—বাঁচলুম, যা হয় তুমি করো।

কর্তামা চুপ করে বসে ভাবেন।

কমাতে হয় কর্তামাকে। ভোগের দিকটা। অনুষ্ঠানের ক্রটি কিছু হয় না। কিন্তু আয়োজন একটু কমাতে হয়। নিমন্ত্রণের দিকে টানাটানি না করলে আর চলে না এবার।

বাড়ীর সবাই বোঝে। বলে না কেউ কিছু। কর্তামার মুখের ওপর কিছু বলা—ভাবতেও পারা যায় না।

পুজোর ভেতরে এবার এমন একটা ঘটনা ঘটল যে ভাবতে পারা যায় না। অতি সামান্য কারণে খুড়োমশাই এমন চীৎকার করে উঠলেন যে সবাই শুধু ভয়ই পেলো না, রীতিমত কাঁপতে লাগল।

এও কি সম্ভব? বাইরের মানুষও কিছু ছিল। বাড়ীতে যে কত মানুষ ছিল আঙুলে গোণার বাইরে।

এত মানুষের সামনে খুড়োমশাই প্রায় চীৎকার করে উঠলেন,—আমার কথার ওপর কথা। দুপুরে লোক খাবে না। আমি বলেছি, সব লোক খাবে সন্ধ্যে থেকে। তাই হবে। তাই হতে হবে। কে বলেছে দুপুরে লোক বসাতে?

কে একজন প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বলল,—আজ্ঞে কর্তামা।

—কর্তামা-টর্তামা বুঝি না। আমি যা বলব, তাই হবে।

কর্তামা মণ্ডপের দোরের পাশে দাঁড়িয়ে চৌকাঠটি ধরলেন। চোখ দুটো বুজলেন একবার।

একটা পাথরের মত নীরেট বহুপুরোনো বাঁধ ভেঙে গেল যেন। এই আজ ভাঙল। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সবাই দেখল। চোখের সামনে দেখল এই ভাঙনের শুরু। স্তব্ধ হয়ে গেল। হতবাক হয়ে গেল।

এইবার ভেঙেছে। একটু বা উল্লসিতও হোল কেউ কেউ। এতকালের এক দম্ভ চূর্ণ হোল আজ।

খুড়োমশাই খড়মের শব্দ করতে করতে চলে গেলেন।

কর্তামা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। চোয়ালদুটো কঠিন হয়ে আরও চেপে গেল যেন। সাদা সাদা চোখদুটো কর্তামার মৃতের মত মনে হোল।

পুজো কাটল। বিষণ্ণ এক মেঘ এসে ঢাকল যেন শরতের আকাশ। প্রাসাদের কোণে যে বটগাছটার চারা বাববার কেটে দিয়েছিলেন কর্তাবাবু, সেটা এবার আর কারো নজরে পড়ল না। ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়ে বাড়তে লাগল।

বিশীর্ণ মুখে কর্তামা আরও নীরব হয়ে গেলেন এই বাড়ীটার মতই। শীর্ণ শরীরে তাঁর ঝরে পড়ল মেদ।

পলাশ গাছের পাতাগুলো সব ঝরে পড়ল। শীত এলো। এবারে যেন প্রচণ্ড শীত। বটগাছের মাথায় সূর্য ওঠবার আগে পর্যন্ত কুয়াশায় ঢেকে থাকে চারদিক। ভিজে ওঠে ঘাসের ডগা, গাছের পাতা আর ক্ষেতে মটরলতার পাতাগুলো।

সন্ধ্যার আগেই ঘরের দরজাগুলো ভেজাতে হয়। আলোগুলো যত উজ্জ্বলই হোক কুয়াশার ভেতর মিটমিট করে। এখানে ওখানে তাওয়ার ভেতরে তুষের আগুনের সামনে বসে ঝিমোয় বুড়োবুড়ীরা।

কর্তামার ঘরেও এক তুষের তাওয়া।

আর একটি তাওয়া মৃগনয়নীর কাছে। ওর ছেলের জন্যে। মৃগনয়নীও ঝিমোয়।

ঘুমের সুখ নেই আর। ছেলেটা বড় কাঁদুনে। রাত্রে ঘুমোবার জো নেই। না ঘুমোলেই নানা চিন্তা। বনবিহারী যে কেন চিঠি দেয় না। কেন আসে না? কতদিন খবর নেই তাঁর।

তীব্র শীতের বিশীর্ণতার ভেতরেও তরঙ্গিনী—যেন আরও উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। শীতের নীরসতার ভেতরেও রসাল হয়ে ওঠে ওর শরীর। নিতম্বের গুরুভারে গম্ভীর

হয়ে ওঠে চলা। রঙ যেন ফেটে পড়ছে আরও। চোখে এক সলজ্জ শান্ত ভ্রমর বাসা বেঁধেছে বুঝি। অবাক হয় মৃগনয়নী।

সেদিন খেয়ে উঠে ঘাটের একটু দূরে বেত বনের কাছে চলে যায় তরঙ্গিণী।

মৃগনয়নী একটু এগোয়। দিদি গেল কোথায়? বমি করছে দিদি। মনে বিদ্যুতের মত একটা চিন্তা ওকে কাঁপিয়ে তোলে।

তরঙ্গিণী আসছে।

—দিদি?

মুখটা ধুয়ে তরঙ্গিণী তাকায়। কি সুন্দর তাকায়।

—বমি করলি কেন দিদি?

তরঙ্গিণী হঠাৎ যেন চমকে ওঠে। উত্তর দিতে পারে না।

—কি হোল তোর?—মৃগনয়নীর স্বর এত গম্ভীর যে তরঙ্গিণী রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। তরুণী উত্তর দিতে পারে না।

তরঙ্গিণীর সবাঙ্গে চোখ বুলিয়ে মৃগনয়নীর ভ্রূদুটো কুঁচকে যায়। কিছু বলে না।

তরঙ্গিণী বলে—আমার শরীরটা কি রকম করছে ভাই। চললুম। বলেই হনহন করে চলে যায় তরঙ্গিণী।

মৃগনয়নী তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে পড়ে একটা শালুক ফুলের কুঁড়ি পানার ওপর ভাসছে। একটা মাছরাঙার পায়ের নখের ঝাপটায় টুকরাটুকরা হয়ে গেল ফুলটা।

আশ্চর্য! সংসার ভরা শুধু বিস্ময়। যা তারা চায় না, তাই-ই হয়। নানা চিন্তায় ভরা মনের বোঝা নিয়েই দিনের পর দিন কাটে।

হঠাৎ এক ঝলক বাতাস বয়ে গেল সেদিন সন্ধ্যায়। একটু একটু গরম পড়েছে। বাতাসটা যেন পালক বুলিয়ে গেল স্নায়ুর ওপর। মধুমাখা পালক। মনটা উধাও। এক ঝলকানীতে স্থির হয়ে গেছে মন। কি যেন চাই। কি যেন না পেলে সব শূন্য। মন উধাও হোল তার সন্ধানে। পলাশের শাখায় হলুদ-সবুজ পাতা দেখা গেল। গাছটা যেন ভরে উঠল রূপে। কেঁপে কেঁপে উঠল নোতুন রসসঞ্চারে। কাকে যেন চাই। এত আভরণ, এত আভরণের কোন মূল্যই যেন থাকবে না, কি একটা না হলে। পূর্ণ হয়ে উঠতে পারছে না।

নিস্তব্ধ দুপুরে আমবাগানের ডালে ডালে কি যে ডাকে ওরা। কি আনন্দের বিক্ষেপ ওদের। শুধু কি কোকিল? কত পাখীর কত কথা। অবিরত ডাকছে। কাকে। কে জানে?

মৃগনয়নী থমকে বসে থাকে। কিছুই ভাবে না। অথচ মনের দিকে যখন তাকায়। তখন দেখে ভাবছে। ওর কথাই ভাবছে। আকাশ পাতাল। ছাই ভস্ম ভাবছে। নিজেই লজ্জায় মুখটা নামায় মৃগনয়নী।

তরঙ্গিণীর দিকে আর তাকান যায় না। রূপে ফেটে পড়ছে বললে ঠিক যা বোঝায় তাই। ভেতর থেকে এক রূপের জ্যোতি ফুটে বেরোচ্ছে চোখে মুখে।

ঘর থেকে প্রায় বেরোয় না। বলে শরীর ভাল নয়। জ্বর-জ্বর করে। সর্বশরীর ঢেকে শুয়ে পড়ে বেরোয়। কি অসুখ কে জানে।

বসন্ত এবার রূপসম্ভার উজার করে দিয়েছে যেন। বনে বনে। মনে মনে। বাতাসের ছোঁয়া যে এত মিষ্টি, একটা ফুলের যে এত সৌরভ, মনে যে এত মধু কে জানত! বসন্ত প্রায় কেটে যায় যায়। মৃগনয়নীর স্নায়ুগুলো সব যেন বিবশ হয়ে এসেছে। ছেলে হাঁটবার চেষ্টা করে। পড়ে যায় উঠোনে।

পড়ুক। উঠতে ইচ্ছে হয় না ওর। ধরতে ইচ্ছে হয় না। এমনি এক বিবশ মুহূর্তে একখানা চিঠি আসে। মৃগনয়নীর চিঠি। বনবিহারীই লিখেছে। চিঠিখানা বেশী বড় নয়।

"অনেকদিন চিঠি দিতে পারি নাই। অফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর আর লিখিবার মত শক্তিও থাকে না জানিবা। একটি দুঃসংবাদ দিতেছি। দাদা বৌঠানকে বাসায় আনবার নিমিত্ত দেশে গিয়া আর একটি বিবাহ করিয়া দুই বধূ লইয়া আসিয়াছে। সন্তানের আশায় বিবাহ করিয়াছে বলিয়া রটাইয়াছে। নোতুন বৌঠানকে সহ্য করিতে পারিতেছি না। তোমাকে আনিতে যাইব জানিবা। আলাদা বাসা ভাড়া করিবা যাইব। খোকা কেমন আছে? তোমার কুশল সংবাদ দিবা। ইতি আঃ বনবিহারী দেব শর্মণঃ।"

বার বার পড়তে হয় চিঠিখানি। ভাশুর আবার বিয়ে করেছে। কালোবৌ নোতুন বৌ দুজনই এসেছে।

কালোবৌয়ের চোখদুটো মনে পড়ে। কানের কাছে কথাকটা বাজে—তোর ছেলে হলে আমায় দিবি?

ছেলেপুলে হয়নি বলে আবার বিয়ে করেছে ভাশুর। কিন্তু এমন বউ থাকতে আবার বিয়ে?

মৃগনয়নী কালো বউয়ের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায় স্পষ্ট। স্পষ্ট দেখতে পায় ওর চোখের ভাষা।—বলেছিলুম তোকে। এই ভয়ই ত' করেছিলুম।

এ ভয়টা বরাবরই ছিল না এমন নয়। কথায় বার্তায় প্রকাশও করেছে কালোবৌ। কিন্তু বেশী প্রকাশ হয়েছে তার মা হবার আকাঙ্ক্ষা। তাই বলে একেবারে আরেকটা বিয়ে! সতীনের ঘর! সমবেদনায় ভরে ওঠে মৃগনয়নীর বুক। নোতুন জা খুব ভাল মনে হচ্ছে না। যা লিখেছে তাতে কালোবৌয়ের দুর্দশা যে কতখানি পর্যন্ত হতে পারে, ও হয়ত ধারণাই করতে পারছে না।

উনি আলাদা বাসা করবেন। তবেই হয়েছে! অন্তরে অসামান্য খুশি জাগলেও কালোবৌয়ের প্রতি সমবেদনা সেটাকে পুরো স্বীকার করতে দেয় না। অমন জা'কে ছেড়ে আলাদা হওয়া! কিন্তু উপায়ই বা কি?

চিঠিখানা আর একবার দেখে। কই কবে আসবে কিছু লেখেনি ত'? আসব মানে ত চার বছর পরও হতে পারে। চারদিন পরও হতে পারে। বোধহয় শীগ্‌গির আসবে। নইলে লিখে জানাত।

নোতুন সংসার করতে তার প্রথম প্রথম কেমন লাগবে কে জানে। আলাদা সংসার। নিজের একার সংসার। ভাবতে যেন কেমন লাগে। একটা পুরো সংসারের সর্বময়ী হয়ে ওঠা। সর্বময়ী। সে যা করবে তাই। অবাধ স্বাধীনতায় বাধা ত কেউ দেবেই না বরং কখনও কখনও বনবিহারীই হয়ত জিজ্ঞেস করবে—তেল লাগবে কতটা বা এ মাসটা ডাল কিছু কম করেই আনো। সোডা সাবান কিন্তু লাগবেই। ওটা কমে হবে না।

নোংরামী মোটে দেখতে পারে না মৃগনয়নী। ঘরদোর নোংরা করাও চলবে না। ঠিকানা ত নেই। কিন্তু রাত্তিরে বনবিহারী যদি মদ খেয়ে ফেরে? একা একা যে ভয়ে মরবে মৃগনয়নী! তখন?

ছেলেটা কেঁদে ওঠে। দুমদুম করে দু'ঘা বসিয়ে দেয় মৃগনয়নী! এমন কাঁদুনে! জঞ্জালে! যেমন বাপ তেমনি ছেলে! বাপ আবার কত জ্বালাবে কে জানে!

পুঁটি প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢোকে।

—বুকের ভেতরটা কেমন করছে ভাই!—হাঁপাতে থাকে।

—কি হোল পুঁটিদি?

—সর্বনাশ হয়ে গেছে।

—কি সর্বনাশ হোল?

পুঁটি এক গেলাস জল গড়িয়ে খেয়ে নেয়। শুয়ে পড়ে হাঁপাতে থাকে।

বুকে হাত দিয়ে বলে—হাঁপটা কেন কমছে নারে?

মৃগনয়নী তাড়াতাড়ি কোল থেকে ছেলেকে নামায়।

—হাত পা কেমন অবশ-অবশ লাগছে!

পুঁটি কি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বে নাকি?

ভয় পেয়ে যায় মৃগনয়নী! ছেলেটা কেঁদে ওঠে। কাঁদুক।

ও পুঁটির দিকে এগিয়ে আসে.—কি হোল বল ত'?

পুঁটির বুকের ওঠা-নামা তখনও কমেনি। বুকে হাত বুলিয়ে দেয়। শাড়ীটা বুক থেকে সরিয়ে দেয়। পুঁটিদির বুকে হাত বোলাতে বোলাতে কষ্ট লাগে ওর। পাঁজরার হাড় হাতে লাগে। কি রোগা আর দুবল পুঁটিদি! একটু সুস্থ হয়ে ওঠে পুঁটি।

—কি ব্যাপার বলত? অমন করে ছুটে এলি কেন?

—বলতে আমার মুখে বাধছে ভাই।

—কেন?

—স্বপ্নেও এ কথা ভাবতে পারিনি।

—শুনি কি কথা?

—বলতে পাচ্ছি না। ভাবতেও পাচ্ছি না। এর চেয়ে সবাই আমরা মরে গেলুম না কেন?

পুঁটিদি আবার হাঁপায় উত্তেজনায়। উত্তেজনা এত প্রবল যে নিজের স্নায়ুকে স্থির করতে চেষ্টা করেও পারছে না।

মৃগনয়নীর রাগ হয় পুঁটিদির ওপর। ছেলেটাকে আবার কোলে নেয়। একটু সময় দেয় পুঁটিকে। চুপ করে চোখ বুঁজে শুয়ে থাকে পুঁটি। খানিকক্ষণ। রাগ করে আর কথা বলে না মৃগনয়নী। ছেলেকে দুধ খাওয়ায়। পুঁটি কিছুক্ষণ জিরিয়ে ওঠে। আবার গিয়ে এক গেলাস জল খায়।

তারপর আস্তে আস্তে এসে মৃগনয়নীর পাশে বসে। আস্তে আস্তে বলে—কর্তামা বোধহয় বাঁচবে না এ খবর শুনলে।

কি এমন খবর! মুখে কিছু বলে না মৃগনয়নী। রাগে।

—মেজখুড়ীমা ঘরে দোর দিয়েছে। এখনও খোলেনি।

—কে মা?—অবাক হয়ে বলে মৃগনয়নী।

—হ্যাঁ রে। তবে আর বলছি কি? এমন সর্বনাশ কি কেউ ভাবতে পেরেছি?

মৃগনয়নী অবাক হয়ে তাকায়।

—খুড়োমশাই বা কেউ জানে না এখনও। জানলে যে কি হবে ?

আবার বলে মৃগনয়নী—কি ব্যাপারটা খুলে বলো না।

—কাউকে বলবি না বল ?

—না।

—কাউকে না। গাঁয়ের যেন কাকপক্ষী টের না পায়!

—না, না, না, বলব না। উঃ! এতক্ষণ ধরে কথাটা কি বলতে পারলে না!

—এগিয়ে আয় আরও।

বলে পুঁটি নিজেই এগিয়ে যায় ওর কাছে। কানের কাছে মুখটা এনে খুব আস্তে কি বলে প্রথমটা মৃগনয়নী বুঝতে পাবে না। বলে—একটু জোরে বল ?

একটু জোরে বলে পুঁটি—দিদির ছেলেপিলে হবে। পাঁচমাস। বলেই আবার হাঁপাতে থাকে পুঁটি।

—খবদ্দার বলছি কাউকে বলবি না কিন্তু!

মৃগনয়নী কাঠের মত বসে থাকে। তরঙ্গিণী সন্তানসম্ভবা। বিধবা তরঙ্গিণী একি করে বসেছে? এর চেয়ে তরঙ্গিণী মরেছে শুনলে খুশী হোত মৃগনয়নী। বোধহয় মৃগনয়নীর মা-ও।

মরুক। আজই যেন মরুক! বাবার যেন আর এখবর শুনতে না হয়। আজ রাত্রে কি তরঙ্গিণী মরতে পারে না ঠাকুর? বাবা শুনলে কি হবে? বার বার বাবার কথাটাই মনে হয় মৃগনয়নীর। কি হবে বাবার ভাবা যায় না। এর পরও কি বাবা আর বাঁচবে?

—বাবা শুনেছেন?

—না—বলে পুঁটি আবার শুয়ে পড়ে।

—কর্তামা শুনেছেন?

—হ্যাঁ।

—কর্তামা কি বললেন?

—কিছু না। ঠাকুর ঘরে গিয়ে বসে আছেন। আমিও শিবমন্দিরে চললুম ভাই। বাড়ীতে আমার ভয় ভয় করছে।

মৃগনয়নী কথা বলে না। বার বার মনে হয় ওর দিদি এত নীচে নামল? কি করে নামতে পারলে? কত মিথ্যে কথা বলেছে তাকে। সত্যকে দেখতে পেয়েছিল মৃগনয়নী। সত্যকে দেখাটা তার সত্যই। ভূত দেখা নয়। ভূত বলে উড়িয়ে দিল

দিদি। অম্লান মুখে অজস্র মিথ্যা বলে গেল। এক পাপ ঢাকতে হাজার পাপের আশ্রয় নিতে হোল, নিতে হবে।

পুঁটি গুটিগুটি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ যেন ভূত দেখে আবার ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। মৃগনয়নীর গায়ে খুব জোরে ঠেলা মারে।

—কি হোল আবার?

—আসছে।

—কে?

পুঁটি কিছু বলবার আগেই তরঙ্গিণী এসে ঘরে ঢোকে। ওর নিতম্বভার আজ বিষে রসিয়ে আছে বলে মনে হয়। আজও তরঙ্গিণীর রূপের জ্যোতি যেন আগুনের মত জ্বলছে বলে মনে হয়। এ আগুন সংসারটাকে জ্বালাবে। শুধু জ্বালাবে না, ছাইয়ের শ্মশান তৈরি করবে। তরঙ্গিণী সর্পিনী। তরঙ্গিণী নাগিনী। ওর নিশ্বাসে বিষ। ওর দৃষ্টিতে বিষ। ও ঘৃণ্যা। ও পণ্যা হয়েছে।

মৃগনয়নী পাষাণের মত বসে থাকে। পুঁটি শুয়ে পড়ে চোখ বুজে থাকে।

তরঙ্গিণীর মুখটি মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায়। তবু একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে—তোর ছেলেকে একটু দে। ঘুম পাড়িয়ে দি।

মৃগনয়নী কেঁপে ওঠে। ছেলেকে জোর করে চেপে ধরে পাথরের মত বসে থাকে। তাকায় না ওর দিকে।

তরঙ্গিণী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এগিয়ে গিয়ে আবার পিছিয়ে আসে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মাথাটা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। আরও একটু সময়। তারপর যেমন এসেছিল তেমনি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

তেরো

মনের অনমনীয় আবেগের সুতীব্র জোয়ারে কঠিন বৈধব্যের বাঁধও ভেঙ্গে যায়। কেন ভাঙ্গে? এ বড় বিচিত্র লীলা। সুকঠোর সংযম এক মুহূর্তে আলগা হয়ে যেতে পারে। কত অঘটনই না ঘটতে পারে অতৃপ্ত যৌবনে।

মৃগনয়নী কতবার ভেবেছে মানুষের এই বয়েসটা বড় ভয়াবহ, বড় মিষ্টি, ভারী করুণ। অভিনব সমাবেশে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যৌবনের প্রতিটি মুহূর্ত। নিদারুণ

ভাবাবেগের চাপ সইতে হয় প্রতি মুহূর্তে। তবু মানুষ জান্তব আবেগের কবলে পড়ে না, তাই সে মানুষ। তীক্ষ্ণতর বুদ্ধি দিয়ে সুতীক্ষ্ণ বিচারের ধারে কুচো কুচো করে কেটে ফেলে তীব্রতম কামজ রূপচিন্তাকে। মানুষই পারে আর কেউ নয়।

মৃগনয়নীর অভিজ্ঞতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই সত্য যে সত্যের চেয়ে মিথ্যার তীব্রতা বেশী। গতি বেশী। কিন্তু সত্যের গভীরতা থাকলে, তাকে তীব্র গতি এলেও তলিয়েই যেতে হয় না। হয়ত তলিয়ে যাবার আগে একটু তোলপাড় হয় মনের সাগরে। সত্যের বোধ যেখানে অগভীর, হালকা, সেখানেই মিথ্যার জয়।

দিদিরই বা কি দোষ? এক একবার ভাবে মৃগনয়নী দিদিরই বা কি দোষ! তেষ্টা মিথ্যে হলেও তীব্র, ও হেরে গেছে সেখানে। ভেবেছিল জিতবে। যৌবনের শেষ রসবিন্দুটুকুও উপভোগ করতে ছাড়বে না। ও ঠকবে না। কিন্তু ঠকতে হোল সকলের অলক্ষ্যে নিজেরই। সবচেয়ে ঠকছে তরঙ্গিণী। সমাজের শাসন না থাকলেও আজীবন এর জের টেনে যেতে হবে। একদিন বুঝতে হবে, হয়ত বহুদিন পরে যে যৌবনকে সর্বস্ব জেনে ও জীবনের বাজিতে জিততে চেয়েছিল, সেও আজ চলে গেছে। তরঙ্গিণী হেরে যাবে সেদিন, আজ নয়। পিপাসা মেটাতে গিয়ে পিপাসা বেড়ে যাবে। সেদিন আর এক বিন্দু জলও পাওয়া যাবে না।

কথাগুলো এখনই যে মৃগনয়নী পুরোপুরি ভাবতে পারছিল এমন নয়। জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার পরে এ সত্য ওর কাছে উন্মেষিত হয়েছিল—পরে—অনেকদিন পরে। আজ মৃগনয়না যেন কিছুতেই সইতে পারছিল না তরঙ্গিণীকে। আশ্চর্য হোল আরও, যখন দেখল তরঙ্গিণী হাসছে।

মা কতবার জেরা করল তরঙ্গিণীকে,—কে এমন সর্বনাশ করলে? তার নাম কি?

তরঙ্গিণী জবাব দিলে,—তার নাম তরঙ্গিণী।

মা যত রাগল, তরঙ্গিণী তত হাসল। কর্তামাও এলেন।

—হ্যাঁরে, এমন সর্বনাশ কে করলে?

—আমি।

এইটুকু বলেই তরঙ্গিণী আবার হাসল। তরঙ্গিণীর চোখ দুটো জলছিল আর হাসছিল। সমস্ত সংসারটাকে উড়িয়ে দিতে চাইছে ও হেসে। সবাইকে। সাহসে আর শক্তিতে অতুলনীয়া হয়ে উঠেছে তরঙ্গিণী। এত বড় সাহসকে নিন্দা করতেও বাধে, ঘৃণা করতেও বাধে।

তবু মৃগনয়নী বহুদিন ভেবে দেখেছিল, এ সাহসটা অনেকটা ডাকাতের সাহসের

মত, খুনীর সাহসের মত। এই সাহসের অপূর্ব সাদৃশ্য ছিল কর্তাবাবুর চোখেমুখে। অপরূপ তার তেজে। কিন্তু সে নিষ্ঠুর তেজ রাধারাণীকে অসহায় ভাবে মেরেছিল; তার গ্লানি এত তেজেও কাটল না। কাটাতে পারল না কর্তাবাবু।

বললেন কর্তামা,—তোর কি ভয়ও হোল না?

—না। —স্পষ্ট গলা দিদির।

—এত বড বংশে একি করলি তুই?

এ কথার উত্তর দিল না তরঙ্গিণী। যেন খুব কঠোর কিছু উত্তর দিতে পারত, এমনিভাবে তাকাল কর্তামার দিকে।

আর কেউ কিছু বলল না। তরঙ্গিণীর বাইরে বেরুনো বন্ধ হয়ে গেল। দিনরাত ওই ঘরেই থাকতে হোত। খাওয়া ঘরে, নাওয়াও ঘরে। বড বড টবে জল দেয়া হোত স্নানের। সর্বদা পাহারা থাকত এক বুড়ো মালিনী। সনকা ঝিকে বরখাস্ত করা হোল। রাত্রে হৃদয়দাকে রাখা হোল ওর ঘরের বারান্দায়। পাহারাদার। হৃদয়দা একখানা রামদা নিয়ে শুযে থাকত বারান্দায় ঠিক তরঙ্গিণীর দরজার সামনে।

বসন্তকাল বড তাডাতাডি কাটে। এই এলো আর এই গেলো। আমের মুকুল ঝরল, কচি কচি আমে ভরে গেল গাছগুলো।

বিকেলে পশ্চিম-উত্তর কোণটায় কাকের ডিমের মত কালো রঙ জমল। জমাট মেঘ। গাছের পাতাগুলো স্থির হযে গেল অসহ্য গুমোট গরমে। খানিক পরেই ঝিরঝিরে বাতাস। তারপর বাতাসের ঝাপটা, সঙ্গে সঙ্গে গুঁডো গুঁডো বৃষ্টি। আবার বাতাস। কচি আম ঝরে পডল টপ টপ। ডালগুলোর মাতামাতি। দুটো কলাগাছ ভেঙে পডল। লাউ গাছটা শেকডসুদ্ধ উপডে গেল। আকাশের দিকে মুখ করে দাঁডিয়ে দাঁডিয়ে ভিজতে বড আরাম।

সন্ধ্যার পর আবার সব নিথর, নিস্পন্দ। একটুও বাতাস নেই। গুমট গরমে ঘরের ভেতর ছটফট করতে হয।

ছেলেটা কেঁদে কেঁদে ওঠে। ঘুম নেই। একটুও ঘুম নেই কারো চোখে। যত রাজ্যের ভাবনা এসে জডো হয় মাথায়। মা, কর্তামা, খুডীমা ওরাও জেগে থাকে।

খুডোমশাইকে বলা হয়। রামতরণ তখনও জানেন না। অনেক পরামর্শের পর শোনা যায় তরঙ্গিণীকে কাশী পাঠান হবে।

লোকে জানল, তীর্থ করতে যাবে তরঙ্গিণী। মন খারাপ, শরীর খারাপ। ঘর

থেকে বেরোয় না কারো সঙ্গে। কারো সঙ্গে কথা কয় না। তীর্থ করে ঘুরে আসুক।

ভেতরে ভেতরে সব বন্দোবস্ত হয়। কে সঙ্গে যাবে? সঙ্গে যাবে ষোড়শী মালিনীর মা। বয়েস হয়েছে, এ সব ব্যাপারে পোক্ত। তাকে কিছু টাকা দেয়াও ঠিক হয়ে গেছে। আর যাবে নায়েব মশাই নিজে। সব ব্যবস্থা করে আসবার জন্যে বয়স্ক পাকা মানুষের দরকার।

—নায়েব মশাই কি উপকারই যে আমাদের করলেন।—বললে পুঁটি।

—তাই নাকি!—বলে মৃগনয়নী মুচকি হাসল। ও জানে, নায়েব মশাই তার নিজের ছেলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছে। এ প্রায়শ্চিত্ত তাকেই করতে হচ্ছে। সংসারে বিস্ময়ের আর সীমা নেই। বিচিত্রতার শেষ নেই।

—কবে যাবে?

পুঁটি বললে,—বোধহয় দিন পাচেকের ভেতর। ভোর রাতে চলে যাবে। কেউ জানবে না।

—দিদি জানে না?

—না। দিদিকে জানান বারণ।

—ও যদি না যেতে চায়?

—ওর মুখ বেঁধে নিয়ে যাবে, পাল্কীতে ভরে। হাত পাও বাঁধবে।

শিউরে ওঠে মৃগনয়নী।

—এ বাজে কথা পুঁটিদি!

—বারে! খুড়োমশাই বলেছেন। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে সব করবেন।

—বাবা জানেন না?

—বোধহয় শুনেছেন। নয়ত যাবার আগে একবার খুড়োমশাই বলবে তাঁকে। এখন বলতে সাহস করছে না।

—যাবার দিন বলিস কিন্তু, আমি দিদিকে একটু দেখব।

পুঁটি চোখ বড় বড় করে—ও বাবাঃ! আর কেউ যেতে পাবে না সেখানে।

—আচ্ছা, সে আমি দেখব 'খন।

মৃগনয়নীর মনটা ভার হয়ে ওঠে। দিদির জন্যে মনটা হঠাৎ বড় খারাপ লাগে। রাত্রি হয়ে আসে। পুঁটি পুজোর ঘরে চলে গেছে।

মৃগনয়নী চুপ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ ছেলে কোলে নিয়ে। অনেকক্ষণ।

বার বার মনে হয় দিদি চলে যাবে। হয়ত একেবারেই চলে যাবে। আর কি ফিরবে? ফিরতে পারবেও না হয়ত। এ কথা চাপা থাকবে না। কিছুদিনের ভেতর রটে যাবে সর্বত্র। তখন তরঙ্গিণীর পক্ষে এখানে ফেরা আর চলবে না। ফিরলে কেই বা গ্রহণ করছে! হয়ত কালই ভোরে চলে যেতে পারে। আর দেখা হবে না।

গত তিনমাস একটা কথাও বলেনি মৃগনয়নী। তরঙ্গিণীর দিকে তাকায়নি। দু একবার মুখোমুখি হয়েছে। তরঙ্গিণী। কাছে এসে কি একটা বলতে চায়। মৃগনয়নী মুখটা ঘুরিয়ে চলে যায় তক্ষুনি।

বেশ ঝেঝে তরঙ্গিণীর মুখটা ম্লান হযে ওঠে। উঠুক। হন হন করে চলে যায় মৃগনয়নী।

আজ কথাগুলো বড় বেশী মনে পড়ে।

ধীরে ধীরে ওঠে মৃগনয়নী। অন্ধকার উঠোনে এগোয ও। ছেলে কোলে নিয়ে এগোয়। তরঙ্গিণীর ঘরের কাছে যায়। ঘরের ভেতরটা আধা অন্ধকার। কোনায় প্রদীপ জ্বলছে।

একটু দাঁড়ায মৃগনয়নী। একটুও বাতাস নেই। গাছের একটা পাতাও নড়ে না। এই গরমে দোরটা ভেজান।

উঃ! নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে যেন। দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে ভাবে ঘরে ঢুকবে কি ঢুকবে না! আর একটু এগোয।

কোলের ছেলেটা কেঁদে ওঠে। তবু ভেতর থেকে কোন সাড়া পায় না। ঘরের দরজাটা ঠেলে ঢোকে ভেতরে। তরঙ্গিণী বসে আছে চৌকীর ওপর। মেঝের ওপর সেই মালিনী। দুটো হাঁটুর ভেতর মুখটা গুঁজে বসেছিল। হয়ত ঝিমোচ্ছিল। দরজার শব্দ পেযে মুখ তোলে। তাকায়। চোখদুটোয় একটু বিস্ময়, একটু ভয়। চিনতে কি কষ্ট হচ্ছে?

মৃগনয়নী বেড়ার দিকে তাকায়। সোজা তাকাতে পারে না তরঙ্গিণীর দিকে।

—কেরে? অ, আয়। বোস।

মৃগনয়নী এতক্ষণে তাকাতে পারে আস্তে গিয়ে বসে।

ওকে একটু ধর ত দিদি। কাপড় খুলে দিয়েছে। কি দুষ্টু হযেছে!

ছেলেটাকে কোলে দিতে চায়। তরঙ্গিণী তাকায়। বুকে বিঁধে যায় সে চাউনি। বলে,—না, থাক।

মৃগনয়নীর কানদুটো রাঙা হয়ে ওঠে, গরম হয়ে ওঠে। ছেলেকে আবার নিজের কোলে চেপে নিয়ে বসে। কথা বলতে পারে না।

তরঙ্গিণী আস্তে বলে—হঠাৎ কি মনে করে এলি?

—এমনি।

—এমনি নয়।

মৃগনয়নী বলে—একটা কথা বলতে এলাম।

—কি?

একটু চুপ করে থেকে ভেবে নেয় মৃগনয়নী। বলেই ফেলে—কেন এমন হোল তোর দিদি?

মৃগনয়নীর গলাটা একটু কেঁপেছিল, একটু রুদ্ধ হয়ে এসেছিল বলবার সময়।

তরঙ্গিণী ওর দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার স্বরে বলে—কিছু অন্যায় তো করিনি।

—এটা কি ভাল?

—খারাপ বলে তো একবারও মনে হয়নি আমার।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে।

তরঙ্গিণী একটু ভেবে বলে—ভাখ, একটা একটা কথা তোরা ভুলে যাস। আমি মেয়েমানুষ।

মনে মনে প্রশ্ন জাগে, আরও ত' মেয়েমানুষ আছে! মুখে কিছু বলে না মৃগনয়নী।

তরঙ্গিণী বলে,—মাঝে মাঝে মনে হয়। আমার রক্ত বড্ড লাল আর বড্ড গরম। অন্য মেয়েদের মত ফ্যাকাশে নয়।

মৃগনয়নী তাকায় দিদির দিকে।

একটা নিশ্বাস ফেলে তরঙ্গিণী,—আমি জানি, তোরা আমায় ঘেন্না করিস।

—না, না।—প্রতিবাদ করতে চায় মৃগনয়নী।

—থাম্। বাজে কথা বলিসনি। তোদের ঘেন্না আমায় গায়ে লাগে না। আমি নিজেকে নিজে ঘেন্না করিনি। আজও করি না।

মৃগনয়নী বিস্ময় বোধ করে। এ ধরনের কথা দিদির মুখে ও কখনও শোনেনি।

ও বলতে চায়, তোর জন্যে বড কষ্ট হয় দিদি। কিন্তু বলতে পারে না।

তরঙ্গিণীও কথা বলে না। খানিক পরে একটু হালকা হবার চেষ্টা করে মৃগনয়নী—কি খেলি আজ?

—কিচ্ছু না।

—উপোস?

—হ্যাঁ, প্রায় রোজই তো এমন হচ্ছে।

ভাল করে তাকায় ওর দিকে। দিদির শরীরটা অনেক শুকিয়ে গেছে।

তরঙ্গিণী বলে,—একটা কথা রাখবি?

—কি?

—বল রাখবি?

—রাখব।

এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে তরঙ্গিণী—একটু কাসুন্দি দিয়ে আম মেখে খাওয়াবি·

—কবে?

—এই ধর, কাল পরশু।

—খাওয়াব। কেন এখানে—?

—এখানে কাকে আর বলব। কেউ তো আসে না।

চোখদুটো এতক্ষণে চিকচিক করে তরঙ্গিণীর—কেউ আসে না। কেউ না।

টসটসে হয়ে ওঠে চোখদুটো। জলে ভরে যায়। একটু ভেবে বলে—যা· তোকে আবার কেউ যদি বকে।

—কেউ জানবে না।

—কাসুন্দি কোথা পাবি?

—আমার জন্যে চেয়ে নেব কর্তামার কাছে।

—তোকে দেবে না। ছেলে কোলে। ওর পেট কামড়াবে।

—তবে গয়লা বাড়ীর বৌয়ের কাছ থেকে আনাব।

—কাকে দিয়ে?

—হৃদয়দাকে দিয়ে।

—হৃদয়দা যদি বলে দেয় কাউকে?

—হৃদয়দা আমায় ভালবাসে। বলবে না।

তরঙ্গিণীর মুখটা আবার শুকিয়ে যায়,—আপন মনেই বলে,—আর আমার এখানে দা' নিয়ে পাহারা দেয়।

জানে মৃগনয়নী। কথা বলে না।

—এবার উঠি দিদি।

—আসিস কিন্তু কাল দুপুরে। একটু টক খাবার জন্যে প্রাণ যায়!

এমন অবস্থায় এমন হয়। টক খেতে কি ভাল যে লাগে! জানে মৃগনয়নী। ধীরে ধীরে ওঠে।

তরঙ্গিণী ওর হাত ধরে। এতক্ষণে ছোঁয় ওকে।

—এবার যাই দিদি!

হাতটা ছেড়ে দেয় তরঙ্গিণী। চোখদুটো স্তিমিত হয়ে আসে। তেমনি বসে থাকে। মৃগনয়নী ঘর থেকে বেরিয়ে চলে আসে।

পরদিন সকালে উঠে বাইরে বেরিয়ে দেখে সবাই সন্ত্রস্ত। ফিসফিস কানাকানি চারদিকে। ঘাটের দিকে যেতে হবে। কাপড় আনতে মায়ের ঘরের কাছে গিয়ে দেখে মায়ের ঘর তখনও বন্ধ। কি হোল? মা ওঠেনি।

—ও বৌঠান, মা ওঠেনি?

—উঠেছিল। আবার শুয়েছে।

—কি ব্যাপার বলত?

বৌঠান চারদিকে তাকিয়ে কানের কাছে মুখ এনে বলে,—জান না, বড ঠাকুরকন্যা কাশী চলে গেছে।

—কখন?

—আজ ভোর রাতে।

—আজই ভোরে!

বৌঠান ততক্ষণে চলে গেছে। পাদুটো অবশ লাগছে। একটু জোর নেই আর পাদুটোয়। ঘরে গিয়ে তবু একখানা গামছা নিয়ে ঘাটের দিকে এগোতে যায় মৃগনয়নী।

মনে হয় বাবার কথা। বাবা কি জেনেছে? কে জানে, বাবার কি অবস্থা আজ। আস্তে আস্তে বাইরের দিকেই মৃগনয়নী এগোয়। ভেতর বাড়ী পার হয়ে বাইরের ঘরের কাছে আসে মৃগনয়নী।

বাবা ঘরেই রয়েছেন। পিছন ফিরে বসে রসেছেন। জপে বসেছেন হয়ত। আস্তে আস্তে ভেতর ঢুকে একটু দেখতে যায় মৃগনয়নী।

—কে?

মৃগনয়নী চমকে ওঠে। রামতারণ মৃগনয়নীকে দেখে। আর কথা বলে না। আবার বসেন তেমনি। আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। কিছু বোধহয় খুঁজছেন আকাশে।

ভাল করে তাকায় মৃগনয়নী। জপের মালাটা নিয়ে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন। মালাটি রেখে আবার চুপ করে বসেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন।

মৃগনয়নী কাছে যায়। রামতারণ ফিরে তাকান। একটু হাসেন। তেমনি স্নিগ্ধ হাসি। কিন্তু কথা বলেন না। মৃগনয়নীও বলতে পারে না। ঘাটের দিকে চলে যায় আস্তে আস্তে হেঁটে।

আমগাছটা পেরোতে গিয়ে চোখে পড়ে কচি আমে ভরে গেছে গাছগুলো। চোখদুটো অকস্মাৎ ঝাপসা হয়ে আসে। আম দেখা যাচ্ছে না। কাসুন্দি কর্তামার কাছে। তাও ঝাপসা মনের ওপর। আম মাখা। খুব টক! কাসুন্দি দিয়ে মাখা! সব ঝাপসা হয়ে গেছে।

আর ভাবতে চাইছে না মৃগনয়নী। ঝাপসা চোখদুটো ডলতে ডলতে ভেতর বাড়ীতে চলে আসে। ঘাটে যাবে ও। দিদির সেই ঘরের পিছনে ঘাটে যাবে। কি করে যাবে? ও ঘরের সামনে দিয়ে কি করে যাবে?

দ্রুতপায়ে ঘরে আসে আবার। বিছানার ওপর শুয়ে পড়ে। উপুড় হয়ে। বালিশটা ভিজে উঠতে থাকে।

চোদ্দ

মাসের শেষে সমস্ত বাড়ীটা যেন অসহ্য হয়ে উঠছিল মৃগনয়নীর কাছে। একটুও ভাল লাগছিল না এই বাড়ীর কোন কিছু। এমনি সময়ে একদিন বিকেলে বনবিহারী এলো।

আর কিছুদিন এ ভাবে থাকলে মরে যেতে মৃগনয়নী। দিদির যাবার পর থেকে সমস্ত সংসারটার চেহারাই হয়ে উঠেছিল ফ্যাকাশে। জোলো। কথায় কারো জোর নেই। হাসিও ম্লান। এমন করে কি বাঁচা যায়। মাঝে মাঝে ইচ্ছে কোরে কাঁদাতে হোত খোকাকে। চিমটি কেটে। খোকার চীৎকারে তবু বোঝা যেত ও বেঁচে আছে। বেঁচে আছে আর সবাই। কখনও কখনও উঠে যেত ছেলে কোলে নিয়ে আয়না মহলের ওপর। গোলবারান্দার ছাতে। সেখানে চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগত। তাকিয়ে থাকত আকাশের দিগন্তে! সীমানার বটগাছের পাশ দিয়ে মানুষের সারি।

মনে হোত মানুষ আছে, আকাশ আছে, সবুজ আছে, পৃথিবী আছে। সন্ধ্যের সময় ফিরে আসত একা একা। এসে আবার সেই ঘরে। নির্বাক, নিরুপায়, একা। পুঁটিদির থাকা না-থাকা প্রায় সমান। ইদানীং আর কথাই বলত না বেশী।

যা-ও বা বলত আস্তে মরার মত মুখ নিয়ে। দিন দিন যেন রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছিল মৃগনয়নীর। এমনি সময়ে বনবিহারী এলো। সমস্ত বাড়ীটা একটু নড়েচড়ে উঠল যেন। কর্তামা বেরোলেন। বেরোলেন মা। খুড়োমশাই ভেতর বাড়ী এলেন খবর পেয়ে। হৃদয়দা তক্ষুনি ছুটল মাছের সন্ধানে। গয়লা বাড়ী খবর গেল। খুড়ীমা আবারে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। পুঁটিদি ছুটে গেল বৌঠানের কাছে। বৌঠান হেসে গড়াগড়ি। একটু স্পন্দন। একটু জীবনের আভাস। বনবিহারীর আসাটা যেমন আকস্মিক তেমনি আনন্দের। প্রণাম সেরে বনবিহারী চলে গেল বাইরের বাড়ীতে। পুরুষরা বাইরের বাড়ীতেই থাকে দিনের বেলা। রাত্রিতে ভেতরের বাড়ী। খুড়োমশাইয়ের কাছে কাছারীতেই বসে।

—কি কোচ্ছ আজকাল ?—খুড়োমশাই জিজ্ঞেস করেন।

—চাকরি করছি। পাটের অপিসে।—অফিসের নামটাও করতে হয়।

—তবে উপরিও কিছু আছে ?

—তা' আছে।

মৃগনয়নীর কাছ থেকে খবর পেয়েছিল কর্তাবাবু মারা গেছেন। তাই একটু বিমর্ষভাব দেখাতে হয়। কাছারীর পাশের ঘরটা ছেড়ে দেয় ওরা বনবিহারীকে। সেখানে কাপড়-জামা ছেড়ে বসতেই হৃদয় আসে জলখাবার নিয়ে, হাত ধোবার জল নিয়ে। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই আজও। তবু যেন মনে হয় জমজমাট ভাবটা কেটে গেছে।

দিনটা কাটে। মৃগনয়নীকে আর দেখতে পায় না বনবিহারী। দেখা হয় রাত্রে। শুতে আসে অনেক রাত্রে। ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর বসে। বাচ্চা ছেলেটা শুয়ে ঘুমোচ্ছে। বোঝে ওরই ছেলে। ঘুমন্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে মন্দ লাগে না বনবিহারীর। ওর নিজের সন্তান। নিজের বোধটুকুতে কেমন একটু আনন্দ আছে। গালটা ওর একটু টিপে দেয়।

মৃগনয়নীর মত শ্যামবর্ণ ছেলে। চোখের পাতাদুটি বেশ বড় বড়। বড্ড রোগা। বনবিহারীর মতই। বিছানায় বসে একটা বিড়ি ধরায় বনবিহারী। কিছুক্ষণ পরেই ঘরে আসে মৃগনয়নী। মুখটা নীচু করে। চুল বেঁধেছে মৃগনয়নী। বেশ আঁট করে।

বৌঠান বেঁধে দিয়েছে। চোখে একটু কাজলের ছোঁয়া। ঠোঁটে একটু পানের রঙের রাঙা ছোঁয়া, পায়ে টুকটুকে আলতা। লজ্জা করে মৃগনয়নীর। ছেলের মা এত সাজ কিসের! বৌঠান শোনেনি।

বনবিহারী বিড়িটা ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়ে। মৃগনয়নী দোর বন্ধ করে আস্তে আস্তে বিছানায় এসে ছেলের কাছে বসে।

—শুয়ে পড়ো।

শোয় না মৃগনয়নী। অগত্যা বনবিহারী উঠে বসে আর একটা বিড়ি ধরায়।

—চিঠির উত্তর দেবারও সময় ছিল না বুঝি?

—না।—অম্লান মুখে উত্তর দেয় বনবিহারী!

—কেন?

—কেন, গেলে বুঝবে। ভোরে বেরোই আর সন্ধ্যেয় ফিরি। কিযে খাটুনি ধারণা করতে পারবে না।

—রাত্তিরেও কি সময় নেই।

—রাত্তিরে চোখের পাতাদুটো ব্যথায় ভার হযে আসে। ভীষণ দুর্বল লাগে। তাই—।

—তাই কি?

—মানে বড্ড খাটুনি কিনা!

—তাই কি হয়েছে।

—তাই একজন বললে একটু করে ইয়ে খেলে বেশ জোর পাবে।

—কি খেলে?

—ওই তোমার গে মদ আর কি! মাঝে মাঝে একটু-আধটু খেতে হয়।

মৃগনয়নী গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। এই ভেবে একটু সান্ত্বনা পায় যে কথাটা না জিজ্ঞেস করতেই বলে ফেলেছে বনবিহারী। এমন সরল! তাই ত' এত ভয় এরে নিয়ে।

বনবিহারী ততক্ষণে বিড়িটা শেষ করেছে। একটা হাই তোলে। একবার বলে —উঃ! কি গরম!

মৃগনয়নীর দিক থেকে সাড়া আসে না।

বনবিহারী বলে,— কাল বাদে পরশু গেলেই সব দেখতে পাবে। তোমায় পরশু নিয়ে যাব।

—পরশু ? —মৃগনয়নীকে যে এত তাড়াতাড়ি যেতে হবে ও ভাবতে পারেনি।

—হ্যাঁ, পরশু। আমার মাত্র তিনদিন ছুটি। ছুটি বলে ত কিছু নেই! দুর্গা পুজোতেও বেরোতে হয়। একদিনও ছুটি নেই।

—কি এত কাজ শুনি ?

বনবিহারী বিজ্ঞের মত হাসে—সে তুমি বুঝবে না। কাজের পাহাড়। এক একবার স্যালভেজ পড়লে আমাদের দিনরাত জ্ঞান থাকে না। আসতে রাত বারটাও হয়।

—সালভেজ মানে ?

—সে আছে, বুঝবে না। পাটের গুদামে আগুন লেগে যায়। তাতে আমাদের দাম বেড়ে যায়।

মৃগনয়নী তাকায় বনবিহারীর দিকে। সত্যি বোধহয় খুব খাটতে হয়। একটু মায়া লাগে ওর জন্যে। তেমন খাওয়াও বোধহয় হয় না।

—দুপুরে কোথায় খাও ?

—আপিসের মেসে। ওখানে খাওয়া ভাল।

—রাত্তিরে ?

—রাত্তিরে বাড়ীতে। আজকাল অনেক দিন খাই না। নোতুন বৌঠান বড় ঝামেলা করছে। আবার চুপ থাকে মৃগনয়নী। ওর খাবার দিকটা নজর দিতে হবে। নইলে খাটবে কি করে ?

—ভাশুরঠাকুর কি একই আপিসে কাজ করে ?

—হ্যাঁ। দাদাও যেন দিন দিন বদলে যাচ্ছে। গেলেই সব দেখতে পাবে।

আবার হাই তোলে বনবিহারী। মৃগনয়নী বোঝে বনবিহারী একটু বিশ্রাম চায়। তারপরে শুয়ে পড়ে।

পরদিন বিকেলে খুড়োমশাইকে, রামতারণকে আর কর্তামাকে তিনজনকেই বলতে যে কাল মৃগনয়নীকে ও নিয়ে যেতে চায়। আপত্তি কারো পক্ষেই হয় না।

কর্তামা শুধু বলেন,—আর দুটো দিন জিরিয়ে গেলে পারতে।

— আমার ছুটি মাত্র তিনদিন।

কাজেই আর কেউ কিছু বলে না। খবর পেয়ে পুঁটির মুখটা শুকিয়ে যায়। এক গ্লাস জল খেয়ে বলে,—হ্যাঁরে, কাল নাকি চলে যাবি ?

-হ্যাঁ, কাল সকালে।

—কালই ?—একটা ঢোক গেলে পুঁটি। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

মৃগনয়নীরও মনটা ভার। যেটুকু আনন্দ হয়েছিল, সেটুকুও যেন উড়ে গেছে কোথায়। যাবার সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই মনটা টনটন করছে। টানে। এত দিনের এত মানুষের ভালবাসার টানে। শুধু কি মানুষ? প্রতিটি জিনিস এমনকি ঘরগুলো পর্যন্ত টানছে। প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাবার সময়ও এমন টান অনুভব করেনি মৃগনয়নী। তবু যেতে হবে। এদের ছেড়ে যেতে হবে। আজও যা দেখে গেল, এ সবও হয়ত দেখবে না আরও অনেক দিন পরে যদি আসে। কি থাকবে, আর কি থাকবে না, কে জানে।

—দিদির খবর জানাস ভাই পুঁটিদি।—গলা ধরে আসে মৃগনয়নীর।

পুঁটি হতাশ হয়ে বলে ফেলে,—একা একা কি করে থাকব?

মৃগনয়নী বলে,—তোর বরকে একটা চিঠি লেখ না?

পুঁটি শুধু বলে,—লিখেছিলাম।

মৃগনয়নীর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—কই এতদিন বলিসনি ত'!

—না। বলিনি। পুঁটির হাত পায়ের তালু ঘামে,—কাউকে বলিনি।

—কেন পুঁটিদি?

পুঁটিদির ঠাণ্ডা হাতখানা ধরে মৃগনয়নী।

—উত্তরও পেয়েছিলাম।

—কি লিখেছে?

পুঁটি মৃগনয়নীর দিকে একবার তাকিয়ে মুখটা নীচু করে ফেলে—ওখানে আর কোন দিন আমার যাবার দরকার নেই।

—কেন?

—ও আবার বিয়ে করেছে? খুব সুখে আছে।

মৃগনয়নী পুঁটিদির ঠাণ্ডা হাতখানা আরও জোরে চেপে ধরে।

পুঁটির পাণ্ডুর ঠোঁটদুটো কাঁপছে—সব দোষ আমার। ওর কোন দোষ নেই আমি ত ওকে সুখী করতে পারিনি।

—তবু—।—তবু যে কি সেটা আর বলতে পারে না মৃগনয়নী। যাবার আগে আর এক বেদনার বোঝা চাপিয়ে দিল পুঁটিদি।

আজ রাতটা কাটলে বাঁচে মৃগনয়নী। বাড়ীটা অভিশাপে ভরে গেছে। ও পালাতে চায়। এখুনি পালাতে চায় এ বাড়ী থেকে।

শেষপর্যন্ত বিষাক্ত বিতৃষ্ণা নিয়েই যেতে হোল। মনের আকর্ষণের স্রোত উলটে গেল পুঁটিদির কথায়। শুধু হতাশা, শুধু বেদনা। এ বাড়ীর আনাচে কানাচে শুধু দীর্ঘশ্বাস। নিশ্চিত মনে হয় ওর, বহু দীর্ঘশ্বাসে, অনেক চোখের জলে এ প্রাসাদের জন্ম। এর শেষ অনিবার্য। আর দেরি নেই। গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়বে এ প্রাসাদ। এ বংশের ভবিষ্যৎ সন্তানদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বহুকাল। অন্যায়ের পর অন্যায়ের জমাট পাষাণ অত সহজে ক্ষয়ে যাবে না। এ অবধারিত সত্যকে স্পষ্ট চোখের সামনে রেখে বিদায় নেয় মৃগনয়নী। এত কৃষ্ণ মেঘের ভেতরে একটি মাত্র স্নিগ্ধশীতল নক্ষত্রের আলো ওর মনকে করুণাধারায় স্নান করিয়ে দেয়—সে রামতারণ। ওর বাবা।

যাবার আগে বললে রামতারণ,—তোমার শান্তি হোক। সুখ আর শান্তি এক নয় মা। তুমি সুখের চেয়ে শান্তি পাবার চেষ্টা কোর। তা হলে ঠকতে আর হবে না।

—কেমন থাকেন জানাবেন বাবা।—মৃগনয়নী বাবার পা দুখানার ওপর মাথা রাখে।

—আমি ভালই থাকব। তুমি চিঠি দিও।—

মৃগনয়নী ওঠে। রামতারণ জপে বসেন আবার।

আর কোনদিকে তাকায় না মৃগনয়নী। পালকিতে গিয়ে ওঠে। পালকির দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে বন্ধ হয়ে যায় এখানকার সব কিছু। না জানি কতকালের মত কে জানে। দুলতে দুলতে ওঠে পালকি। দুলতে দুলতে চলে। মন দোলে। তরঙ্গের পর তরঙ্গে।

পুঁটিদির ম্লান মুখখানা। হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে বসে থাকা। আম কাসুন্দি খাবি? কেউ আসে না আমার কাছে। কেউ না।

পালকি দোলে। সব দোষই আমার। ওর কোন দোষ নেই। পুঁটিদির ঠাণ্ডা হাতের ঘাম স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

আবার তরঙ্গ। আমার জন্যে একটু জপ করবি রাম। কর্তাবাবুর আতঙ্কিত ভয়াবহ মুখ। কি ভয়াল দৃষ্টি! রামতারণ। বাবার মুখ। কি প্রশান্তি আর কি শান্তি! এইটুকুই আজীবনের পাথেয়।

মৃগনয়নী মুখের ঘাম মোছে। নড়ে বসে। শহর কলকাতা। শহর কলকাতার

মানুষ কেমন কে জানে! কেমন জায়গা? কেমন বাসা? কালোবৌ! কালো-বৌয়ের সামনে আর দুটো চোখ। ঈষায় ভ্রূকুটিতে চঞ্চল।

নতুন বৌয়ের চোখদুটো আসে কল্পনায়। নতুন বৌ কি বলবে ওকে? ও তাকে কি ভাবে গ্রহণ করবে। ভাল বলেই নেবে। সংসারে কোন মানুষই খারাপ নয়। না। কেউ খারাপ নয়। লাভ লোকসানের মাপ করতে গেলেই মানুষের বিকার আসে। সত্যি কি সে খারাপ?

মৃগনয়নী আর একবার নড়ে বসে। মাথাটা হেলিয়ে দেয় পালকির কাঠের সঙ্গে লাগিয়ে। কেমন ঘুম-ঘুম পায়। অনেক শান্তির পর গভীর আরামের ঘুম। ছেলেটা ঘুম থেকে জেগেছে। কোলে শুয়ে তাকাচ্ছে। কি মিষ্টি চাউনি! ছেলের দিকে চোখ রেখে ঘোর ভাবটা কেটে যায়। ছেলেকে বুকে নিয়ে মনাস্থির করে বসে। কলকাতার প্রতীক্ষায়।

পনরো

ঘুরে ফিরে এক জায়গাতেই আসা যায় না। জীবনটা বৃত্ত নয়, এ যেন একটানা স্রোত। কোথাও বা ঘূর্ণী, কোথাও বা তুফান। জীবনের ঘাটে ঘাটে দিনের পর দিন এগোতে হয়। এগোনই জীবনের লক্ষণ। এক হাটে বোঝা নাও, শূন্য করে দাও অন্য হাটে। আবার এগোয়। মৃগনয়নীর কাহিনী তাই ঘুরে ফিরে এক জায়গায় আসবে না। যে বোঝা নিয়ে ও আসছে কলকাতায়। তরঙ্গিণীর বেদনা, পুঁটিদির হতাশা, কর্তাবাবুর মৃত্যু। এ সব বোঝায় মন ভার। এ সব শূন্য করে দিয়ে নতুন বোঝায় মন ভরা। ঘাটে ঘাটে এই বেচাকেনা।

বারবার বলত মৃগনয়নী, কোথায় যে এর শেষ জানি না। মরলেও কি শেষ নয়? বাবা বলত, মরলেও শেষ নেই, আমি ঠিকই থেকে যাব। কথাটা সত্য। এটাও সত্য যে যেখানে এর শেষ, সেখানে আমিটা আর থাকে না। ছোট আমিটা মিশে যায় এক বিরাট আমিতে।

কথাটা বারবার জানতে হয়, মৃগনয়নীও জানল। তাই ত একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলেছিল,—কোথায় যে শেষ কে জানে? কি আছে পথের শেষে? এত বড় একটা জিজ্ঞাসাই করা যায় জীবনভোর। জীবনের পর জীবনে। উত্তরটাও যেখানে

গলে মেলে, সেখানে মৃগনয়নী কত জন্মে পৌঁছাবে জানিনে। কিন্তু এক ছিল কন্যা—তার নাম মৃগনয়নী। এই নামের জন্মে সে কোথায় গিয়ে কতটুকু পৌঁছোল, এর হদিশ পেয়েছিলাম আমি।

তাই এই কাহিনী।

অনন্ত কালের হিসেবে এক বিন্দুতম জীবন। তবু আলোর স্ফুলিঙ্গ আলোই। তার কিছু নয়। দিনরাতের হিসেবে মাত্র সামান্য কতকগুলো বছরের এক টুকরো চিত্তশুদ্ধি। তবু ভাব মহাভাবেরই অংশ। তাই মৃগনয়নীকে শ্রদ্ধা করি। ওর প্রতিটি মুহূর্তের ভাবকে শ্রদ্ধা করি। ভালবাসা নিয়েই বলছি তার কথা।

প্রথমে কলকাতার বিরাট প্রাসাদগুলোর ফাঁকে চার কোণা, তিনকোণা আকাশ ওর ভাল লাগেনি। মাঠে দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে অনেক বড় আকাশ দেখা অভ্যেস। এখানে চোখ যেন ধাক্কা খায় দেয়ালে দেয়ালে। স্টেশন থেকে বাসায় যাবার পথে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

শিয়ালদা থেকে এক ঘোড়ার গাড়ীর ওপরে মাল চাপিয়ে বসল ওরা ভেতরে। বনবিহারী ঘোড়ার গাড়ীতে বসে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মৃগনয়নীর দিকে তাকালো। একটু গর্বের দৃষ্টি। ভাবটা, ছাখ, আমার জন্যে জীবনে কলকাতাও দেখতে পেলে। ভাল করে দেখে নাও। দেখবে কি মৃগনয়নী? যেদিকে তাকায় দেয়াল। একি বন্দীশালা? টুকরো আকাশ। রাস্তায় মাটি চোখে পড়ে না। এ কেমন দেশ? মৃগনয়নী কিছুটা অবাক হয়ে দেখতে থাকে।

—এই যে রাস্তাটা দেখছ, এই রাস্তায় আমাদের অফিসে যেতে হয়।

সোজা একটা রাস্তা চোখে পড়ে মৃগনয়নীর।

—এ জায়গাটা মানিকতলা।

নামটি বেশ। মানিক তলা। সোজা রাস্তাটা চিক চিক করছে হোস পাইপের জলে। গাড়ী চলেছে অনেক। মোটর গাড়ী। নাম শুনেছিল মৃগনয়নী। এবার দেখল।

মৃগনয়নী বনবিহারীর দিকে তাকায়।

—অফিস নেই কাল?

—না। পরশু। কালকের দিনটাও ছুটি আছে।

—তবে যে বললে—।

—ওখানে থাকলে ত আর তোমাকে শহর দেখান যেত না?

বনবিহারী হাসে।

গাড়ী এসে গেছে শ্যামবাজারের কাছাকাছি।

—এই বাঁয়ে!—গাড়োয়ানের উদ্দেশ্যে হাঁকে বনবিহারী।

বাঁ হাতি একটা রাস্তায় ঘোরে গাড়ী।

খানিকটা এগোয় মন্থর গতিতে।

—রোখো।

গাড়ী থামে। নেমে পড়ে বনবিহারী। গাড়োয়ানের সাহায্যে মালপত্র নিয়ে একটা বাড়ীর ভেতর ঢোকে। একতলা একখানা বাড়ী গলির ভেতর। পাশের দোতলা বাড়ীটার তুলনায় বেশ পুরোনো। ইট বেরিয়ে গেছে স্থানে স্থানে। তবু বাড়ীটি ছোটর ওপরে বেশ ভালই লাগে মৃগনয়নীর। দোরের সামনে ছুটে এসেছে কালোবৌ। মৃগনয়নী পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যায়।

—দে ভাই। ছেলে আমার কোলে দে।

ছেলেটিকে কোলে নেয় কালোবৌ—সরলা। মৃগনয়নী তাকায় ওর দিকে। রোগা হয়েছে আরও। মিশমিশে কালো রঙটা একটু ফ্যাকাশে হয়েছে। চোখদুটো হয়েছে আরও সাদা। ছোট মুখখানিতে চোখদুটো একটু অস্বাভাবিক বড় দেখাচ্ছে।

—কেমন আছো দিদি! একটা চিঠিও ত দিতে পারতে?

—চিঠি!—কালোবৌ হাসে। হাসিটা যেন কান্নার চেয়েও করুণ। বলে,—চিঠি লিখতে কি জানি ভাই! আয় ভেতরে আয়।

ওকে নিয়ে ভেতরে ঢোকে সরলা।

সুন্দর ছোট একটু উঠোন। পরিষ্কার কিন্তু বড্ড ছোট। উঠোনের সামনেটা একটু দেয়ালঘেরা জায়গা।

—কলতলা। ওপাশে আবার একটা গঙ্গাজলের কলও আছে। সরলা দেখায়।

—মাত্র দুখানি ঘর। একটু ঘেরা বারান্দা।

বারান্দায় একখানা চৌকি পাতা। বড় দুটো থামের আড়াল থেকেও দেখা যায়।

—কে শোয় ওখানে?—জিজ্ঞেস করে মৃগনয়নী।

—বাড়ীর দাসী।

—আর এ ঘরে?

—তুই থাকবি।

—আর ওঘরে?

—ওঘরে দেখবি চ।

ঘরের সামনে এসে সরলা বলে,—অ, পদ্ম। দেখো কে এসেছে।

মৃগনয়নী লক্ষ্য করে পানের বাটার কাছে বসে আছে একটি বউ। এই কি তবে নতুন বৌ? বৌটি বেরিয়ে এলো। চাঁপা ফুলের মত গায়ের রঙ। মুখখানি ডিমের মত। চোখদুটো একটু ছোট, একটু ফুলো ফুলো। তাকাল একবার। হাসল না। হাসি বোধহয় এ মুখে মানায় না। মুখখানার ভাবটাই দেমাকে ভরা। মৃগনয়নী প্রণাম করে।

—থাক। থাক।

সরলা ছেলেটাকে আদর করতে করতে হাসতে হাসতে বলে,—এই পদ্মবালা। আমাদের নতুন বৌ। কথাটায় একটু জ্বালা ছিল।

পদ্মবালা বলে,—থাক, পরিচয় আপনিই হবে। এই বুঝি ছেলে?

—হ্যাঁ।

পদ্মবালা একবার তাকায়। তারপর ঘরের ভেতর চলে যায়।

—কথা একটু কম বলে, নইলে এমনি খুব ভাল। বললে সরলা।

খুব ভাল বলবার সময় ওর স্বরটা একটু কাঁপে। মৃগনয়নীর কানে সেটা ধরা পড়ে। কথাটা যেন নিজের মনেমনেই বলে আবার,—খুব ভাল। মনটা ওর খুব ভাল। নিজেকে নিজে বলছে যেন।

মৃগনয়নী উত্তর দেয় না ও কথার। বলে,—স্নান করব দিদি। জল কোথা দেখাবে চল।

সরলা ওর সঙ্গে পুবমুখো ঘরটায় আসে। ঘরের ভেতর জিনিসপত্র ছড়িয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে বসে আছে বনবিহারী। সরলাকে দেখে একটু নড়ে বসে। মৃগনয়নীও ঘরে ঢোকে। এই তার ঘর। তার বাসা।

ভালই লাগে ওর। তবে ঘরটা একটু যা অন্ধকার। পুবের দোর না খুলে সকালে কিছু দেখা যাবে না। দুদিক একেবারে চাপা। গলির দিকটায় একটি মাত্র জানালা। এ দেয়ালের সঙ্গে ও দেয়ালের সঙ্গে একটা দড়ি বাঁধা। তার ওপরে ঝোলান একখানা গামছা নামায় সরলা।

—এই নে গামছা। কাপড় বার কর।

বনবিহারী তোরঙ্গের চাবিটা পকেট থেকে বার করে দেয়। তোরঙ্গ খুলে শাড়ী বার করে নিয়ে মৃগনয়নী ঘর থেকে বেরোয়।

কলঘর দেখিয়ে দেয় সরলা। তারপর বলে,—তুই চান কর, রান্নাঘরে যাই।

কলঘরে ঢুকে হঠাৎ বলে মৃগনয়নী,—আচ্ছা, ও ঘরে নতুনবৌ, এ ঘরে আমি তুমি কোথায় শোবে তবে?

—কেন বারান্দায়।

—বারান্দায় ত বললে দাসী থাকে।

—আমি দাসী ছাড়া আর কি ভাই।—হাসে সরলা। এখারে হাসিটা এসে বড়ে বুকে এসে বেঁধে মৃগনয়নীর।

আর একটা কথাও বলে না।

সরলাও আর দাঁড়ায় না। ছেলে কোলে নিয়েই রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। গামছা বালতিতে চুবিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মৃগনয়নী। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভাবে কালোবৌয়ের কথা। এক একটা জীবনে দিনের পর দিন শুধু বেদনার বোঝাই বেড়ে চলে। মৃত্যু পর্যন্ত এর শেষ হয় না। কেন শেষ হয় না? কালোবৌ ত কোন দোষ করেনি। পুঁটিদি ত কোন দোষ করেনি। এদের মত মানুষ ত সংসারে বড একটা দেখা যায় না। তবে কেন এদের বেদনার শেষ নেই। ভগবানের এ কোন্ বিচার?—বাবা কাছে থাকলে জিজ্ঞেস করত মৃগনয়নী। ওর নিশ্চুপ নিথর মনের ওপর একটু আলোর রেখা ফোটে। মনে হয়, সত্যিই কি কালোবৌ আর পুঁটিদি ঠকছে। ওরা কি জীবনে ঠকবে?

মন সায় দেয় না। মনে হয়, জীবনে বোধহয় বেদনার প্রয়োজন আছে। সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠবার জন্যে। জীবনের ঠিক রূপটি দেখবার জন্যে দুঃখ-জ্বালার হয়ত বা দরকার। হয়ত এত বেদনায় ধুয়ে না গেলে কালোবৌ এত খাঁটি হয়ে উঠতে পারত না। সংসারে পনরো আনা মানুষের হিসাবে ঠকলেও জীবনের কোন একটা নিগূঢ় স্থানে ওরা জিতেছে। ওরা জিতবেই।

একটা নিশ্বাস ফেলে মৃগনয়নী। গামছাখানা ধুয়ে স্নান সেরে ঘরে চলে আসে। ঘরখানাও ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে। থাক। কাল হবে।

—তুমি স্নান করবে না?

বনবিহারীকে জিজ্ঞেস করে মৃগনয়নী।

—হ্যাঁ যাব।—বলে ওঠে বনবিহারী।

আবার বসে পড়ে। মৃগনয়নী কাপড় ছেড়ে নেয়।

—কি হোল বসে পড়লে যে ?

—ভাবছি।

—কি ভাবছ।

—ভাবছি দাদা এ মাস থেকে কত টাকা চাইবে।

—কেন। সব টাকা ভাশুর ঠাকুরকে দিতে না ?

—না।

—কি করতে ?

—নিজে কিছু খরচ করতুম।

মৃগনয়নী হেসে বলে,—সে ভাবনা এখন থাক। স্নান করে এসো।

বনবিহারী ওঠে। ভিজে গামছা নিয়ে বেরিয়ে যায়।

মৃগনয়নী বিছানাটা খুলে ফেলে। তোরঙ্গ বোঁচকা সব সরিয়ে রাখে এক দিকে। তোরঙ্গের ওপর বিছানা ভাঁজ করে করে রাখে। কয়েকখানা আটপৌরে শাড়ী বার করে। দড়ির ওপর রাখে। বনবিহারীর কাপড় জামা বার করে রাখে। বিছানার ভিতর থেকে কাঁথাগুলো বার করে ভাঁজ করে রাখে ওপরে। এটার ওপর ওটা, ওটার ওপর এটা, নানাভাবে সাজাতে থাকে। বেশ ভালই লাগে সাজাতে। তবু মনোমত হয় না। আজ থাক। এরপর একখানি মা কালীর পট। একখানি লক্ষ্মীর পটও আনতে হবে। দুখানা ছোট রেকাবি, দুটি গেলাস কিনতে হবে। পটের সামনে রোজ বাতাসা দিতে হবে দুখানা করে। নিদেন পক্ষে একটু গুড়। পরে হবে। ধীরে ধীরে হবে।

খোকার জন্যে একটি ছোট থালা চাই। ভাত খেতে শিখবে এর পর। ওর মুখে ভাত কি একটু ঘটা করে দেয়া যাবে ? কে জানে। টাকা কেমন পায়। তার ওপর নির্ভর করছে।

কত টাকা পায় এখনও জিজ্ঞেস করেনি মৃগনয়নী, টাকার অঙ্কটা জেনে নিতে হবে। ঘরটা বড্ড নোংরা লাগছে। ও ঘর থেকে ঝাঁটা গাছটি নিয়ে এলে হয়। নতুন বৌ নিশ্চয়ই বসে আছে এখনও। কি বলে ডাকবে ওকে ? নতুন দি ?

মৃগনয়নী ওদের ঘরে যায়। সামনেই দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা ঝাঁটাটি হাতে নেয়। নতুন বৌ, তাকায়,—কি নিচ্ছ ?

—ঝাঁটা। ঘরটা বড় নোংরা।

—তা হোক। একঘরের ঝাঁটা আর একঘরে নিতে নেই।

মৃগনয়নী ঝাঁটাটা রেখে দেয়। প্রথম সম্ভাষণেই নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে হয়।

নতুন বৌ এতক্ষণে একটু হাসে।—বিকেলে বাজার যাবার সময় বলে দোব, তোমার ঘরের ঝাঁটা আনতে।

কে বাজারে যাবে। কাকে বলবে, কিছুই জানে না মৃগনয়নী। আর একটা কথাও না বলে ওখান থেকে সোজা রান্নাঘরে চলে আসে। কালো বৌ ছেলেকে কোলের ওপর রেখেই ডালে জল ঢালছে।

—দাও, ওকে আমার কাছে দাও। ওকে নিয়ে রান্না করতে কষ্ট হচ্ছে তোমার।

সরলা তাকায়,—ওমা, কষ্ট আবার কি! বোস।

মৃগনয়নী বসে পড়ে বলে,—বসব আর কি! ঝাঁটা নিতে গিয়েছিলুম ও ঘরে। তা ঝাঁটা খেতে হোল।

—মানে?—সরলা তাকায়।

—বললেন, বিকেলে বাজার থেকে ঝাঁটা আনিয়ে দোব।

—তবে ত ভালই বলেছে।

মৃগনয়নী জিজ্ঞেস করে,—বাজারে কে যায়?

—তোর ভাশুর। টাকা নতুন বৌয়ের কাছেই থাকে।

—এর ভেতরই!

তা হোক। দোষ আর কি!—সরলা কথাটার অন্য মানে খুঁজতে চায় না। উড়িয়ে দিতে চায়।

—সব টাকাই ওর কাছে থাকে?

—সব। ঠাকুরপোর টাকাও।

মৃগনয়নী চুপ করে বসে বসে কি যেন ভাবে। কি যে ভাবে নিজেই ঠিক টের পায় না।

সরলা একগাল হেসে বলে,—তুই যেন রেগেছিস?

—না। রাগ আর কি!—মৃগনয়নী গম্ভীর হয়ে যায়।

—তোদের প্রথম আলাপের লক্ষণ ভাল নয়।

মৃগনয়নী নীরব।

—এ আমি জানতাম। তবু—।

—তবু কি?—মৃগনয়নী আস্তে জিজ্ঞেস করে।

সরলা তাকায় ওর দিকে। দৃষ্টি শান্ত বড়ই করুণ। বলে,—মিলেমিশে থাকতে পারলেই ভাল।

মৃগনয়নী বলে,—তা বটে। কিন্তু—।

সরলা তাকায়।

—কিন্তু আমি ত কিছুই বলিনি। উনি আমাকে ভাল চোখে দেখলেন বলে মনে হল না।

সরলা কথা পালটায়,—যাকগে ওকথা।

রান্নায় মন দেয় সরলা,—বলে,—ঠাকুরপোকে একটু চোখে-চোখে রাখবি।

—কেন বলো ত? তোমরা কি চোখে-চোখে রাখনি?

—ঠিক পারিনি ভাই। ইদানীং বড্ড বাড়িয়েছিল।

—কি?

—দেখতেই পাবি। মোটকথা সন্ধ্যের পর বাড়ী থেকে বেরোতে দিবি না।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে। কথাটা বোঝে।

বলে,—আমার কথা যদি না শোনে?

—তা শুনবে। তবে আর মেয়েমানুষ হয়েছিস কেন। একটা পুরুষকে বাঁধতে পারবি না?

মৃগনয়নী ফস করে বলে ফেলে,—তুমি ত পারলে না দিদি।

সরলার মুখখানা গম্ভীর হয়ে যায় মুহূর্তে। পরমুহূর্তেই ভাবটা কাটিয়ে বলে—আমার আর কি আছে বল? কি দিয়ে বাঁধতে পারতাম! না আছে রূপ, না আছে গুণ। তুই বাঁধবি ওকে কি দিয়ে?

বলে কোলের ছেলেকে দেখিয়ে দেয়।

মৃগনয়নী কথাটা হালকা করবার জন্যে হাসে—তবেই হয়েছে। বাঁধাবাঁধির ভেতর আমি নেই। যা ইচ্ছে করুক। বাইরের টান কি সহজে যাবে?

—টান না ছাই। যত ছাই পাঁশ গিলে আসবে। তোর ভাশুর ত মাঝে একদিন রাত্তিরে ওকে মারতে যায় আর কি! দু ভাইয়ে মারামারি হবার উপক্রম। অনেক কষ্টে থামাই। আমার হাতের ওপর একটা ছড়ির ঘা পড়েছিল। কব্জিটা ফুলে ছিল দুদিন।

হাসতে থাকে সরলা। মৃগনয়নী হাসে না। ঘটনাটা চিন্তা করে বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়ে। একবার জিজ্ঞেস করে!—ভাশুরঠাকুর কেন মারতে গিয়েছিলেন?

সরলা সস্নেহ স্বরে বলে—ওসব গিলে এলে ত জ্ঞান থাকে না। কি সব গালাগাল করছিল।

—কাকে।

সরলা বলবে কিনা একবার ভাবে। কি ভেবে বলেই ফেলে,—নতুন বৌকে।

মৃগনয়নীর কাছে ঘটনাটি আরও পরিষ্কার হয়। সরলা আবার রান্নায় মন দেয়। বনবিহারী হাজার দোষ করলেও নতুন বৌয়ের জন্যে কেউ তার স্বামীকে মারতে গেছে। কথাটা মোটেই ভাল লাগে না ওর। উঠে পড়ে মৃগনয়নী। ছেলে নিয়েই উঠে পড়ে, যাবার আগে সরলাকে বলে—দুধ আছে দিদি ?

—জ্বাল দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তোর ছেলের জন্যে। ওবেলা থেকে দুধ বেশী রাখতে হবে তোর ছেলের জন্যে। নতুন বৌ বলে দেবে'খন।

মৃগনয়নীর খুব খারাপ লাগে। গয়লাকে দুধের কথাও বলবে নতুন বৌ। সবেতেই নতুন বৌ। দুদিন মাত্র এসে এতটা জুড়ে বসেছে ভাবতেও বিশ্রী লাগে। মুখে কিছু বলে না। চলে আসে ওখান থেকে। নিজের ঘরে এসে খোকার একটা ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে ঘর পরিষ্কার করে। একটা শতরঞ্চি পেতে বসে ছেলেকে নিয়ে।

বনবিহারী স্নান সেরে এসে ছোট একটি আসন পেতে সন্ধ্যা করতে বসেছে। বোধহয় জপতপ করে একটু। তবে আবার রাত্তিরে কেন ওই সব গিলে আসে। মৃগনয়নী ওদিকে আর তাকায় না।

বনবিহারী সন্ধ্যে করে উঠে ওর দিকে তাকিয়ে বলে—এক গেলাস জল দাও ত! একটু মিছরিও দিও।

মৃগনয়নী ওঠে। রান্নাঘর থেকে জল আনতে হয়। তার ঘরে একটা কলসী কিনতে হবে।

—মিছরি ?—বনবিহারী জিজ্ঞেস করে।

—মিছরি কোথা পাব ?

—কেন নতুন বৌঠানের কাছে চাইলেই পাবে।

মৃগনয়নী বনবিহারীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে,—আমি চাইতে পারব না।

বনবিহারী একটু অবাক হয়—কেন, কি হোল ? আরে সবই ত ওর কাছে চাইতে হবে এর পর।

—কেন ? মৃগনয়নীর ভ্রূদুটো কুঁচকে ওঠে।

বনবিহারী মৃগনয়নীর চোখের দিকে তাকিয়ে একটু ঘাবড়ায়,—কেন আবার। মানে তার কাছেই সব ইয়ে—মানে ভাঁড়ার, টাকা পয়সা।

মৃগনয়নী কথা বলে না। জলের গ্লাস হাতে নিয়ে বনবিহারী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বোধহয় মিছরি চাইতে।

মৃগনয়নী ছেলের কাছে আড় হয়ে শুয়ে পড়ে। মনটা অকারণে তিক্ত হয়ে ওঠে। একটা গোপন অহঙ্কারে আঘাত পড়ে ওর। আজকে এই দুভায়ের চাকরি করবার মূলে ত মৃগনয়নীর আপ্রাণ চেষ্টা। মৃগনয়নী নিজের গয়না দিয়ে ওদের কলকাতায় পাঠিয়ে চাকরির চেষ্টা করতে বলেছে। আজ চাকরি হবার পর, রোজগারের পর এত সহজেই সব ভুলে গেলে চলবে কেন? কোথাকার কে একজন নতুন মেয়েমানুষ এসে এই রোজগারের টাকার ওপর কর্তৃত্ব করবে? আজ কলকাতার বাসা যে মৃগনয়নীর জন্য একথা তারা এত সহজে কেন ভুলে যাবে? চুপ করে পড়ে থাকে তেমনি ভাবে। কি করা যাবে। তার ভবিষ্যৎ দিনগুলোর আচরণের মোটামুটি একটা তার ঠিক করে নিতে হবে। নতুন বৌকে মেনে নিয়ে চলতে হয়ত হবেই। তবু কি ভাবে কতটা মেনে নেবে সেইটেই প্রশ্ন। তার ঘরেও কিছু কিছু জিনিস কিনে রাখতে হবে। সে জন্যে টাকাও চাইতে হবে বনবিহারীর কাছে। সব টাকা নতুন বৌয়ের হাতে তুলে দেয়া চলবে না। কিছুতেই চলবে না। বনবিহারী আবার এসে ঘরে ঢোকে।

—কিগো আজ দুপুরে বেরোবে নাকি? তবে তাড়াতাড়ি খাওয়া মিটিয়ে নাও।

মৃগনয়নী কথা বলে না।

—বেরোবে না আজ?

—না।—অস্ফুট কঠিন স্বরে বলে মৃগনয়নী।

—কি হোল তোমার? —কাছে বসে পড়ে বনবিহারী।

মৃগনয়নীর এমন কঠিন ভাব কখনও দেখেনি বনবিহারী। মৃগনয়নী নিজেও ভাবতে পারেনি কখনও যে ও এতটা কঠোর ভাব গ্রহণ করতে পারে কখনও।

কারণ অবশ্যই রয়েছে। যেখানে ঘা পড়লে মানুষ সইতে পারে না, সেখানেই ঘা পড়েছে ওর। মানুষ আর সব সইতে পারে, কিন্তু যেখানে তার গোপন অহঙ্কারের আত্মতৃপ্তি, সেখানে ঘা দিলে সইতে পারে না। আজ মৃগনয়নী এ সত্যটা দেখবার মত দৃষ্টিও হারিয়েছে। অতি সামান্য অহঙ্কারও মানুষকে কত অন্ধ করে তোলে।

বনবিহারী ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কিছু।—কি ব্যাপার বলো ত?

—কিছু না।—ছোট্ট জবাব দেয় মৃগনয়নী।

বনবিহারী আর কথা বাড়ায় না। বরং একটু হেসে বলে,—আজ দুপুরে না হয় ঘরটা গুছিয়ে ফেলো।

—কি গোছাব শুনি?—মৃগনয়নীর গলায় একটু ঝাঁজ বোঝা যায়।

—কেন, জিনিসপত্তর।

—কি আছে যে গোছাব?

বনবিহারী তবু ঠিক কথার ভাবটা ধরতে পারে না। একটু বিরক্ত হয়ে বলে,—বাপের বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে তা থাকলেই পারতে সেখানে।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে।

—কোন দরকার ছিল না আসবার। সেটা স্পষ্ট করে বললেই হোত।

মৃগনয়নী তাকায় বনবিহারীর দিকে। বলে,—সেইটেই বোধহয় ভাল হোত।

হঠাৎ একটু রেগে যায় বনবিহারী। এটা ওর স্বভাবই—চললুম অফিসে। ঘরে থেকে ঘ্যান ঘ্যান করা পোষাবে না।

মৃগনয়নী চুপ করেই থাকে। বনবিহারী সত্যিই জামাটা গায় দেয়। প্রথমে উলটো করে গায়ে দেয়। তারপর ধুত্তোর—বলে আবার সোজা করে গায়ে দিয়ে বাইরে এসে জুতো পরে।

তবুও মৃগনয়নী কিছু বলে না। একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকে বনবিহারী ঘরের বাইরে মৃগনয়নীর ডাকের আশায়। মৃগনয়নী তেমনি নীরব। বনবিহারীর রাগটা আরও বাড়ে। ও সত্যিই বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে। অফিসের দিকেই যায়।

ষোলো

মনের ওপর প্রথম যে ছাপটি পড়ে, সেটি সহজে মুছে যেতে চায় না। প্রথম দিনেই কলকাতার বাসার যে ছবিটি দেখতে পেলো মৃগনয়নী, তাকে ভুলে যাওয়া ওর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হোল না। চেষ্টা যে ও করেনি তা নয়।

ও আরও শুনেছে যে ভাশুর বলেছেন,—বৌমার যা দরকার, সব যেন দেওয়া হয়।

ও আরও শুনেছে যে কথাটা শুনে নতুন বৌ হেসেছে।

ভাশুর বলেছে,—তা নয়। ও আমাদের ঘরের লক্ষ্মী।

কথাটায় আরও জ্বলেছে নতুন বৌ। মুখে কি বলেছে, সেটা আর শুনতে পায় নি।

ও অনেক ভেবে ঠিক করেছে কিছু বলবে না। কিছু চাইবে না। যা দেবে, তাতেই যা হয় হবে। না হয় হবে না। খোকার বার্লিটুকু পর্যন্তও নিজের কাছে রাখবে না। প্রয়োজন হলে কালোবৌকে বলবে। তাতে যা হয় হবে।

এতে করে অসুবিধে যে মৃগনয়নীর হোল তা নয়। ওর হয়ে কালোবৌ নতুন বৌয়ের কাছ থেকে সব চেয়ে নিয়ে আসে। এমন কি সুপুরিটি পর্যন্ত। বনবিহারীকেও কিছু বলল না মৃগনয়নী। বনবিহারী কিছু শুনতেও চাইল না। কাজ সেরে এসে ছেলেকে নিয়েই সময় কাটাত বেশী। খাওয়া সেরে শুয়ে পড়তে তারপর। আবার বেরোতে হোত ভোরে।

মাসখানেক চুপ করেই কাটল। মাইনে পেয়ে বনবিহারী যখন টাকা দিতে গেল দাদাকে, তখন একটা কথা তাকে শুনতে হোল,—উপরি টাকাটাও সব দিতে হবে, নইলে চালান যাবে না বোধহয়।

উপরি যে বনবিহারী কিছু পেত না তা নয়। সেটা আগে আগে সব দিত না। কিছু টাকা নিজের কাছে রাখত। সেই টাকাতেই এক আধদিন মদ খেয়ে বাড়ী ফিরত। এখন কিছুদিন মদ আর খায় না বনবিহারী। তাই কি দাদা বললে একথা?

মৃগনয়নী শুনে গম্ভীর হোল। মৃগনয়নীর কাছ থেকেই শুনল বনবিহারী এটা নতুন বৌয়ের শেখান কথা। শেখান কথাই দাদা বললে। তবে হয়ত সত্যিই নতুন বৌ সংসার চালিয়ে উঠতে পারছে না?

বনবিহারী একটু চিন্তিত হোল। কিন্তু মৃগনয়নী হাসল, বললে—এটা আমি বুঝেছিলাম আগেই।

বনবিহারী আর বেশী কথা বলল না। কথাটা এখানেই চাপা পড়ে রইল।

মাস দুয়েক আরও কাটল। মৃগনয়নী কিছুই চায় না। কালোবৌ ওর হয়ে সব চায়। নতুন বৌয়ের সঙ্গে কথা বলতেও বেশী চায় না মৃগনয়নী। নেহাতই যেকথা না বললে নয়, তাই বলে। নতুন বৌও বেশী কথা পছন্দ করে না। কারো সঙ্গেই না। মেপে কথা বলে। মেপে হাসে। ওইটেই বোধহয় ওর ব্যক্তিত্ব।

মাসকাবারের দিকে একদিন একটা ব্যাপার গুরুতর হয়ে উঠল। মৃগনয়নীর সুতো ফুরিয়ে গিয়েছে। একখানা কাঁথা সেলাই করতে পারছিল না। শাড়ীর পাড় থেকে সুতো খুলছিল। সরলা সেই সময়ই ঠিক ঘরে এসেছে।

—কিলো, ওকি করছিস।

—কাঁথাটা সেলাই করতে হবে।

—সুতো নেই?

মাথা নাড়ল মৃগনয়নী। কথাটা সেদিনই বিকেলে নতুন বৌকে বললে সরলা।

—ওর সেলাইয়ের সুতো নেই।

নতুনবৌ কে জানে কেন হঠাৎ চটে উঠল,—সুতে নেই তা আমায় বলতে পারে ন॰॰

সরলা কথাটা ঘোরায়। হেসে বলে,—বলতে বোধহয় লজ্জা পায়।

নতুন বৌয়ের মুখখানা টুকটুকে রাঙা হয়ে ওঠে।

—ও সব চালাকি। তার গরবে লাগে আমার কাছে চাইতে। এই বলে রাখছি তোমায় সে আমার কাছে নিজে এসে না চাইলে কিচ্ছু পাবে না।

—রাগ কচ্ছিস কেন?—থামাতে চায় সরলা।

—রাগ নয়। এই সোজা কথা বলে রাখলুম। তাকে বলে দিও।

ঘরের ভেতর চলে যায় নতুন বৌ। সরলার মুখটা ম্লান হয়ে যায। নতুন বৌ অত্যন্ত জেদী জানে ও। ভয় হয মৃগনয়নী একথা শুনলে কি ভাববে। কি আর ভাববে, কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললেই চলবে ওকে।

মৃগনয়নী তখনও সেলাই করছিল। পাড়ের সুতো খুলেই সেলাই করছে। সরলা এসে চুপ করে বসে।

—সেলাই করছিস?

মৃগনয়নী কথা না বলে ওর দিকে তাকায়।

—সুতোর কথা বলেছিলুম নতুন বৌকে।

—আমি ত বলতে বলিনি তোমায়।

—জানি।—হাসে সরলা—তবু আমি ত' দেখে চুপ করে থাকতে পারিনে।—তা নতুন বৌ আজ বড দুঃখু করলে।

—কেন, তার আবার দুঃখু কিসের?

—মুখখানা চুন করে বলছিল, ন'বৌ আমার কাছে কিছু চায় না। আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না।

—তাই নাকি!—একটু অবাক হয়ে তাকায় মৃগনয়নী।

—হ্যাঁ। সে কত কথা! ন'বৌয়ের কাছে আমি কি অপরাধ করেছি।

মৃগনয়নী হাসে।

সরলা আবার নিজে নিজেই বলে,—তা বাপু, তুই-ই না হয় চাইলে পারিস। দরকার চাইলে ত আর না দিয়ে পারবে না! আর দেবে না-ই বা কেন, ঠাকুরপো রোজগার ত আর কম করছে না!

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে।

—চাইলে তোর ক্ষেতি নেই কিছু।

মৃগনয়নী প্রথম দিনের ঝাঁটার কথাটা ভুলতে পারেনি এখনও। গম্ভীর মুখে বলে, —না দিদি। ওর কাছে কিছু চাইতে পারব না।

—কেন দোষটা কি। তোর চেয়ে সম্পর্কে বড় ত বটে!

—তা হোক।

—এ কিন্তু তোর অন্যায় জিদ।

—তা হযত হবে।

—কিন্তু একদিন না একদিন ত চাইতেই হবে।

—সে কথা কিছু হলপ করে বলা যায় না।

সরলার মুখখানা এবারে যেন বেশী ম্লান হয়—আমার একটা কথা না হয় রাখ।

—এ অনুরোধ তুমি কোর না দিদি।

মৃগনয়নীরও জেদ বেড়ে যায়। ওকে কিছুতেই রাজী করাতে পারে না সরলা। বড় বিপদে পড়ে যায় ও। নতুন বৌয়ের জেদের সঙ্গে মৃগনয়নীর জেদের ভাবী সংঘর্ষটা ভেবে ও আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। কি করবে কিছু ভেবে পায় না। মুখটা চুন করে চলে যায়।

পরদিন সকালে ছেলের জলখাবার আসে না। দুপুরে ছেলের ডিম আসে না। বিকেলেও যখন ছেলের দুধবার্লি ঘরে কেউ দিয়ে যায় না, তখন মৃগনয়নী সরলার কাছে যায় বারান্দায়।

সরলা আজ ওর ঘরে একবারও আসেনি। বার বার নতুন বৌয়ের কাছে বার্লি চেয়েছে, ধমক খেয়ে চুপ করে এসে বসে আছে বারান্দায় নিজের চৌকির ওপর।

মৃগনয়নী সরলাকে এসে বলে,—ছেলের বার্লি ত দিলে না দিদি?

সরলা চুপ করে থাকে।

—আজ কি বার্লি দেবে না?

সরলা তাকায়। চোখে ওর স্পষ্ট অসহায় ভাবটা মৃগনয়নীর চোখ এড়ায় না। ও কিছু বলবার আগেই নতুন বৌ বেরিয়ে আসে।

—ওকে বলছ কেন? বালির দরকার, চেয়ে নিয়ে জ্বাল দিয়ে নিলেই পারতে?

সরলা ওখান থেকে উঠে রান্নাঘরে চলে যায়।

—না চাইলে কিছু পাওয়া যাবে না?

—না।—পরিষ্কার ছোট্ট জবাব নতুন বৌয়ের মুখে।

মৃগনয়নী কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ঘরে চলে যায়।

বনবিহারী দাদার সঙ্গে অফিস থেকে ফেরে। যথারীতি নতুন বৌ স্বামীর কাছে সব বলে। বনবিহারীর কাছে বলে মৃগনয়নী।

দাদা শুনে নতুন বৌকে বলে—হুঁ! বৌমার ব্যাভারটা কিছুদিন ধরে ভাল লাগছে না।

বনবিহারী বদরাগী। শুনেই লাল হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে,—নতুন বৌঠান!

নতুন বৌ বেরোয় না।

বনবিহারী বাইরে থেকেই বলে,—কি সব আরম্ভ হয়েছে! ছেলেটাও কি এ বাড়ীতে খেতে পাবে না?

নতুন বৌ এতক্ষণে বেরোয়। পাতাকেটে সুন্দর করে খোঁপা বেঁধে গা ধুয়ে খয়েরি ডুরে শাড়ী একখানি পরেছে নতুনবৌ। মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে মানসিক উত্তেজনায়। বলে চাপা কঠিন স্বরে,—চেয়ে নিলেই খেতে পেতো।

—চাইলেই পেতো!—বনবিহারী ওর স্বর নকল করে বলে। তারপর বেশ চেঁচিয়ে বলে,—চাইতে হবে কেন? টাকা কি তোমার বাবার বাড়ী থেকে এসেছে যে হাত পেতে চেয়ে নিতে হবে?

নতুন বৌ চেঁচায় না। তেমনি চাপা স্বরে বলে,—আপনার ছোটলোকের মত কথার উত্তর দিতেও ঘৃণা বোধ হচ্ছে।

—কি আমি ছোটলোক!—সরল বনবিহারী ফেটে পড়ে,—ছোটলোকের ভাতই ত দুবেলা খাচ্ছ!

—আপনার ভাত খাচ্ছি না।

—আলবত খাচ্ছ! যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা! জানো কালই তোমায় দূর করে দিতে পারি।

—কে কাকে দূর করতে পারে সেটা দেখা যাবে পরে।

বনবিহারী আরও চীৎকার করে—তোমার দাঁত কটা ভেঙে দেয়া উচিত।

দাদা বেরোয় এবার,—কি যা তা বলছিস তুই। ওর দাঁত ভাঙলে তোর দাঁত ভাঙবার লোকও এখানে আছে জানবি।

বনবিহারী আরও ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে,—বৌয়ের হয়ে ঝগড়া করতে এসেছো। লজ্জা করে না। এসো দাঁত ভাঙবে এসো।—হাত গুটিয়ে রোগা বনবিহারী হাঁপতে হাঁপতে এগোয়।

—তুই আমায় মারবি?—দাদাও এগিয়ে আসে। ব্যাপারটা চরমে ওঠবার আগেই ওধার থেকে কালোবৌ বড ভাইকে ধরে। বনবিহারীর হাত ধরে টানতে থাকে মৃগনয়নী।

—না ছেড়ে দাও। আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।—লাফাতে থাকে বনবিহারী। মৃগনয়নী জোর করে ধরে রাখে ওকে। মৃগনয়নীর সামর্থ্যের কাছে পেরে ওঠে না বনবিহারী।

—বেরো বাড়ী থেকে। আজই বেরো।

বনবিহারী বলে,—বাড়ী কি তোমার?

—হ্যাঁ। এক্ষুনি চলে যা তোর বৌ নিয়ে।—বড ভাই চীৎকার করে।

—তুমি বেরোও। তোমার ওই রূপসী বৌ নিয়ে বেরোও।

বড ভাই এগিয়ে আসে জোর করে। সরলা ধরে রাখতে পারে না। এসেই বনবিহারীর গালে একটা চড বসিয়ে দেয়। বনবিহারী এগোতে গিয়েও মৃগনয়নীর হাত ছাড়াতে পারে না।

ও চেঁচায়,—গয়নার টাকা ফ্যালো। গয়না বিক্রি করে চাকরি জুটেছে, গয়নার টাকা দাও তবে চলে যাব।

—এক পয়সা দোব না। যা পারিস করে নিস। বলতে বলতে বড় ভাই এবার ঘরের ভেতর যায়। চৌকীর ওপর বসে পাখা নিয়ে বাতাস করে নিজেকে। সরলা পাখাটা কেড়ে নিয়ে ওকে বাতাস করে আর আশ্চর্য হয়ে দেখে নতুন বৌ শান্ত মুখে পানের বাটার সামনে বসে পান গালে দিয়ে একটু সুগন্ধি জর্দা গালে ফেলে। একবার আড় চোখে তাকায় শুধু ঘর্মাক্ত স্বামীর দিকে আর সতীনের দিকে। কি অদ্ভুত কঠিন পাষাণের মত চাউনি। বাতাস করতে করতে অবাক হয়ে দেখে সরলা। যেন এক নিষ্ঠুর মজার খেলা দেখছে কোন পাকা খেলোয়াড। নিদারুণ সর্বনেশে উত্তেজনাকে হজম করে বেশ এক আরাম পাচ্ছে বলে মনে হয়। চোখদুটোয় সুতীক্ষ্ণ তীরের ফলার মত একটা ঝিলিক দেখা যায় শুধু।

মৃগনয়নী বনবিহারীকে ঘরে নিয়ে আসে। ঘরে এসে বনবিহারী শুয়ে পড়ে। বলে শুধু,—মাথাটা কেমন করছে। বলতে বলতে গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে অজ্ঞান। হাত পা ছুঁড়তে থাকে।

দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে ওকে জোর করে চেপে ধরে মৃগনয়নী নিজের বুকে। নরম বুকে বনবিহারীর পাঁজড়ার হাড়গুলোয় বড় ব্যথা লাগে। বনবিহারী বেঁকে যায় ধনুকের মত। মৃগনয়নীর শক্তসমর্থ শরীর। ওর সর্বাঙ্গের চাপে বনবিহারী বেশী আছড়াতে পারে না। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে হাত পা ছোঁড়া কমে আসে। হিস্টিরিয়ার বেগটাও অনেক নরম পড়ে।

আস্তে আস্তে নিজেকে আলগা করে নেয় মৃগনয়নী। সবশরীর ওর ঘেমে গেছে। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে বনবিহারীকে ছেড়ে দিয়ে এক গ্লাস জল ভরে। নিজে খেয়ে নেয় সবটা জল। তারপর আর এক গ্লাস জল ভরে বনবিহারীর মাথায় চোখে ছিটিয়ে ভিজিয়ে দেয়। ওর জামাটা ছাড়িয়ে দেয় আস্তে আস্তে। চাপা দাঁতের ভেতর জোর করে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে হাঁ করিয়ে জল খাওয়ায়।

ওর নিজের মাথাটার ভেতরও কেমন ঝিমঝিম করে। তবু ভেঙে পড়লে চলবে না। মনের সবটুকু জোরকে এক করে নিয়ে স্থির হয়ে থাকে ও। ছেলেটা উঠে বসেছে ঘুম ভেঙে। উট্‌কো। ভাল লাগছে না মৃগনয়নীর। বনবিহারী কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকায়।

বনবিহারীর কাছে গিয়ে ও ওর গালের ওপর আঙুল বুলিয়ে বলে—খুব লেগেছে বোধহয়?

বড় ভাই চড়টা মেরেছিল খুবই জোরে। বনবিহারী ঘাড় নাড়ে শুধু। ওর চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। সরল মূর্খ বনবিহারী রাগ করতে পারে, রাগ করবার পর কাঁদতে পারে।

পাঁচ বছরের শিশুর মত ওর মুখখানা কোলের ওপর টেনে নেয় মৃগনয়নী। বলে,—পুরুষ মানুষ আবার কাঁদে নাকি!

বনবিহারীর কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ। কথা বলতে পারে না। ও যে মার খাবে এ কথা স্বপ্নেও ভাবেনি।

মৃগনয়নী আস্তে আস্তে বলে,—আমি ত রয়েছি। তোমার কোন ভাবনা নেই। আজ থেকেই আলাদা থাকব আমরা। তুমি যে কটা টাকা পাও তাতেই আমি চালাতে পারব। কিচ্ছু ভেবো না।

বনবিহারী শুধু বলে,—একটা পয়সাও যে নেই।

মৃগনয়নী বলে,—আমার কাছে আছে কয়েকটা টাকা। অনেকদিনের—বিয়ের সময়কার টাকা। ওইতেই কটা দিন চলবে।

—আমি যে মাত্র পঁচিশটাকা পাই। দাদা অনেক বেশি পায়।

—পচিশ টাকায় খুব চলবে।

—অবিশ্যি উপরি আছে। উপরিও দাদা বেশি পায়। বাইরে যায় কিনা! আমি কোন কোন মাসে কিছুই পাই না।

—তা হোক। ঠিক চলে যাবে। এখন উঠতে পারবে?

ধীরে ধীরে ওঠে বনবিহারী।

মৃগনয়নী গামছা এগিয়ে দেয়,—যাও। ভাল করে স্নান করে নাও। শরীরটা ঠাণ্ডা হবে। তারপর দোকানে গিয়ে কিছু খাবার নিয়ে এসো। ছেলেটাও কিছু খায়নি।

আবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ছেলেটা। বনবিহারী ওঠে। স্নান করতে যায়। স্নান সেরে এসে মা কালীর ছোট পটখানার সামনে গিয়ে একটু জপ করে। গায়ত্রী। তারপর পটের দিকে তাকিয়ে—মা মা—বলে ওঠে অস্ফুটে। মায়ের ওপর ওর ভারি টান।

মৃগনয়নীর বেশ ভাল লাগছে। খুব ভাল লাগছে। এতদিনে যেন মনের ওপর থেকে একটা কঠিন বাঁধন খুলে গেল। কি একটা যেন ওর মনটা বেঁধে সঙ্কুচিত করে রেখেছিল এতদিন। আজ সব আলগা। মন খোলা, প্রাণ খোলা। একটা বাঞ্ছিত আরামের স্বাদ একটু একটু করে অনুভব করছে মৃগনয়নী।

তোরঙ্গের কাছে গিয়ে তোরঙ্গ খোলে। একেবারে তলায় একটুকরো ন্যাকড়ায় বাঁধা সাতটা টাকা বার করে। তার থেকে একটা টাকা বনবিহারীর হাতে দেয়।

—খাবার নিয়ে এসো।

বনবিহারী টাকা পেয়ে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। জামাটা গায়ে দিয়ে বেরোয়।

মৃগনয়নী দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে আবার চুপ করে বসে থাকে। মাস কয়েকের ভেতরই যে এমন খোলাখুলিভাবে মনের রূপগুলো প্রকাশ পাবে, এমন আশা মৃগনয়নী করেনি। ভালই হয়েছে। যে কোনও খারাপ অবস্থাকেই সে ভয় করবে না। ভয় করলে তার এইটুকু জীবনে এতটুকুও সে এগোতে পারত না।

মাসখানেকের ভেতর বাসা দেখতেই হবে একটা। বনবিহারী পারবে না। ভোরে বেরোয়. রাতে ফেরে। তাকেই খুঁজতে হবে।

মাস কয়েকের ভেতর আশে পাশে দু-চারজন মহিলার সঙ্গে বেশ আলাপ হয়েছে ওর। বিশেষ ওই ডাক্তারের বৌ বীণার সঙ্গে। বীণার কাছেই খোঁজ নিতে হবে ঘর খালি আছে কিনা কোথাও! সেধে বলতে হবে একে ওকে তাকে। কাল দুপুরেই ও যাবে বীণার বাড়ী। ওদের পাশে ভবানীর মায়ের বাড়ী।

—ঠাকুরপো কই লো?

মৃগনয়নী তাকায়। কালোবৌ ঘরে এসেছে।

—কেন দিদি?

—খেতে যাবে না?

—না ভাই দিদি। ও খাবার আনতে গেছে দোকানে।

কালোবৌয়ের মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে,—খাবার? কেন?

—বারে! খেতে হবে না রাত্তিরে?—যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে একটু হাসে মৃগনয়নী।

কালোবৌ দোরের দু পাশের চৌকাঠ ধরে একটু সময় দাঁড়ায়। তারপর আর একটা কথাও বলে না। আস্তে আস্তে চলে যায়।

মৃগনয়নীর মনটা একটু ভিজে ভিজে লাগে। কালোবৌয়ের জন্যে ওর মনের কোথায় একটু দুর্বল জায়গা আছে। সেইখানটা ভিজে উঠেছে।

কারুর ওপর দাবী নেই। না স্বামীর ওপর, না দেওরের উপর, না জায়ের ওপর, না সতীনের ওপর। সকলের কাছ থেকেই কিছু না কিছু আঘাত সয়ে যাওয়া। অভিমান কাকে বলে জীবনে জানা গেল না, আর ভালবাসা? কারই বা পাওয়া গেল! কালোবৌয়ের অন্তর তবু কেন যে কালো হয়ে ওঠে না—এইটেই সংসারের এক বিস্ময়।

কিছু পেতে না পেতে পাবার যে কিছু একটু অধিকার আছে এ কথাও বোধহয় ভুলে যেতে হয়। সবাইকে মানুষ বলে না ভাবলে নিজে যে মানুষ এ কথাও বোধহয় ভুল হয়ে যায়।

কালোবৌ ধীরে ধীরে গিয়ে নিজের তক্তপোশে শুয়ে পড়ে।

মৃগনয়নী চুপ করে বসে আছে। তখনও ফেরেনি বনবিহারী। গেছে তা অনেকক্ষণ! এত দেরি হয় খাবার আনতে। রাস্তায় গিয়ে আবার ভিরমি খেয়ে পড়েনি ত'?

কেমন একটা দুশ্চিন্তা এসে ওর মনকে গ্রাস করে। স্বামীর জন্যে এই প্রথম

দুশ্চিন্তা। ভাবতে বেশ ভাল লাগে। ভাল লাগে উৎকণ্ঠিত হতে। সে যে ভাবছে এটা দেখাতেও ভাল লাগে।

ছেলে কোলে করে ঘর থেকে বেরোয় মৃগনয়নী। দোরের কাছে গিয়ে বসে থাকে গলির মোড়ের দিকে। অন্ধকার গলিটার মোড়ে গ্যাসের আলো এসে পড়েছে। গলির এদিকটা অন্ধকার। আরও অন্ধকার গলির শেষের দিকটা। ওদিকটা একটা পাঁচিলের ওপারে মাঠ, তার দুধারে খোলার বস্তি। সেখানে তীব্র পানীয় আর ঝাল মাংসের ভুরভুরে গন্ধ। সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে গোলমাল। ঝকঝকে ছোরার ঝিলিক দেখা যায়। খোকা-গুণ্ডার নামে ও পাড়ার রূপপসারিণীরাও চমকে ওঠে।

বসে আছে মৃগনয়নী। ঠায় বসে আছে দোরের সামনে।

নতুন বৌ শুয়ে পড়েছে ঘরে। তার পাশে বসে হাওয়া খাচ্ছে বড় ভাই।

—এমন এক একটা কাণ্ড করো! কি যে যা তা বলে ফেললাম ওদের!

নতুন বৌ বলে—আমি আর কি করলুম?

—তোমার জন্যেই ত!

—বেশ ত আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে ওদের নিয়েই থাকো।

অতি পুরাতন কথা। তবু এতেই বড় ভাই একটু ঘায়েল হয়।

—সে কথা হচ্ছে না। বৌমার সামনে এমন কাণ্ডটা না হলেই ভাল হত।

—না করে কি কোন উপায় ছিল?

—কেন?

—এত বড় সংসার চালাতে পারতে?

—তা পারা যেত।

—ঠাকুরপো ক' টাকা দেয় শুনি?

—যাই দিক। আমার রোজগার ত অনেক বেশি!

—তোমার রোজগারে ওদের খাওয়ালে, আমার আর দিদির ভবিষ্যতে কি হবে?

—মানে—কি বলছ—?

—বলছি ঠিক। ঠাকুরপোর ছেলে আছে। আমাদের কি আছে?

এমন একটা দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়েছে নতুন বৌ বড় ভাই একেবারে ধরাশায়ী।

—বলো?

—তাই বলে—।

—হ্যাঁ, আমাদের প্রাপ্য আমরা ছাড়ব না। সামনের মাস থেকে অন্ততঃ পাঁচ ভরি করে গয়না করতেই হবে। আমার কাছে পষ্ট কথা।

চুপ করে থাকে বড ভাই। মোটাসোটা মানুষটা যেন কেঁচোর মত দুর্বল হয়ে পড়ে। একটা কথারও আর জবাব দিতে পারে না।

নতুন বৌ আর বেশি বলে না। যেটুকু বলবার দরকার ছিল সেটুকু ঠিকমতই বলা হয়েছে।

—খাবে চলো।

—খিদে নেই তেমন।

—তবু একটু কিছু মুখে দিয়ে আসবে চলো।

কালোবৌ বারান্দা থেকে সব শুনছিল। এবার উঠে পড়ে। নতুন বৌ এ ব্যাপারের ভেতর যে তাকেও জড়িয়েছে এইটেই তার সবচেয়ে খারাপ লাগে। তার ভবিষ্যৎ কি। তা নতুন বৌ কি জানবে, সে নিজেও জানে না। জানে একজন, তার কাছেই নিজেকে বিলিয়ে দেবার চেষ্টা করে গোপনে। কেউ জানে না। কেউ জানবেও না।

নতুন বৌয়ের কথাগুলো হাসি পাবার মত।

—দিদি ভাত দেবে চলো।

বড়ভাই কালো বৌয়ের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে একবার বলে,—ওদের ডাক।

স্বামীর অসহায় অবস্থাটা পুরোপুরি বুঝেও কালোবৌ বলে,—ওরা আর এ ঘরে খাবে না।

বড ভাইয়ের কণ্ঠে হতাশা,—বললে?

—হ্যাঁ। বললে।

বলেই কালোবৌ তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

এতক্ষণে বনবিহারীকে দেখা যাচ্ছে গলির মোড়ে। মৃগনয়নী কোলে ছেলে নিয়েই নড়ে-চড়ে বসে। রোগা লম্বা ছায়া পড়েছে গ্যাসের আলোয়। হনহন করে আসছে। কাছে এসে মৃগনয়নীকে দেখে একটু অবাক হয় বনবিহারী।

—কি হোল? এখানে বসে?

উঠতে উঠতে বলে মৃগনয়নী,—কি আক্কেল তোমার। কখন বেরিয়েছ?

বনবিহারী মনে মনে খুব খুশী হয়ে ওঠে। বলে,—গরম পুরি ভাজিয়ে আনলুম। তাই দেরি হোল।

ঘরে যায় ওরা।

মৃগনয়নী একখানি ডিস ভাল করে ধুয়ে খাবার সাজিয়ে দেয় বনবিহারীর সামনে। হাসে একটু।

—হাসছ?

—এমনি।—সত্যিই এমনি এমনি হাসি পাচ্ছে মৃগনয়নীর।

গরম গরম পুরি খেতে বেশ ভালই লাগে। অনেকগুলো খেয়ে ফেলবার পর চমক ভেঙে বলে,—'এই যা! তোমার আছে ত?'

আর মাত্র দুখানি ছিল। মৃগনয়নী হাসে।

—হাসছ যে?

—এমনি। আছে আমার খাবার।

হাতমুখ ধুয়ে বনবিহারী পরম তৃপ্তিতে বিছানার ওপর বসে একটা বিঁড়ি ধরায়।

মৃগনয়নী ওর দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে খেতে বসে, যাতে ও দেখতে না পায়। বনবিহারীর দেখবার বিশেষ আগ্রহও নেই। কাল অপিসে গিয়ে কারো কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করতে হবে। এই চিন্তাটাই ওর মাথায় ঘোরে।

মৃগনয়না হাতমুখ সাপটে বিছানায় আসে। খোকাকে কাঁথাটা পালটে শোওয়ায়। আলোটা নেভায়।

বনবিহারী শুয়ে পড়ে। মৃগনয়নী বসে থাকে। ঘরের এই অন্ধকারটুকুও অন্যরকম লাগে আজ। এই ঘরের অন্ধকারটুকুও যেন ওর সম্পূর্ণ নিজের।

ও বসে থাকে অন্ধকারে। তাকিয়েই থাকে।

—ঘুমোলে?

—না।

—আমরা চলে গেলে নতুন বৌ ত রাজত্ব করবে, কিন্তু দিদির কি হবে?

দিদি অর্থাৎ কালোবৌ।

—কালো বৌঠানের কথা ভাবিনি। যেমন আছে তেমনিই থাকবে।

—কি কষ্ট বলত? তোমরা থাকতে এমন হোল।

বনবিহারীর উত্তর তখুনি তখুনি শোনা যায় না। কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়।

তারপর শোনা যায়—কি জান, এক একজনের বরাতই দেখিচি ওমনি ধারা।

মৃগনয়নীও কথাটা বিশ্বাস করে। নইলে তার পুঁটিদির মত অমন নিরীহ মেয়ের কি না কষ্ট! আর কি নীরবেই এরা সয়?

আর দিদি? দিদি কিন্তু ভাগ্যকে মেনে নেয় নি কোনদিন। ভাগ্যের বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়েছে। সব কিছুর বাঁধন তুচ্ছ করে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। কিন্তু হেরে গেল। তরঙ্গিণীর পথ দুর্গম, নিদারুণ সাহসে বুক বেঁধে যাত্রা করেছিল। শেষে কি হোল? সত্যিই কি হারল?

—কাল একখানা খাম আনবে?

—কেন?

—পুঁটিদিকে একখানা চিঠি লিখব।

আনব।

মৃগনয়নী লিখবে। দিদির কথাই জানতে চাইবে। দিদির হতাশ চোখদুটো এখনও চোখের সমনে ভাসছে। অন্ধকারেও সামনে দেখতে পাচ্ছে, তেমনি পাদুখানা ভেঙে মাথাটা গুঁজে বসে আছে তরঙ্গিণী। ধবধবে মাংসল পিঠখানার ওপর কালো চুলের বোঝা। বুক থেকে কোমরের দিকটা অনাবৃত। ঘেমে গেছে কোমরখানা। ঘামে ঘামে কি বিশ্রী। ঘৃণায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মৃগনয়নীর। এ কি সব ভাবছে সে?

রাধারাণীর মাংসল ধবধবে ঘাড়খানার ওপর ঝক্‌ঝকে রাম-দা। ঠিক তেমনি অনাবৃত ধবধবে দেহখানা তরঙ্গিণীর এক অদৃশ্য খাঁড়ার তলায়।

কর্তাবাবুর সজল চোখদুটো। মৃত্যুর পূর্বের জোলো চোখদুটোর কথা মনে হয়। তাঁরই নিজ হাতে মাটি-তোলা বিশাল গহ্বর। একের পর একটি প্রাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে! ভবিষ্যতের এই যেন নিষ্ঠুর বিধান।

এ সব কি ভাবছে মৃগনয়নী? ঝগড়া চীৎকারের পর শরীরটা ভাল লাগছে না। মাথাটাও কেমন ঝিমঝিম করছে। ঘুম আসছে না।

উঠে দোর খোলে। দোর খুলেই চম্‌কে ওঠে। বারান্দায় অন্ধকারে কে দাঁড়িয়ে?

মৃগনয়নী ভয় পাবার মেয়ে নয়। আস্তে আস্তে এগোয়। ছায়ামূর্তিটি নড়ে না।

প্রায় কাছাকাছি গিয়ে মৃগনয়নী বলে,—কে?

মূর্তিটি চমকে ওঠে,—আমি। কালোবৌয়ের গলা।

—দিদি, এত রাত্রে এভাবে ?

কালোবৌ চোখদুটো মুছে নেয়,—ঘুম আসছে না তাই।

—আমারও। কেন বলোত ?

কালোবৌ তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মৃগনয়নীও কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর একটা কথাও বলতে পারে না। ভারি অদ্ভুত লাগে। মনের ভেতরে কত কথার ঝুলঝুরি, বাইরে একটিও নয়।

অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দুজন। দুজনের ভেতরেই অনেক কথা। অনেক কথা বলার রয়েছে। তবু একটা কথাও বলা গেল না।

আস্তে আস্তে মৃগনয়নী কলতলার দিকে যায়। হাত পা ধোয়। ঘাড়ে চোখে মুখে জল দেয়। ফিরে আসে নিজের ঘরের কাছে।

দেখে তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে কালোবৌ। থাক। সে কি করতে পারে। কিছু না।

দোর খুলে ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে মৃগনয়নী। আজ ঘুমোতে হবে। কাল বাসা দেখতেই হবে। যেতে হবে ভবানীর মায়ের কাছে, ডাক্তারের বৌ বীণার কাছে। আর ধীরেন বাবুদের বাড়ী।

থাক। ওখানে আর নাই বা গেল। ভদ্রলোক এক বিধবা ঝিয়ের সঙ্গে বসবাস করেন, তারই কয়েকটি ছেলেমেয়ে হয়েছে, তাদের নিয়েই আছেন। সবাই জানে। কে কি বলবে ? ভাল চাকরি করে, এত বড বাড়ীর মালিক। তার ওপর জায়গাটার নাম শহর কলকাতা।

ঝি-টি কিন্তু বেশ। একদিন আলাপ হয়েছিল মৃগনয়নীর সঙ্গে। বীরেনবাবুকে 'বাবু' বলেই ডাকে।

যাবার সময় মিষ্টি হেসে বলেছিল,—যাই, বাবুর আসবার সময় হোল। জলখাবার গরম গরম নইলে আবার রোচে না।

আর ডাক্তারের বৌ বীণা ? ওরও ত স্বামী ডাক্তার নয়। লোকে বলে। বীণা বলে না।

এক বিঘে জায়গায় কত কেলেঙ্কারী। চোখদুটো বুজে আসে মৃগনয়নীর, ঘুম আসছে।

সতরো

জীবনের এই একটা বড বাঁক। বলত মৃগনয়নী তখন-তখন, কি এক খুশির নেশায় মজে ছিলাম। বারোটা বছর যে কোথা দিয়ে কেটে গেল যেন টেরই পেলাম না।

খুশির দিনগুলো সংসারে পিছলে যায় চোখের নিমেষে। মনে হয় এই ত সেদিনের কথা। আহা, কোথায় যে গেল দিনগুলো। বেদনার দিনগুলো যেন মরচে ধরা ঘসে ঘসে চলে। প্রতিটি মুহূর্ত জানান দিয়ে যায়। মুহূর্তগুলো কাটতে আর চায় না। এক এক বিস্ময়।

বিস্ময় নয়। মৃগনয়নী নিজেই বলত, অবাক কিছু নয়। এমন হয়েই থাকে। বরং আজ মনে হয় দুঃখের যে দিনগুলা ঘসে ঘসে কেটেছে, সেগুলো মনের অনেক ময়লা কাটিয়ে দিয়ে গেছে। ময়লা কি সহজে কাটে। বহু জন্মের ময়লা না ঘসলে কাটে না।

তখন-তখন কি দিনই গেছে। উৎসাহের আর অন্ত নেই। নোতুন বাসা বাঁধবার কত চেষ্টা। যেন একটা একটা করে খড কুটো যোগাড করে করে নিজের একটি বাসা বাঁধা। ঘোরাঘুরির শেষ নেই। এই সময়টায়ই ছিল জীবনের সবচেয়ে খুশির খেলা।

গিয়েছিল মৃগনয়নী ভবানীর মায়ের বাডী। কথা বলল, কথায় কথা বাড়ল। নতুনবৌয়ের কথা সব যে ঠিক ঠিক বলেছিল তা নয়, অনেক বাডিয়ে বলল।

—টিঁকতে আর দিলে না দিদি। ঢের ঢের দেখেছি, এমন মেয়েমানুষ আর দেখিনি।

—তা বই কি!

সহানুভূতি পাওয়া গেল কিন্তু ঘর পাওয়া গেল না।

কত কথাই বলতে পারলো তখন মৃগনয়নী। ওর ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে ভবানীকে দেখে হেসে বললে,—এটিকে কিন্তু ভাই আমি নোব। আপত্তি কি, আপনারা ত বামুন।

ভবানীর মা হাসলো,—বেশত! আপনার ছেলে বড হোক। ও বড হোক!

তবুও ঘরের খোঁজ পাওয়া গেল না। ডাক্তারের বৌ বীণার কাছেও যাওয়া

হোল। বীণার কাছেও সেই একই কথা বলতে হোল। বীণাও খোঁজ দিতে পারলো না।

এমনি করেই কয়েকদিন কাটছিল। রান্না আলাদা হচ্ছিল একই বাড়ীতে।

এরি ভেতর ভাশুর ঠাকুর বনবিহারীকে ডেকে বললে,—তুই কি ঘর খুঁজছিস ?

—হ্যাঁ।

—তা এখনি একেবারে অন্য বাসায় যাবার কি দরকার ?

বনবিহারী মাথা চুলকে চলে এল।

মৃগনয়নী বেঁকে বসল। না। তা হবে না। এক বাসায় আলাদা রান্না অসম্ভব। শেষকালে ঘুঁটে কয়লা নিয়ে মারামারি হবে। বনবিহারী এখানেও মাথা চুলকোল।

মৃগনয়নীকে অগত্যা যেতে হোল ধীরেনবাবুর পোষা ঝি-টির কাছে।

—আপনার বাবুকে বলুন না। একখানা ঘর হলেই আমার চলবে।

মেয়েমানুষটির সাদা থান পরনে, মাথায় সিঁদুর নেই। নিজের পূর্ব পরিচয় লুকোবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। আগের স্বামীর একটি মেয়ে ছিল, সেটিকে নিয়েই বেরিয়ে এসেছিলো। মেয়েটির নাম বিভা। সবাই একে বলে বিভার মা।

সব শুনে বিভার মা বললেন,—আহা বামুনের ঘরের বৌ, এমন কষ্টে পড়েছ। বাবুকে বলে আমি নিশ্চয় ঘর দোব তোমায়।

আশ্বাস পেলো মৃগনয়নী। বিভা মেয়েটাকে কোলে বসাল। আদর করল। ধীরেনবাবুর কাছে থাকবার সময় যে দুটি ছেলে হয়েছে, সেদুটি খুব বাচ্চা। বিভার মায়ের কাছে তিনটিই সমান। ধীরেনবাবুও মানিয়ে নিতে পেরেছেন।

বিভার মা মৃগনয়নীর খোকার জন্যে একটা সন্দেশ এনে ভয়ে ভয়ে বলে,—দোব ? অর্থাৎ ওর ছোঁয়া খাবে কিনা!

—নিশ্চয়।

বিভার মা খুব খুশী।

মৃগনয়নী শেষ পর্যন্ত বাসা পেলো। দিনকতকের ভেতরই বিভার মা তার বাবুকে বলে ঘর ঠিক করে দিল। দোতলায় একখানা ঘর, নিচে রান্নাঘর। কলতলা তিন ভাড়াটের।

মাসের প্রথমেই এই বাসায় চলে এলো ওরা। আসবার সময় কেউ কিছুই বললে না। কালোবৌকেও দেখা গেল না সে সময়।

সময়টা ছিল সকাল। বনবিহারী সকালে উঠেই মুটে ডেকে আনলে দুটো।

দুটো মুটেই যথেষ্ট। মালপত্র নেয়া শুরু হোল। বড ভাই দেখল। একটা কথা‌ও বলল না। যথারীতি মিছরির শরবত খেয়ে অপিসে বেরিয়ে গেল। নতুনবৌ বোধহয় রান্নাঘরে, না অন্য কোথাও ?

জিনিসপত্র নেয়া শেষ হলে মুটের টাকা মিটিয়ে দিয়ে বনবিহারী একটা বিড়ি ধরিয়ে বসে পড়ে, ওর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায়, পরিশ্রমে। ফর্সা রোগা পিঠখানা ঘামে ভিজে ওঠে। মৃগনয়নী আঁচল দিয়ে ঘাম মুছে দেয়। এমন কখনও করে না। কিন্তু আজ বনবিহারীর গায়ের ঘাম ওর মন ভিজিয়ে দেয়।

—তুমি বরং একটু জিরোও। আমি ও বাড়ী গিযে জিনিস গুছিয়ে আসি।

বনবিহারী বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে,—তারচেয়ে বরং একেবারে চল, ওখানে গিয়ে বিশ্রাম করে চান সেরে অপিসে বেরোব।

যাওযার পর্বটা চুকিয়ে ফেলতে চায় বনবিহারী। বিদায়ের পালাটা ওর কাছে কেমন যেন আতঙ্ক-ভরা মনে হয়।

মৃগনয়নী বলে,—বেশ, তাই চলো। তুমি এই বালতিটা নিতে পারবে ? হারিকেন দুটো আর পাখা আমি নেব।

বনবিহারী বালতিটার ভেতর দড়িদড়াগুলো ভরে। মৃগনয়নী একবার নতুন-বৌয়ের ঘরের দিকে যায়। বোধকরি মৃগনয়নীকে আসতে দেখে নতুনবৌ ঘরের দোরটা ভেজিয়ে ভেতরে চলে যায। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মৃগনয়নী, ভেতরটা যেন জলে যায়। কালোবৌয়ের খোঁজে আর যেতে ইচ্ছে হয় না। তবু একবার রান্নাঘরের দিকে যায়। নেই। রান্নাঘরে কালোবৌ নেই।

খোকার হাতটা ধরে চলে আসে নিজের ঘরের সামনে। হারিকেন দুটো আর পাখা হাতে নেয়। খোকাকে বাঁ কাঁকে কোলে নিতে হয়।

বনবিহারীও ওঠে, জিজ্ঞেস করে আস্তে,—দেখা হোল ?

তারপর আগে আগে হনহন করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়।

না।—বলে মৃগনয়নী।

ওর পেছনে বালতি হাতে বনবিহারী। বাড়ীটাকে পেছনে ফেলে গলির ভেতরে অনেকটা এগোতে হয়। এগোচ্ছে ত' এগোচ্ছেই। মনে হয় যেন অনেক কাল ধরে চলতে হবে। এমনি করেই।

আগে-আগে মৃগনয়নী ছেলে কোলে লণ্ঠন হাতে। পেছনে বোঝা নিয়ে বনবিহারী।

কমলির দিদিমা দোরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। এ বাড়ীর আর এক ভাড়াটে কমলীর মা আর দিদিমা।

মৃগনয়নীকে দেখে বললে,—ঘরটা বাছা অমন ধারা খুলে রেখে কি যায়! ভাগ্যিস আমি ছেলুম!

মৃগনয়নীর মুখখানা ঘেমে গেছে। চোখে এক অসাধারণ বলিষ্ঠ চাউনি। একটু হেসে, বালতিটা নামিয়ে বনবিহারীকেই ঘরের শেকল খুলতে হয়। ঘরে মাল-পত্র ছড়ান।

বনবিহারী আবার বসে পড়ে। বিড়ি ধরায়। বেশ ভাল করে নিশ্বাস নেয় কয়েকটা।

মৃগনয়নী ঘরে ঢুকে ছেলেকে নামায়।

—একটু বোস।

বাইরে এসে সোজা নিচে নেমে আসে। কলঘরের সামনে এসে দেখে দোরটা ভেজান।

—কে ভাই ভেতরে?

—আমি গো!—কমলির মায়ের গলা।

মৃগনয়নী বলে,—একটু সকাল সকাল যদি বেরোন ভাই, আমার কর্তা এখুনি বেরোবেন।

—পাট্টে দাও না। ত্যাতক্ষণে আমার হয়ে যাবে।

মৃগনয়নী ওপরে গিয়ে বনবিহারীকে স্নানের জন্যে নিচে পাঠিয়ে দেয়।

কমলিকে দিয়ে দুটো সন্দেশ আনিয়ে রাখে বনবিহারীর জন্যে।

জল খাইয়ে বনবিহারীকে অপিসে রওনা করিয়ে দিয়ে কোমরে এঁটেসেঁটে আঁচল-খানা জড়িয়ে নেয়। বালতি বালতি জল এনে ঘর ধুতে হবে, জিনিসপত্র গুছোতে হবে, উনুন পাততে হবে, আশে পাশের ভাড়াটেদের সঙ্গে দুটো মিষ্টি কথা বলে বশে রাখতে হবে। অনেক কাজ। কাজের শুরু হোল।

কমলি মেয়েটা এসে খোকাকে ডেকে নিয়ে যায়, আদর করে। মেয়েটা বেশ গায়ে-পড়া। আলাপী। বেশ নাকে-মুখে কথা। চৌখোস।

আসার পর থেকে কমলি ত কবার এলো ওর ঘরে। ছেলেটাকে যদি কিছুক্ষণ ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে পারে কমলি, তবে এই ফাঁকে কাজগুলো সব সেরে নিতে পারে মৃগনয়নী। তাই নেবে। কাজে লেগে যায় মৃগনয়নী।

নিচের থেকে বড় বালতি ভরে জল আনতে একটুও কষ্ট হয় না ওর। শুধু

ওর চওড়া পুষ্ট হাতখানার শিরাগুলো ফুলে ফুলে ওঠে। টিকালো নাকের পাতাদুটি ফুলে ওঠে এক ভবিষ্যৎ প্রতিজ্ঞার দীপ্তিতে।

সংসারে সে কিছুতেই হারবে না। কেউ তাকে হারাতে পারবে না। সব সে একা করবে। একা। এক ক্ষীণজীবী সঙ্গী নিয়ে পথ সে চলবে। তার হাতখানা ধরে তাকে বুকের কাছে আগলে নিয়ে ঈর্ষায় জ্বলে-ওঠা অনেক চোখের ভেতরে বসেও সে ভয় পাবে না। ভয় করতে মৃগনয়নী জানে না।

এইটেই রামতারণের সবচেয়ে বড দান। এতবড দান আর কোথাও পায়নি মৃগনয়নী। এ সম্পদ হারায় না। কখনও হারাবে না।

আঠারো

সুনিপুণ হাতে বাসা বেঁধেছে মৃগনয়নী। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই।

মাস তিনেক কেটে গেল। এর ভেতর সংসার চালিয়ে কত জিনিস যে মৃগনয়নী কিনেছে বনবিহারীও জানে না। বনবিহারী টাকা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। টাকা পেয়ে চিন্তা শুরু হয় মৃগনয়নীর।

এ মাসে বড একটি কাঁসার থালা কিনতেই হবে বনবিহারীর জন্যে, আর কমলের একটি ছোট গেলাস। ছেলের নাম রেখেছে কমল।

তাছাডা বাসন-মাজা ঘর ধোবার একটি ঝি রাখতে হবে। রাখত না মৃগনয়নী, কিন্তু পেটে আর একটি ছোট্ট প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে। খুব সকালে উঠতে ইচ্ছে হয় না। সন্ধ্যে হলেই বমি-বমি লাগে।

একটি ঠিকে ঝি না হলে আর চলে না। ভবানীর মাকে একটি ঝিয়ের কথা বলতে হবে। বলতে হবে ডাক্তারের বউ বীণাকে। সবচেয়ে ভাল হয় একবার বিভার মায়ের কাছে গেলে। বিকেলে বেডাতে যাবে ওখানে।

বনবিহারী আসবে সন্ধ্যার পর। তার আগেই ফিরে আসা যাবে। কমলকে নিয়ে একটু গডাতে গডাতে রোদ পডে আসে।

একা একা ঘরে শুয়ে কত কথাই যে মনে হয় মৃগনয়নীর। কালোবৌ একদিনও এলো না এ বাড়ীতে। নতুনবৌ ত নয়ই। একই অপিসে কাজ করে দু-ভাই। শুনেছে, ভাল করে কথা বলে না কেউ কারো সঙ্গে।

বনবিহারী নাকি কথা বলতে গিয়েছিল দু একবার। মেজদা কথা না বলায় ও আর সেধে কথা বলেনি।

কাজের ব্যাপারে কোন প্রয়োজন হলে বড়বাবুর মারফত কথাবার্তা হয়।

জিজ্ঞেস করেছিল মৃগনয়নী—তুমি ত ক্যাশের কাজ করো। তোমার কাছে ত আসতেই হবে।

—আমি ডাকি না। বেয়ারা দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিই ভাউচার সুদ্ধ।

—ভাউচার কি?

—মানে রসিদ।—বনবিহারী মৃগনয়নীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।—সায়েব কাকে বেশী ভালবাসে জান?

—কাকে?—বলে মৃগনয়নী।

—আমাকেই। ক্লার্ক সাহেব ত আমায় পাগলাবাবু বলে ডাকে।

মৃগনয়নী হেসে ওঠে,—ঠিকই বলে।

বনবিহারীও হাসে। আশ্চর্য! দাদার সঙ্গে মনোমালিন্যে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। একটুও বেদনা নেই। সংসারে ভালবাসা কত সহজেই না ভুল হয়ে যায়!

—কালো বৌঠান কিন্তু একদিনও এলো না?

হঠাৎ হয়ত কখনও কখনও বলে বসে বনবিহারী।

মৃগনয়নী বলে,—আমিও ঠিক বুঝি না, কেন এলো না।

—একদিন নেমন্তন্ন করলে কেমন হয়?

—করতে পারো। তবে আমার মনে হয় আসবে না। সবই সমান।

বনবিহারী একটু চুপ করে থেকে হয়ত বলে,—না, কালো বৌঠান তেমন হতেই পারে না। আমার মনে হয়, ওকে আসতে দেয় না।

—কে?

—নতুনবৌ।

মৃগনয়নী লক্ষ্য করে কালোবৌ সম্বন্ধে বনবিহারীর দুর্বলতা এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায় নি।

একটু থেমে হয়ত মৃগনয়নী কথা পাল্টায়,—সামনের মাসে অম্বুবাচী। মাকে কিছু টাকা পাঠাবে না?

—কি লাভ পাঠিয়ে?

—কেন?

—সামনের মাসে বোধহয় ওরা সব আসছে।

বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে মৃগনয়নীর,—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। দাদা আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বড়বাবুকে বলছিল।

চুপ করে থাকে মৃগনয়নী। চুপ করে অনেকক্ষণ কি যেন ভাবে। অনেকক্ষণ পরে বলে,—তবে এই মাসেই না হয় গোটা দশেক টাকা পাঠিয়ে দাও।

—এ মাসে টাকা কই?

—সে আমি বুঝব'খন। তুমি পাঠিয়ে দাও।

বনবিহারীকে দিয়ে জোর করে দশটা টাকা পাঠিয়েছিল মৃগনয়নী। সংসারও চলছে বেশ ভালভাবেই, দেখেশুনে বনবিহারী নিশ্চিন্ত। এ মাসেও তাই মাইনের সব টাকা দিয়ে দিয়েছে মৃগনয়নীর হাতে।

দুপুরে গড়াতে গড়াতে ভাবছিল মৃগনয়নী। সে যখন আঁতুড়ে যাবে তখন সংসার চলবে কি করে? পুঁটিদিকে যদি কোনরকমে আনান যায় এখানে। তা কি সম্ভব হবে?

মাকে কাল একখানা চিঠি লিখবে মৃগনয়নী। তরঙ্গিণীর কি হোল কে জানে। কোন খবরই ত পাওয়া গেল না।

দিদির খবরটা চেয়ে পাঠাতে হবে। দিদির জন্যে মাঝে মাঝে মনটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। সেই ডাগর চোখ দুটোয় গভীর হতাশার ভেতরেও প্রতিভার দীপ্তি। দিদির মত আর কাউকে দেখলাম না। অমন মেয়ে যেখানে সেখানে মেলে না।

যদি কখনও আর একখানা ঘর ভাড়া নিতে ও পারে। দিদিকে এনে নিজের কাছে রাখবে। যতদিন থাকতে চায়।

কিন্তু। দিদির প্রতি একটা নিষ্ঠুর ঘৃণার ভাব দেখা দেয় মনের সচেতনতার অলক্ষ্যে। দিদিকে সে ঘৃণাও করে। দিদির জন্যে কান্নাও পায়। নিজেকে নিজে আর বুঝে উঠতে পারে না মৃগনয়নী। যাকগে।

উঠে পড়ে মৃগনয়নী। বিভার মায়ের কাছে একবার যেতে হবে। ঘরভাড়াটা দিয়ে আসতে হবে আর ঠিকে ঝিয়ের কথাও বলতে হবে।

গলিটার মোড় থেকে রোদ গিয়ে উঠেছে ওই বড় বাড়ীটার ছাদের কুঠরিটার দেয়ালে। বেলা গড়িয়ে গেছে।

নিস্তব্ধ গলিটা মুখর হয়ে উঠছে ক্রমশ ফেরিওয়ালাদের ডাকাডাকিতে।

সাবান তরল আলতা চাই—দাঁত ভাল করবে—পাঠার ঘুগনী-ই-ই-ই-ই !

কত রকমারি সুরে রকমারি আবেদন। সাড়া মেলে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের কাছ থেকে। বেলা বেশ পড়ে এলো।

মৃগনয়নী উঠে দু বালতি জল তুলতে যায় কলতলায়।

কলতলায় কমলির মা। যখনই কলে আসে—তখনই কমলির মা। এর বোধহয় জল-বাই আছে।

—একটু সরবে ভাই। জল তুলে নেব দু বালতি।

কমলির মায়ের গলাটা অত্যন্ত কর্কশ আর সরু। মুখটা বাড়িয়ে বলে,—তুমি কি ঠিক আমার পেছু লেগে থাকবে বাছা? য্যাখন আসব, ত্যাখনই তোমার রূপ দেক্‌খে যাবে ?

—বিভার মায়ের ওখানে যাব। একটু তাড়া আছে তাই।—একটু হেসে বলে মৃগনয়নী।

কমলির মা সমান গলায় বলে,—তোমার তাড়া। কাক না ডাকতে তোমার ভাতারের তাড়া। তাড়ায় তাড়ায় যে জ্বইলে দিলে বাছা।

মৃগনয়নীর মনে মনে খুব হাসি পায়। বাইরে হাসিটা চেপে বলে,—শোন, বলতে ভুলে গেছি, কমলি আজ রাত্তিরে আমার ঘরে খাবে।

—তা বেশ ত'। এর আর বলাবলি কি।

এইবারে নরম হয়ে এসেছে কমলির মা। কলতলাটাও ছেড়ে দেয় তাড়াতাড়ি।

মানুষটার জন্যে কষ্ট হয় মৃগনয়নীর। কলের মুখে বালতিটা পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে কি কপাল এই কমলির মায়ের !

কমলির দিদিমার কাছেই কথাটা শোনা। স্বামী দেশত্যাগী হয়েছে আজ প্রায় সাড়ে ষোল বছর। বিয়ের বছর দুয়েক পরেই। কারণটা ঠিক জানা যায় না।

এইটুকু বোঝা ওর দিদিমার কথা থেকে। বিয়ের সময় কমলির মা ছিল বড্ড রোগা আর এত ক্ষীণজীবী যে আঙুল দিয়ে ঠেললে পড়ে যেত। বিয়ের পর মাঝে মাঝে রাত্তিরে ভীরমি খেতে আরম্ভ হোল। দু একদিন রাত্তিরে চীৎকার করেও উঠত। একদিন পেলয় কাণ্ড! মানে সেদিন রাত্তিরে নাকি কমলির মা ওর স্বামীর গলা টিপে ধরেছিল। কথাটা কমলির দিদিমা খোলসা করে বলেনি। এটা বলেছিল, ভবানীর মা।

—আমাদের দেখ্‌ তাই।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ গো ! সে হৈ হৈ কাণ্ড। পুরুষ মানুষ অত সইবে কেন ? আদর যত্ন দিয়ে বেঁধে রাখতে হবেনি ? ব্যস্। সেইত বেইরে গেল।

যে জন্যেই বেরিয়ে যাক, কমলির মায়ের বরাতের কথা ভেবে কষ্ট লাগে মৃগনয়নীর।

না বনলে ছেড়ে যাওয়া ত' খুবই সহজ, বনিয়ে থাকাটাই ত কঠিন।

কমলির মা নিজেও মুখ খুলেছিলো একদিন মাত্র। কথাটা হচ্ছিল ভবানীর মায়ের সামনেই।

বললে,—দোষ কি মানুষ করে না ? তাই বলে একবারে ইয়ে ? এখন থাকলে কি তেমন ধারা হোত ? কোথায় যে চলে গেল।

স্পষ্টই দেখল মৃগনয়নী চোখের কস বেয়ে তপ্ত জলের ধারা।

ভবানীর মা মুচকি হেসে একটু টিপলে মৃগনয়নীকে, অর্থাৎ আদিখ্যেতা দেখ। মৃগনয়নীর কিন্তু ভাল লাগেনি ভবানীর মায়ের ভাবখানা।

কমলির মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল,—কোথায় আছে জান ?

—তা আর জানব নি ? হারাণ তান্ত্রিক ভূত চাইলে বলে দিলে। আমাদের দেশের তান্ত্রিক। শ্মশানে মশানে গিয়ে কত কি করলে, যাগযজ্ঞি ঝাড় ফুঁক। তারপর সবই বলে দিলে।

—কি বললে ?

—পশ্চিমের একটা শহরে আছে। আবার বিয়ে করেছে। ছেলে হয়েছে তিনটে। তবে ভাল নেই। খুব অশান্তিতে আছে। খুব ভুগছে।

এইবার যেন একটু হাসি এলো কমলির মায়ের মুখে।

আশ্চর্য ! মৃগনয়নী ভেবে অবাক হয়েছে, একজন খুব কষ্ট পাচ্ছে ভেবেই আরাম। কি কুৎসিত আরাম। আর কথা বলতে ইচ্ছে হয়নি মৃগনয়নীর। বালতি জুটো ভবে ওপরে চলে এলো মৃগনয়নী।

ঘর ঝাঁট দিয়ে উনুনে ঘুঁটে কয়লা সাজিয়ে শাড়ী বদলে এই বার বিভার মায়ের ওখানে চলল মৃগনয়নী। আঁচলে বেঁধে নিলে ভাড়ার টাকা। মনে মনে ঠিক করে নিলে সন্ধ্যের আগেই ফিরতে হবে।

দিনে বনবিহারী খায় না। কোন মতে সেদ্ধ ভাজাভুজি দিয়ে চালায় মৃগনয়নী। রাত্রের রান্নাটা বেশ জুত করে করতে হয়। ভাল মাছ বনবিহারী আনবেই। রাত্রে

একটু সস্তায় মেলে। সবচেয়ে সেরা মাছ আনে বনবিহারী। সস্তায় খারাপ জিনিস ও আনতে পারে না। বাজারের সেরা পটল, সেরা আম, ভাল মাছ, এ সব আনা চাই।

না খেলে আর রোজগার করছি কেন বলো।—কথাটা শুনতে ভালই লাগে মৃগনয়নীর। তবু বলে দু-চারবার একটু গলা উঁচু করে যাতে বাড়ীর আর সবাইও শুনতে পায়।

কি দরকার ছিল এত দাম দিয়ে পটল আনবার। কি যে করো। ল্যাংড়া আমও এতগুলো আনবার দরকার ছিল না। কমল খাবে ঠিকই। কটা আর খাবে ?

সবাই শুনল কথাটা—এও এক আনন্দ।

ও মনে মনে বোঝে যে ওযে ভাল খেতে পরতে পায় এটা সবাইকে শোনানটা মোটেই ভাল নয়। তবু মৃগনয়নী যে মেয়েমানুষ !

পরে ভাবলে হাসি পায়। নিজের ওপর নিজের বিরক্তি আসে।

এতক্ষণে বিভার মায়ের ঘরের সামনে এলো মৃগনয়নী। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকতে হবে।

বিভার মা কাছে এসে চোখ বড় বড় করে ঠোঁটে আঙুল রেখে বললে,—চুপ !

মৃগনয়নী চমকে উঠেছে ভয়ে,—কি হোল ?

বিভার মায়ের মুখখানা কাগজের মত সাদা। মৃগনয়নীকে বারান্দার শেষ সীমানায় টেনে নিয়ে এলো। মৃগনয়নীর বুকের ভেতরটা কাঁপছে।

—কি হোল, অমন করছেন কেন ?

—বাবু।

—কি হয়েছে ?

—বাবু ওই পাশের ঘরে খিল বন্ধ করেছে, বিভাও আছে।

বিভা ওর আগের স্বামীর মেয়ে। বয়েস প্রায় ষোল।

—তাতে কি হয়েছে ?

বিভার মায়ের গলা ধরে আসে। ঠিক গুছিয়ে বলতে পারে না,—মানে, ওঘরে চাবুক আছে কিনা। খুব সরু চাবুক।

মৃগনয়নী জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে।

—বুঝলেন না ? একটু পরেই শুনবেন বিভার গোঙানী, মারবে ওকে। মাঝে মাঝে মারে।

মৃগনয়নী স্তম্ভিত হয়ে যায়। লোকটা কি পাগল ?

সাঁই করে একটা আওয়াজ! মাগো!—চাপা কণ্ঠস্বর। বিভারই ত ?

—শুনছেন ?—বিভার মায়ের চোখ দুটোয় কোন ভাষা নেই, দৃষ্টি নেই, পৃথিবী ওলটপালট হচ্ছে সেখানে।

আবার চাবুকের আওযাজ। আবার।

মরে গেলুম মা! মাগো!—আবার চাপা আর্তনাদ। চীৎকার করবার হুকুম নেই বোধকরি।

মৃগনয়নী একি শুনছে। একি দেখছে। মৃগনয়নীর কপাল ঘেমে ওঠে। নাকের ডগা ঘেমে ওঠে।

বিভার মা মুখে আঁচল চাপা দিয়েছে। একটু পরে আবার চুপচাপ।

বিভার মা ফিসফিস করে বলছে—মদ খেযে ফিরেছে। মদ খেলে মানুষ এমন হয়!

মৃগনয়নীর বুকে কাঁপুনি তখনও থামেনি। কিন্তু বিভাকে মারবার কি কারণ? ষোল বছরের ডাগর মেযে!

বিভার মা বলছে তখনও,—জানেন না বুঝি, বিভার নিজের বাপ নয়! তাহলে কি এমন করে মারতে পারত!

বিভার মা অদ্ভুত। নিজের কলঙ্কের কথা নিজে এমন সহজ হয়ে সহজ করে বলতে আর কাউকে দেখেনি মৃগনযনী। ছেলেমানুষের মত সরল চাউনি।

মৃগনয়নীর আর ভাল লাগছে না। এবার চলে যাবে।

—নিন, ভাড়ার টাকাটা নিন।

বিভার মা টাকাটা [illegible]ত নিয়ে দাঁড়িয়েই থাকে।

যাবার আগে মৃগনয়নী বললে,—আচ্ছা বিভাকে কেন মারে বলুন ত ?

—কেন ?

—হ্যাঁ, অতবড় মেয়ে ওর গায়ে হাত দেয়া কি ভাল ?

বিভার মা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

—এমন করে চাবুক মারা। ছি, ছি! কেন মারে ?

বিভার মা চোখ দুটো তুলে তাকায়। চোখ দুটো বর্ষায় ভেজা কাঁচের মত ভিজে। জলে ভরে ওঠে।

—কেন মারে? মারবেই ত। যা বলে তা শোনে না।

—কি শোনে না?

—জানি না।—বলে বিভার মা মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।

মুখ ঘুরিয়ে নিলেও দেখা যায় গাল বেয়ে জল পড়ছে এবার। অনর্গল।

মৃগনয়নী নিজেই লজ্জায় সংকুচিত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। মনটা ভার। অনেক বেদনার সাক্ষী হযে চলেছে মৃগনয়নী।

শ্লথ পায়ে নিজের ঘরে ঢোকে। শরীরটার ভেতর কেমন করতে থাকে। শুযে পড়ে মৃগনয়নী।

কমলি আসে। কমলকে কাছে দিয়ে যায়।

—ও আর থাকছে না মাসিমা।

কমলির দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না মৃগনয়নী। বিভার মায়ের জলে-ভেজা মুখখানা তখনও চোখের সামনে ভাসছে। হয়ত ভেবেছিল স্বামীর ঘর ছেড়ে এসে শান্তি পাবে। কিন্তু কই, এখানেও সেই অশান্তি। আবার কি এ ঘরও ছাড়বে বিভার মা?

না, আর বোধহয নয়। সংসারের কতকগুলো সুকঠিন শিক্ষা বোধহয় এদেরই হয়।

কালে, কত কালে কে জানে, তবু কোন এক সময বিভার মা খাঁটি হযে উঠবে। সংসারটাকে ওর মত করে কটা মেয়েই বা দেখতে পায়?

ধীরেনবাবুর কথা একদিন জিজ্ঞেস করবে ওকে। ওদের ভালবাসার কথা একদিন জিজ্ঞেস করবে ওকে। ওদের ভালবাসার কথা জানতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু এমন ইচ্ছেটা ত' ভাল নয়। খারাপটাই বা কি? নিছক কৌতূহল ছাড়া ত' আর কিছু নয়।

তবু একবার বনবিহারীকে জিজ্ঞেস করে সব কথা জানিয়ে যাওয়া ভাল।

ভাবতে ভাবতে চোখদুটো বুজে আসে। তক্ষুণি মনে হয় ঘুমলে চলবে না। রান্না রয়েছে।

ভাবতে ভাবতেই একটু বোধহয় ঘুমিয়েই পড়ে মৃগনয়নী। কতক্ষণ গেছে কে জানে। হঠাৎ পায়ের একটা ঠোক্কর খেয়ে চমকে চোখ মেলে মৃগনয়নী।

—কে?

একি! সে কি স্বপ্ন দেখছে! আবার একটা পায়ের ঠোক্কর। এবার আরও জোরে কোমরে।

আরও জোরে লাগলে হয়ত বা—পেটের সন্তানটার কি হোত কে জানে। আতঙ্কের আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যায় মৃগনয়নী।

—তুমি! একি!—উঠে দাঁড়ায় ও।

বনবিহারী পাশে দাঁড়িয়ে টলছে। চোখ ছুটো রাঙা। চোখের পাতা টানছে। ভাল করে তাকাতেও পাচ্ছে না। মুখের কাছে দাঁড়াতেই বিশ্রী গন্ধ পায় মৃগনয়না।

—তুমি! মদ খেয়েছো!—গলা বন্ধ হয়ে আসে ওর।

বনবিহারীর কথাগুলো অস্পষ্ট।

তবু বেশ জোরালো করে বলবার চেষ্টা করে,—ভর সন্ধে বেলা ঘুমিয়ে ঘরে অলক্ষ্মী ধরাবে! ও সব চলবে না। ঘাড় ধরে বার করে দোব।

মৃগনয়নী কি আর বলবে! ওর হাত ধরতে যায়।

—ছুঁবি না। খবদ্দার। অলক্ষ্মীর মত ঘুমোচ্ছেঃ বাতাস কর। মদ দে আরও।

মৃগনয়না তাড়াতাড়ি গিয়ে দোরটা বন্ধ করে দেয়।

ছি, ছি! ওর নিজের মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। বিভার মায়ের সঙ্গে আর ওর কি প্রভেদ রইল। বনবিহারীর চাবুকটা হাতে নেওয়া বাকী।

হাত পা কাঁপছে মৃগনয়নীর। তবু সাহস করে কাছে আসে। গায়ে হাত দেয়। ধরে বসায় বনবিহারীকে।

—ছুঁবি না।—আবার একবার গর্জে ওঠে বনবিহারী।

—তোমার পায়ে পড়ি। চেঁচিও না।—গলা রুদ্ধ হয়ে আসে। অশ্রুর বেগ আর বুঝি সামলাতে পারে না।

বনবিহারীর জুতো খুলে দেয়। জামা খুলে দেয়। ঘেমে গেছে একেবারে। পাখাটা নিয়ে বাতাস করে।

কমল ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। কমলকে ঘর থেকে বার করে দেয় ও। ভেতরে এসে বনবিহারীকে শুইয়ে দেয়। বনবিহারী একদৃষ্টে তাকিয়েছিল মৃগনয়নীর দিকে।

এবার গলাটা একটু নরম,—মদ খেলুম কেন জান? খুব অবাক হচ্ছ, না? মদ খেলুম আনন্দে। একটা মস্ত স্যালভেজ হয়েছে। মানে পাটের স্যালভেজ।

মৃগনয়নী চুপ করেই শোনে।

—এ স্যালভেজে হাজার টাকা উপরি আমার কে মারে! আজই পেয়েছি দেড়শ টাকা উপরি। পকেটে আছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? পকেট ছাখ! মাইরী বলছি!

মৃগনয়নীর মুখখানা থমথম করে,—চুপ করে শোও ত!

—একটু মিটুলি চচ্চড়ি খাওয়াতে পারো?

—আঃ! চুপ করো।

মৃগনয়নী ওকে জোর করে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেয়।

নিজের মনে অস্ফুট আওয়াজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে বনবিহারী।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে মৃগনয়নী। উনুন ধরাতে আর ইচ্ছে নেই। রান্নার একটুও তাড়া নেই।

সন্ধ্যা কখন উতরে গেছে টের পায়নি। বেশ খানিকটা রাত হয়েছে। ছেলেটা বাইরে কোথায় গেল কে জানে। উঠতে আর ইচ্ছে হয় না। ঘুমন্ত বনবিহারীর দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

হাত পা সব অবশ—অসাড়। ভাবতেও পাচ্ছে না কিছু। মাথাটা যেন নীরেট হয়ে গেছে। পাথরের মত ভারী। অনেকক্ষণ—বসেই রইল।

বাইরে কমলি দোরে ধাক্কা মারছে।

—অ মাসিমা। খোকাকে নাও।

এবারে উঠতে হয়। উঠে দোরটা খুলে দেয়। খোকাকে ভেতরে টেনে নেয়। হঠাৎ মনে হয় কমলির ত' আজ রাত্রে এখানে খাবার কথা ছিল। রান্না হয়নি। মেয়েটা তবে কি খাবে?

কমলিকে বলে,—দাঁড়া একটু।

বনবিহারীর জামার পকেটে হাত দেয়। সত্যিই এক তাড়া নোট। এক মুঠো খুচরো।

চার আনা বার করে কমলির হাতে দিয়ে বলে,—খাবার কিনে খাস। আজ আর রাঁধব না ভাবছি। তোকে ভাত আর কোত্থেকে দোব?

চার আনা পেয়ে কমলি ভারি খুশী। প্রায় নাচতে নাচতে ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে যায়।

দোরে খিল দিয়ে মৃগনয়নী খোকাকে বনবিহারীর পাশে শোওয়ায়। খোকা দু একবার খিদে পেয়েছে বলে। কিন্তু মৃগনয়নী আস্তে আস্তে পিঠ চাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

এবার নিজে ওঠে। এক গেলাস জল খায়। মাথার ভেতরটা কেমন করছে। সব যেন ঘুরছে মনে হচ্ছে। জানালার একটা পাট শক্ত করে ধরে বাইরে তাকায়

মৃগনয়নী। নীরেট অন্ধকার। বর্ষার ঘোলাটে আকাশ। একটি নক্ষত্রও চোখে পড়ে না। কেননা যেন গুমট গরমে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বুকের আঁচল নামিয়ে দেয় মৃগনয়নী। একটু হাওয়া নেই। জানালার গরাদের কাছে সরে দাঁড়ায় ও। সমস্ত ঘরটা দুর্গন্ধে ভরে গেছে।

কি বিশ্রী দেখাচ্ছে বনবিহারীকে! ঘুমিয়ে পড়েছে বনবিহারী। ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে আছে। নাকটা বেঁকে আছে বালিশের চাপে। আজ ঘৃণা হচ্ছে বনবিহারীকে দেখে।

চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকে মৃগনয়নী। হাতের মুঠোয় টাকাগুলো বড্ড গরম লাগছে। এতগুলো টাকা একদিনের রোজগার। ঠিক সইতে পারেনি বনবিহারী। টাকার গরমটা মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। স্নায়ুগুলোকে অস্থির করে তুলছিল নিশ্চয়ই। তখনই হয়ত কোন এক পরম বান্ধবের সঙ্গে মদের দোকানে যেতে দ্বিধা হয়নি।

মনে হয় বিভার মায়ের কথা। ধারেনবাবু বিভাকে ঘরে ঢুকিয়ে চাবুক মারে। কেন? প্রশ্ন একটা থেকেই যায়। বনবিহারী ত' তাকে অনায়াসে মারতে পারে। মদ খেলে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান যে এমনভাবে লোপ পায়, ধারণাও ছিল না মৃগনয়নীর।

বিভার মা ভয়ে লুকোয়। কাঁদে। মৃগনয়নী কাঁদবে না। একটুও ভয় করবে না। বনবিহারীকে নয়, তার মদকেও নয়। ভয় করলেই এরা পেয়ে বসবে। যত পালাবে, ততই বেড়ে যাবে।

বিভার মায়ের আজ এই জন্যেই এমন করুণ অবস্থা। অবস্থাকে করুণ থেকে করুণতর করে তোলার জন্যে বিভার মাও অনেকটা দায়ী। মৃগনয়নী নিজেকে এত করুণ করে তুলে করুণার ভিক্ষে চায় না কারো কাছে।

না, তার চেয়ে মৃত্যুও ভাল। সে হারবে না। বনবিহারীর কাছে নয়, তার মদের কাছেও নয়। সে হারতে জানে না। জীবনে হেরে যাওয়া মানে মরে যাওয়া। বাবার কাছে বহুকাল থেকে এ কথা শিখেছে মৃগনয়নী।

বিভার মা হেরে গেছে। স্বামী ফেলে বেরিয়ে আসবার মত সাহস নিয়ে যে জীবনে জিততে গিয়েছিল, সেও হেরে গেল শেষ পর্যন্ত। হারবেই ত! অন্যায় করবার দুঃসাহস মানুষকে ধীরে ধীরে ভীরু করে তোলে। এ সত্য ত অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিভার মায়ের যে সাহস ছিল, সেটা অন্যায়কে অন্তরঙ্গ করে নেবার সাহস। সেখানে শেষ পর্যন্ত বিভার মায়ের গ্লানি চোখের জলে ধুয়ে গেলেই মঙ্গল।

মৃগনয়নী সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কোন অন্যায় সে করেনি যে তাকে নুয়ে চলতে র সংসারে। সামনে জানালা দিয়ে যে টুকরো আকাশ দেখা যাচ্ছে, সেখানে কটা স্নিগ্ধ উজ্জ্বল তারার শীতল আলোয় যেন চোখ দুটো পবিত্রতায় ভরে উঠছে।

মৃগনয়নীর জীবন-চেতনা ওমনি একটি তারার মত দীপ্তিময়, পবিত্র। আর যাই ক না কেন, জ্বালা নেই সেখানে।

উনিশ

একটি বছরের ওপর কেটে গেছে। চোখের পলক ফেলতেই যেন কেটে গেছে। ছন দিকে তাকিয়ে ভাবলে মনে হয়, এই ত সেদিনের কথা। যেন মাত্র কয়েক ন আগেই ছোট তরফের কামরাঙা গাছতলায় গিয়েছে দৌড়ে। জামরুল পাড়তে য়ে ঝগড়া হয়েছে পুঁটিদির সঙ্গে। আয়না মহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত নিষ্ফল কেল কেটে গেছে তরঙ্গিণীর। সাক্ষী থেকেছে মৃগনয়নী।

বেশীদিনের কথা নয়। শেষ জীবন পর্যন্ত এমনিই মনে হয়। সংসারের এক রূপ আশ্চর্যরূপ! মৃত্যুর আগেও মনে হয়েছে, এই ত' সেদিন জন্মালুম। এরি ভতর ফুরিয়ে গেল! একি কাণ্ড! একি বিস্ময়! এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে ল!

সূর্য উঠল আর, ডুবল, ডুবল আর উঠল, আবার উঠল আর ডুবল। ব্যস্। ত্র এই কটা ওঠা-নামা দেখতেই এ জন্মের এত কাণ্ড! জীবনটাও মাত্র এই কটা দনের ঘুমোন আর জাগা।

হতে পারে না। জীবনের শেষ এখানেই হলে সংসারটার কোন মানে থাকত না। একটা অর্থহীন প্রলাপ মনে হোত এই জীবন বন্যা। তা নয়। নিশ্চিত জেনেছে মৃগনয়নী।

মৃত্যুর আগে স্পষ্টই জেনেছিল মৃগনয়নী। তা নয়। জীবনের শেষ নেই। শেষ হতে পারে না। জীবনের আদি নেই, শেষ নেই। এক একটা জন্ম এক একটা জীবন নয়। বহু বহু জন্মে মৃগনয়নী এসেছিল। আবার মৃগনয়নী আসবে। বহু বহু জন্মই হয়ত আসবে। এ জন্মে যে স্বপ্ন ভেঙে গেল তাকে সফল করে তোলবার আশা নিয়েই আসতে হবে।

আশা হয়ত আশাই থেকে যাবে। আবার ভেঙে যাবে স্বপ্ন।

কতকাল—কতকাল চলবে এই জন্মান্তরের ছন্দ গাঁথা।

মৃগনয়নী একবছর পরেও তাই ভাবছে, এই ত সেদিন প্রথম মদ খেয়ে এলে বনবিহারী। আজও মদ খেয়ে এসেছে। মৃগনয়নী কাঁদেনি, করুণা ভিক্ষেও চায়নি এর জন্যে কারো কাছে। না, কারো কাছে না।

মাস আষ্টেক আগে এসেছে বুড়ী শাশুড়ী আর প্রমদা সুন্দরী। ও বাড়ীতে এসেছে। ভাশুরের বাড়ী। এ বাড়ীতে আজ পর্যন্ত একবার দেখা করতেও আসেনি এইটেই বনবিহারীকে আবার অস্থির করে তুলল।

ওরা আসবার দিন দশেক পরে বনবিহারী রাত্রে শুয়ে মৃগনয়নীর কাছে বললে,—মা একবার এলো না!

মৃগনয়নী গম্ভীর হয়েই বললে—এলো না নয়, আসতে দিলো না।

—কে?

—তোমার বোন, আর নতুন বৌঠান।

—তাই বলে একবারও আসবে না?

মৃগনয়নী বনবিহারীর কণ্ঠে বেদনার আভাস পায়।

বলে,—তবে আমি কাল যাই।

—না।

—কেন, শাশুড়ীর কাছে বৌ যাবে, এতে দোষের কি?

বনবিহারী রোগা শরীরটা ঝাঁজিয়ে ওঠে,—না। কক্ষনো যাবে না। কক্ষনো না। তাকে আসতে হবে, কদিন না এসে পারে দেখি।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে।

এর পরদিনই সন্ধ্যায় আবার বনবিহারী মদ খেয়ে ফেরে। আজও মৃগনয়নী ওকে ধরে এনে শোওয়ায়। শুয়ে বমি করে ফেলে বনবিহারী। মৃগনয়নী নীরবে সেগুলো পরিষ্কার করে। বনবিহারীকে শুইয়ে দেয়, পাখার হাওয়া করে।

বনবিহারীর মুখে মদের ঝোঁকেও ওই আক্ষেপ।

—একবার দেখতেও এলো না! মরলুম কি বাঁচলুম একবার দেখবার দরকার নেই! আচ্ছা, আমিও দেখে নেব!

মৃগনয়নীর ঠোঁট দুটো কঠিন ইস্পাতের পাতের মত। একটুও নড়ে না।

সেই থেকে বনবিহারী আবার মদ ধরল। মৃগনয়নীর মনটা যে কখনও কখনও দুপুরে বেদনার তীব্রতায় না জলে এমন নয়। কিন্তু কোথায় তার প্রকাশ নেই। কোথাও না।

মনে হয় পুঁটিদির কথা। দিদির কথা। তাদের কথা মনে হলে তার বেদনা অবও সুতীব্র হয়ে ওঠে।

পুঁটিদির চিঠিখানা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। তিনমাস আগে এক নিস্তব্ধ দুপুরে এলো চিঠিখানা। লালচে বালির কাগজ। দুপাশে ছেঁড়া। বড় বড় হরফে কি ভয়াবহ লেখা! অক্ষরগুলো যেন মাথার ভেতব নাচে।

পুঁটিদির চিঠি। ছোট চিঠি অথচ কি সাংঘাতিক। পরিষ্কার খবর, একটু এদিক ওদিক করে লেখা নয়। সহজ করে লেখা।

এমন ভীষণ কথা এত সহজ করে কেউ যে লিখতে পারে ধারণাও করতে কষ্ট হয়।

পুঁটিদি কি পাষাণ হবে শেষে? পাথরের শিবপুজো করে করে পাথর হয়ে গেছে পুঁটিদি। কি নিষ্ঠুর ভাষা! কথাগুলো চোখের সামনে আবার দেখতে পায় মৃগনয়নী।

পুঁটির হাতে বড বড় হরফে লেখা।

"এ চিঠি কাহাকেও দেখাইও না। নায়েব মশাইয়ের বাড়ীর মেয়েদের মুখে শুনিলাম, মায়ের ও খুড়ীমার চোখের জলেও বুঝিলাম, তরঙ্গিণী দিদির প্রসব খুবই গোপনে হইতেছিল। প্রসবে নিদারুণ যন্ত্রণা শুরু হয়। যন্ত্রণা বুকের উপর উঠিতে থাকে। চীৎকারের ভয়ে তাহার মুখ চাপিযা রাখা হইয়াছিল। তবুও নাকি জল খাইতে চাহিয়াছিল। কেহই জল দেয় নাই। শেষ পর্যন্ত ধনুষ্টংকারের মত হওয়ায় তাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। নিদারুণ যন্ত্রণায় হতভাগিনী মরিয়াছে। মরিয়া বাঁচিয়াছে। আমাদেরও বাঁচাইয়াছে। তবু খুড়ীমার চোখে জল দেখিলাম। মুখে কাপড গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি হইলে কাঁদিতাম না।"

পুঁটিদি কি পাষাণ! মৃগনয়নী দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদেছিল। অনেক কেঁদেছিল।

দিদির মুখখানা চোখের সামনে থেকে কিছুতেই যেন যেতে চায় না। সেই মুখ। সেই কথা।

'একটু কাসুন্দি দিয়ে আম মেখে খাওয়াবি?'

'আমি জানি তোরা আমায় ঘেন্না করিস।'

'আমি অন্যায় ত' কিছু করিনি?'

চোখের জলে গাল ভেসে যায়। বার বার মনে মনে চীৎকার করে বলে, তোকে ঘেন্না করি না দিদি। বিশ্বাস কর। তোকে ভালবাসি।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল মৃগনয়নী। অজস্র।

তরঙ্গিণীর নীল ওষ্ঠাধর ম্লান মুখখানা ভেসে ওঠে আবার চোখের সামনে। কাশী নিয়ে যাবার আগে কি চেহারাই দেখেছিল মৃগনয়নী।

ধীরে ধীরে স্থির হয়ে এলো ও। মনে হোল বাবার কথা। বাবা নিশ্চয়ই এ খবর শুনেছেন। শুনে কি করলেন দেখতে ইচ্ছে হয়। দেখতে ইচ্ছে হয় বাবার মুখখানা। খবরটা হয়ত রাত্রে খেতে যাবার সময়ই পেয়েছিলেন। হয়ত ভাত আর খেতে পারেন নি। নীরবে উঠে গিয়েছিলেন। একটি দীর্ঘশ্বাস হয়ত পড়েছিল। তারপর জপে বসলেন সমস্ত রাত।

মৃগনয়নীর মনটা শীতল হয়ে আসে। ঠাণ্ডা শান্ত এক জোড়া চোখ সস্নেহে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওর বাবার চোখ।

মন যখন আর নিজের বশে থাকে না—অশান্ত আবেগে নিদারুণ চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন একমাত্র রামতারণের চিন্তা ওকে শান্ত করে তোলে। কেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

বুঝেছিল। অনেক পরে বুঝেছিল মৃগনয়নী। রামতারণের ওপর ওর পরম নির্ভরতা ওকে অত শান্ত করে। রামতারণের প্রশান্ত মনের ছোঁয়া লাগে ধ্যানের মাধ্যমে। এমনিই হয়।

একমাত্র ওই ধ্যানেই যেন মৃগনয়নী অনেকটা পায়। আর সবই বড় তুচ্ছ মনে হয় তখন। মনে হয়, এই ত সেদিন ছিল, আজ নেই। পাওয়া আর হোল না।

জীবনের এতগুলো বছরে ঠিক-ঠিক পাওনা যে কোথায় তাই কি ছাই বুঝতে পারত মৃগনয়নী।

দ্বিতীয় ছেলেটি হবার পর থেকে ওর শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। তার ওপর শুরু হয়েছে বনবিহারীর অত্যাচার। অত্যাচারই ত?

সকালে উঠে যখন বলে,—এত অত্যেচার করছ কেন বলত?

বনবিহারী অপিস যাবার জন্যে তৈরী হয়। হাসে, বলে,—কই। কিছু ত' করিনি?

—ওই ছাই পাঁশ গিলে এলে কতকগুলো?

বনবিহারী চুপ করে থাকে। একটু কাছে আসে মৃগনয়নী ছোট ছেলেটিকে কোলে নিয়েই।

—আর খেয়ো না ওসব।

বনবিহারী কথা বলে না। শুধু তাকায় একবার।

—বলো আর খাবে না?

ছেলেটা হাত বাড়িয়ে জামাটা ধরে বনবিহারীর। ও ম্লান হেসে আবার তাকায়।

—একটু অস্পষ্ট ভাবে বলে,—কি যে হয় সন্ধ্যেবেলা। মানে আমি কি ইচ্ছে করে খাই!

—কি হয়?

ছেলেটার গালে হাত দিয়ে আদর করতে করতে বলে বনবিহারী,—কি হয় আমি কি জানি? সন্ধ্যেবেলাটা মানে—।

মৃগনয়নী বলে,—সন্ধ্যের আগে না হয় চলে এসো।

—কাজ থাকে যে!

—তবে কাজ করেই চলে এসো।

—কাজ করে শরীরটার ভেতর কেমন যে করে—।

—কেমন?

—মানে হাত পা যেন অবশ হযে আসে।

—তবে ডাক্তার দেখাও।

—ডাক্তার কি করবে। মানে ওই সময় একটু মদ খেলে বেশ তাজা লাগে।

—না, মদ খাবে না।

—সত্যি কথা বলব?

—বলো।

—মানে ওই মেজদাকে অপিসে দেখলেই আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়।

—কেন, মেজভাশুর তাঁর মত কাজ করুন, তুমি তোমার মত কাজ করো।

—তা নয়। আমি ক্যাশে কাজ করি। মেজদা টাকা নিতে আসে। ওকে দেখলেই—

—দেখলেই কি?

—মানে খুব রাগ হয়ে যায়।

—তারপর?

—তারপর কাজ শেষ হবার পর শরীরটা অবশ লাগে।

মৃগনয়নী বলে,—ও সব ছুতো। ইচ্ছে থাকলেই না খেয়ে বাড়ী চলে আসতে পারো।

—তাছাড়া—।

—তাছাড়া উপরি টাকাও থাকে পকেটে।

—ওইটেই আসল কথা।

বনবিহারী হাসে। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসে। ছেলেটাকে কোলে নেয়।

মৃগনয়নী আর কথা বলে না। গম্ভীর হয়ে থাকে।

বনবিহারী আস্তে আস্তে জুতো পরে অপিসে বেরিয়ে যায়।

কি যে করবে মৃগনয়নী কিছু ঠিক করে উঠতে পারে না। ও নিশ্চিত বোঝে যে কোন খারাপ সঙ্গে পড়েছে বনবিহারী। মানুষটা বড্ড সরল, ভাল মানুষ। অন্য কোন শয়তান লোক ওকে হাত করে ফেলেছে হয়ত। বনবিহারী কি নির্ভরই না করত মা কালীর ওপর। দেশে থাকতে অনেক কথাতেই মায়ের কথা বলে ফেলত। এখনও যে ওদিকটা একেবারে উঠে গেছে তা নয়।

এখনও সকালে মায়ের পটের কাছে বসে। সন্ধ্যা গায়ত্রী করে মায়ের নাম করে। কিন্তু সন্ধ্যায় বোধকরি কিছুই মনে থাকে না। কারো কথা মনে থাকে না। কারো কথা নয়।

শুধু এইই নয়। দিনকতক পরে লক্ষ্য করে মৃগনয়নী বনবিহারীর ফিরতে বেশ রাত হয়। অনেক রাত্রে ছেলে দুটিকে ঘুম পাড়িয়ে দরজাটা খুলে অন্ধকার গলিটার দিকে তাকিয়ে থাকে মৃগনয়নী। আরও বেশী রাত হলে দরজাটা বন্ধ করে বসে থাকে। দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শোনবার আশায়।

গভীর রাত্রে বসে থাকতে থাকতে ঝিমিয়ে পড়ে। হয়ত কোনদিন কমলির মা ঘর থেকে বেরোয় কলতলায় যাবার জন্যে। অন্ধকারে ওকে ভাল করে ঠাওর করতে না পেরে পিছিয়ে যায়।

—কে ওখানে?

মৃগনয়নী চমকে ওঠে। বুকটা কেঁপে ওঠে।

—আমি।

নারীকণ্ঠ শুনে আশ্বস্ত হয় কমলির মা।

—আমিটা কে বাছা?

—আমি গো দিদি!

মৃগনয়নী এগিয়ে আসে। কমলির মা একটু সমীহ করে তাই রক্ষে। অন্য কেউ হলে চীৎকার করে বাড়ী ফাটাত।

সমীহ করবার কারণটা আর কিছু নয়, মৃগনয়নী অনেক সময় ওকে দুচার আনা ধার দেয়। কমলিকে মাঝে মাঝেই খাইয়ে দেয়। সময়ে অসময়ে চাল ডালও ধার দিতে হয়। ধার শোধ আর হয় না। মৃগনয়নী জানে শোধ হবে না।

গলাটা তাই একটু নরম করে বলে কমলির মা,—এত রেতে হেথায় কেন দিদি?

মৃগনয়নী হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারে না।

কমলির মা বলে,—বুঝেছি। কর্তা বুঝি ফেরেনি এখনও?

মৃগনয়নী কোনমতে বলে,—না।

নিজের মনেই বলে কমলির মা,—ঝাঁটা মারো! মিনসেগুলোর একটু আক্কেলও নেই গা।

মৃগনয়নীর দিকে তাকিয়ে বলে,—তুমি বরং ওপরে যাও দিদি, কড়া নাড়লে আমি দোর খুলে দোব!

মৃগনয়নী আপত্তি জানালো,—থাক্, আমার ঘুম পাচ্ছে না।

কমলির মা কলতলায় চলে যায় এবার। মৃগনয়নী বসে থাকে। কমলির মা আর কথা বলে না। ঘরে ঢোকে। খিল কিন্তু দেয় না।

মৃগনয়নী বসেই থাকে। আরও অনেক পরে দোরে ঘা পড়ে। বুক কাঁপতে থাকে মৃগনয়নীর। কে জানে কি অবস্থায় এলো! ভয়ে ভয়ে দরজাটা খোলে।

বনবিহারীই এসেছে। টলছে দরজার চৌকাঠ ধরে। মৃগনয়নী সরে দাঁড়ায়। বনবিহারী ভেতরে ঢোকে। পিছন দিকে না তাকিয়ে সোজা চলে।

মৃগনয়নী অন্ধকারে একটু সময় দাঁড়ায়। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দেয়। খুব আস্তে আস্তে। কে জানে কমলির মা টের পেয়েছে কিনা!

ভাগ্যিস চেঁচায়নি বনবিহারী। চুপ করে উঠে গেল ওপরে। মৃগনয়নীও ওপরে গেল। বনবিহারী ঘরে ঢুকল। পিছন পিছন গিয়ে মৃগনয়নী ধরল ওকে। জামাটা খুলে দিল। জুতো খুলল। বনবিহারী বিছানার ওপর বসে পড়ল।

কাছে গিয়ে বসল মৃগনয়নী। বনবিহারী ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল শুধু। হাসিটা বড় বিশ্রী। গা'টা শিরশির করে ওঠে মৃগনয়নীর।

একটু ইতস্তত করেও জিজ্ঞেস করে,—কোথায় ছিলে এতরাত?

বনবিহারী লাল চোখদুটো বড় বড় করে তাকায়।

মৃগনয়নীর ভয় করে একটু। তবু আবার জিজ্ঞেস করে,—কোথায় ছিলে ?

—সত্যি শুনবে ?—আবার সেই রকম হাসি।

লাল টকটকে চোখে ক্রূর হাসি। এমন হাসি কখনও বনবিহারীর চোখে দেখেনি মৃগনয়নী। সরল মানুষ বনবিহারী। সহজ হয়ে হাসতে জানে। কিন্তু এ কি রকম?

মৃগনয়নী শঙ্কিত হলেও সহজ হবার চেষ্টা করে একটু হেসে বলে,—অপিসে ত আর এতরাত অব্দি থাকো না ?

—না।

—তবে নিশ্চয়ই কারো বাড়ী যাও ?

—তাই ত যাই।

—সেখানে গিয়ে ওই ছাই পাঁশগুলো গেলো ?

—তাই গিলি।

—কার বাড়ী যাও শুনি ? অপিসের কোন বন্ধু ?

—না। তবে বন্ধু সঙ্গে থাকে।

আজ বনবিহারী খানিকটা প্রকৃতিস্থ আছে।

—বন্ধু কোন্‌টি ?

—এখানে কাছাকাছিই থাকে।

—নাম কি ?

—সুরেনবাবু। সুরেন নাগ।

—তার কি কেউ নেই সংসারে ?

—একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে। পরিবার মারা গেছে।

—আপদ গেছে। বেঁচেছে।

বনবিহারী আবার হাসে,—তার সঙ্গে কোথায় যাই জানো ?

—কোথায় ?

—মেয়েমানুষের কাছে।

বুকের ভেতরটা যেন ভারী হয়ে ওঠে হঠাৎ।

গলাটা একটু পরিষ্কার করে বলে মৃগনয়নী,—তার নাম কি ?

—শোভা।

—কেন যাও ?

—সে তুমি বুঝবে না।

ঘৃণায় গায়ে কাঁটা দেয়। তবু এগিয়ে আসে বনবিহারীর কাছে।

বলে,—তাকে ভালবাস?

—না, ঠিক ভালবাসা নয়।

—তবে কি?

—একটা কেমন নেশার মত। ভাল লাগে যেতে।

মৃগনয়নীর ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস করে, তখন আমার কথা মনে পড়ে না? কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ঘৃণা হয়। এ কথা সে মরে গেলেও জিজ্ঞেস করতে পারবে না। চোখ দুটো জ্বালা করে—কিন্তু জল আসে না চোখে।

ভাল করে দম নিতে পারে না। ঘেমে ওঠে মৃগনয়নী। পাশে ছেলে দুটি ঘুমোচ্ছে।

ওদের দিকে আঙুল দেখিয়ে শুধু বলে,—ওদের কথা মনে হয় না?

বনবিহারীর মুখটা একটু ম্লান হয়। বলে,—না কারো কথা মনে হয় না। কি যে হয় তখন তোমাকে বলতে পাচ্ছি না। বললাম ত' তুমি বুঝবে না।

—টাকা দাও তাকে?

—হ্যাঁ দিই। অনেক টাকা দিই।

উপরির টাকা ঘরে বেশী আসে না। যা আসে তাতে মৃগনয়নীর সংসার চলে যায় বটে, কিন্তু জমে না।

—এর পরেও তুমি আমার কাছে আসতে পারো? আমাকে বাঁচতে বলো?

বলতে বলতে মৃগনয়নী উঠে পড়ে। বনবিহারী ওর দিকে তাকিয়ে একটা হাই তোলে। তারপর শুয়ে পড়ে।

মৃগনয়নী জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। আকাশে একটি তারাও নেই। ঘোলাটে মেঘে ঢাকা আকাশ। মৃগনয়নী বাইরের দিকে মুখ রেখে বার বার চোখ মোছে। এর পরেও তাকে বাঁচতে হবে। এই মানুষ নিয়ে তাকে সংসার করতে হবে। সকলের কাছে নিজের স্থান করে নিতে হবে। ঘৃণায় আর ভয়ে বারে বারে শিউরে ওঠে মৃগনয়নী।

এই জীবন বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে তাকে আরও কত বছর কে জানে? কতকাল এমন করে কাটবে কে বলতে পারে? এতকালের আশা সব বিচূর্ণ হয়ে গেল বুঝি। এতদিনের ধৈর্য আর বুঝি রইল না।

সংসারের অবধারিত নিয়মে এক গহ্বরের দিকে এগিয়ে চলেছে যেন মৃগনয়নী।

তবু ভয় পেলে চলবে না। তবু ভেঙে পড়লে চলবে না। সংসারের এমন নিষ্ঠুর অবস্থাকে মেনে নেবে না মৃগনয়নী। কখনই নয়। কিছুতেই না।

কুড়ি

জীবনের এই সময়টায় ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল মৃগনয়নী। রামতারণের প্রশান্ত মনের ছোঁয়াব পাওয়া যে ধৈর্য মৃগনয়নীর ছিল, তা যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

উঠবে না কেন? মৃগনয়নী পরে বুঝেছিল। ধৈর্য ভেঙে পড়া কিছু আশ্চর্য নয়। মেয়েমানুষের জীবনে চরম অপমান চরম বেদনাকে মাথা পেতে নিতে হয়েছিল। বেদনার এই গুরুভার ঠিকমত সয়ে উঠতে পারে নি। অন্যায় কিছু নয়। আশ্চর্য নয়। তবু এ সত্য সে বুঝল কিছুদিনের ভেতরই যে বিভ্রান্ত হয়ে লাভ কিছু হয় না। লোকসান ছাড়া। আবার শান্ত হয়ে এলো সে।

মাসকয়েক হোল বনবিহারীর সঙ্গে ও কথা বলতে পারত না ভাল করে। ইচ্ছে হোত না। ভাল লাগত না। নেহাত যে কথা না বললে নয়। সেই কথাটুকুই বলত।

বনবিহারীও ওর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে যে খুব ব্যস্ত ছিল তা নয়। মৃগনয়নীর গাম্ভীর্যটা লক্ষ্য করবার মত মনের অবস্থাই হয়ত ছিল না।

সকাল বেলা বেরিয়ে যেত। অপিসে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ওই সন্ধ্যাটুকুর জন্যে যেন উন্মুখ হয়ে থাকত। ওই সন্ধ্যাটুকুই ওর সমস্ত মনকে সমস্ত চিন্তাকে ভরে রেখেছিল। মৃগনয়নীর দিকে নজর দেবার সময়ই বা কোথায়?

তবু কখনও কখনও সকালে উপরি টাকা থেকে মৃগনয়নীকে যখন কিছু টাকা দিত, তখন হয়ত বলত,—আজ রাত্রে একটু মাংস রেঁধো।

মৃগনয়নী টাকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত কিছুক্ষণ।

হয়ত বলত গম্ভীর মুখেই,—রাত্তিরে কি আজ খাবে?

—কেন খাবো না?

—মাঝে মাঝেই ত খাও না।

বনবিহারী হাসত।—মাঝে মাঝে! কি যে বলো! মাসে দু একদিন হয়ত খাই না।

কথাটা সত্য নয়। মৃগনয়নী বুঝেও কিছু বলত না। বৃথা কথা বলার আর প্রয়োজন নেই। মনের কোথায় যেন একটা জ্বালা অনুভব করত শুধু। এই জ্বালাটাই সবচেয়ে কষ্ট দিচ্ছে ওকে আজকাল। কথা কম বলছে তাই রক্ষা, নইলে হয়ত ফেটেই পড়ত অনেক আগে।

তবু শেষ রক্ষা করতে পারল না। একদিন অনেক কথা বলে ফেলতে হোল।

সেদিনটা নিশ্চিত ভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে ওর জীবনে। কিছুই হয়ত হোত না, যদি না সুরেনবাবু আসত সেদিন আর তার পেছনে একটু দূরে গাড়ীতে বসে থাকত সেই মেয়েটা—শোভা।

সেদিন অপিসের অতিরিক্ত কাজেই হয়ত বনবিহারী সুরেনবাবুর কাছে যেতে পারেনি। হয়ত সুরেনবাবু অনেক সময় অপেক্ষা করে একেবারে বাড়ীতেই খোঁজ করতে এসেছে। গাড়ীতে রয়েছে মেয়েমানুষটি। ইচ্ছেটা বনবিহারীকে তুলে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যাবে।

বনবিহারী যে পরিমাণ টাকা ঢালছে আজকাল, তাতে ওকে এক সন্ধ্যাও উপেক্ষা করা চলে না। সুরেনবাবু একটু মত্ত অবস্থাতেই এসেছিল।

একটু ভুল করেছিল সুরেনবাবু। সেটা ধরা পড়ল কিছুক্ষণের ভেতরেই।

সুরেনবাবু লোকটি খুব পাতলা। একটু দুর্বলও যেন। চলতে চলতে পায়ের টাল সামলাতে পারছিল না। দোরের সামনে এসে কড়া নাড়ল। মোটা ভাঙ্গা গলায় ডাকল।—বনবিহারী আছো হে! বনবিহারী!

মৃগনয়নী ছোট ছেলেটিকে ঘুম পাড়িয়ে বড়টিকে পড়তে বলছিল। কমল কিছুতেই পড়বে না। খিদে পেয়েছে। খেতে চাইছে।

সন্ধ্যা থেকে মনটা ভাল নেই। কমলের পিঠে দু চার ঘা দেবে কিনা চিন্তা করছে এমনি সময় ডাকটা কানে এল। নীচে নেমে দোরের কাছে এল।

মটকা ঢলঢলে পাঞ্জাবি পরে দোরের বাইরে দাঁড়িয়েছিল সুরেনবাবু। দোরের একেবারে সামনে চলে এল মৃগনয়নী। মাথায় ঘোমটা নেই। হয়ত বা খেয়াল ছিল না।

বললে,—কাকে চাইছেন?

—বনবিহারী আছে?

মুখের গন্ধটা বাতাসে ভেসে নাকে আসতেই টের পেল, মাতাল।

—না, উনি নেই।

বলে কি খেয়াল হল মৃগনয়নী একটু মুচকি হেসে বললে,—আপনিই বুঝি সুরেন বাবু?

সুরেনবাবু বিগলিত হয়ে বললে,—ধরেছেন ঠিক। আমিই সুরেনবাবু।

—আপনার সঙ্গে বুঝি আজ ও বেরোয় নি।

—রাম বলো! তবে কি আর এখানে আসতুম! বনবিহারী কই? লুকিয়ে আছে বোধ হয়?

মৃগনয়নী একটু চুপ করে থাকে। মাথার তালুটা জ্বলতে থাকে ওর।

সুরেনবাবু মৃগনয়নীর রক্তাভ মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে বলে,—আপনিই বুঝি বনবিহারীর ইয়ে মানে ওয়াইফ মানে গিয়ে স্ত্রী?

মৃগনয়নী উত্তর দেয় না। মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে। হঠাৎ বলে,—একটা কথা বলব আপনাকে?

—বলুন। বলবেন বই কি।

—আমার স্বামীকে আপনি নষ্ট করছেন কেন বলুন ত'?

—আমি?—একটু অপ্রস্তুতে পড়ে যায় সুরেনবাবু,—মানে আমি! ও ত নিজে নিজেই ইয়ে করে। বিশ্বাস না হয় ইয়েকে জিজ্ঞেস করুন।

—কাকে?

—ওই যে গাড়ীতে বসে আছে। শোভাকে।

মৃগনয়নীর মাথাটা ঘুরে যায়। মেয়েলোকটিও এসেছে?

বলে মৃগনয়নী,—ওঁকে একবার ডেকে দেবেন?

—নিশ্চয়ই। এ আর বলতে?

সুরেনবাবু টলতে টলতে গিয়ে বাড়ীর সামনে কি বলে। একটু সময় বচসা শোনা যায়। তারপর একটি মেয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে।

বয়স খুব বেশী নয়। সুশ্রী বলা যায়। দামী শাড়ী। গা ভর্তি গয়না।

আসতে আসতে সুরেনবাবুকে জিজ্ঞেস করে,—কে ডাকছে?

—ওই যে ইয়ে। যাও না?

সামনে মৃগনয়নীকে দেখে মেয়েটি চমকে ওঠে। ও বোধহয় ভেবেছিল বনবিহারী ডাকছে। নিশ্চয়ই সুরেনবাবু ভেঙে বলেনি কে ডাকছে।

মৃগনয়নী একটু এগিয়ে খপ করে ওর হাতটা ধরে বলে,—এসো দিদি।

মেয়েটির মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। অবাক হয়ে তাকায়। একটু বা ভয়ও পায়। ব্যাপারটা একটু একটু বুঝতে পারে ক্রমশঃ।

—এসো ভেতরে।—মৃগনয়নী ওকে টানে।

মেয়েটি জোর করে বলে এতক্ষণে,—না, ভেতরে যাব না। আপনি কে?

মৃগনয়নী হাসে,—এসো না। ভয় নেই।

ওকে নিয়ে প্রায় জোর করে দোতলায় নিয়ে আসে। ওপরে ঘরে এসে মেয়েটি দাঁড়িয়ে থাকে।

—বোস।

—না।

—রাগটা কিন্তু উল্টো হচ্ছে। আমারই তোমার ওপর রাগ হবার কথা।

—কেন?—মেয়েটি এবার ভ্রূ কোঁচকায়।

—কেন নয়। বলে, একটা নিশ্বাস ফেলে মৃগনয়না।

বলে,—আচ্ছা সংসার ভাঙাই বোধহয় তোমার কাজ?

—কি বলতে চান আপনি?—মেয়েটি এবার ফোঁস করে ওঠে।

—বলতে চাই কতগুলো সংসার আজ পর্যন্ত ভেঙেছ?

মেয়েটি বেশ নির্ভীক ভাবেই ঠোঁট উল্টে বলে এবার,—অনেক। কিন্তু আমাকে ডেকে এনে এসব কথা বলবার মানে?

—মানে আমার স্বার্থ রয়েছে পুরোপুরি।

—কথাটা খুলে বললে ভাল হয়।

মৃগনয়নীর মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে। বলে,—বলব বলেই ডেকেছি। বনবিহারী-বাবুকে তোমার ছাড়তে হবে।

মেয়েটা মৃগনয়নার দিকে তাকায়।

একটু চমকায় হয়ত বা। কিন্তু পরমুহূর্তে সেও কঠিন স্বরেই বলে—কেন, আপনার হুকুমে?

—হ্যাঁ। আমার হুকুমে।

মৃগনয়নীর দিকে তাকিয়ে মেয়েটিও এবার একটু হাসে।

হেসে নিজের চুড়িগুলো নেড়ে চেড়ে দেখতে দেখতে বলে,—এগুলো বনবিহারীবাবু গেল মাসে গড়িয়ে দিয়েছে।

চুড়ির ঝিলিক তীক্ষ্ণ ঝকঝকে ফলার মত বেঁধে মৃগনয়নীর বুকে।

মেয়েটি বলে,—এর পরেও ওকে ছাড়তে বলেন ?

—হ্যাঁ। বলি। আমার সর্বনাশ করে তোমার কি লাভ ?

—লাভ ? ওই যে বললুম। চুড়ি বারগাছা প্রায় দশভরি।

—শুধু সোনা আর টাকা ?

—হ্যাঁ তাইই।

—বেশ, তবে আমি তোমায় কথা দিচ্ছি। মাসে মাসে এসে আমার কাছ থে টাকা নিয়ে যেও। আমার সব গয়না নিয়ে যাও।

—কি, ভিক্ষে ?

—ভিক্ষে নয়। তোমার দয়া পাবার আশায়।

মেয়েটি বলে,—দয়া আমরা করতে ত শিখিনি ভাই। ও সব কথা প্রায় ভুলে গেছি। আচ্ছা, চলি।

মৃগনয়নী আটকায় ওকে। মরিয়া হয়ে উঠেছে মৃগনয়নী।

—তুমি কি চাও বলো ?

মেয়েটি বেশ সহজ ভাবেই বলে,—বনবিহারীবাবুকে চাই।

মৃগনয়নী ফুঁসিয়ে ওঠে।—পরের মানুষ নিয়ে তোমরা ব্যবসা কর। লোকে সর্বনাশ করে ব্যবসা করো। তোমাকে দেখে ঘৃণা হচ্ছে। তবু অনুরোধ করছি,—

—অনুরোধ করবেন না। শুধু ঘৃণাই করুন।

মৃগনয়নী আরও কি বলতে যাচ্ছিল, থমকে যায়।

মেয়েটি এগোয়। বলে,—সামনের মাসে আপনার চাল কেনবার টাকাও যাতে ঘরে না আসে, সে ব্যবস্থা করতে ভুলব না।

মৃগনয়না আর কথা বলতে পারে না। অসহায় চোখদুটো মেলে তাকিয়ে থাকে।

বেরিয়ে যায় মেয়েটি সগর্বে। বেরিয়ে যাবার পর অনেকক্ষণ নড়তে পারে না মৃগনয়নী। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকক্ষণ। মাথাটা কেবলি ঝিমঝিম করে। ঘরে এসে জল খায় এক গেলাস। দেখে বড় ছেলে কমল খিদেয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর পাশেই শুয়ে পড়ে মৃগনয়নী। ছেলেকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। বুকের কাছে এনে চেপে ধরে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মৃগনয়নী। কেন সে সেধে ঘরে অপমান ডেকে আনল কেন সে একটা বেশ্যার কাছে এত কথা শুনল ?

সংসারে বিচার নেই। ফুলে ফুলে কাঁদে মৃগনয়নী।

কমল ঘুম থেকে জাগে। মাকে বলে,—কাঁদছ কেন মা?

আরও কাঁদে মৃগনয়নী। কমল মাকে জড়িয়ে ধরে।

কখন যে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে টের পায়নি ওরা। বনবিহারীর গলার আওয়াজ শুনে মৃগনয়নী জাগে।

বনবিহারী জামাটা খুলতে খুলতে বলে,—উঃ! অপিসে আজ যা কাজ পড়েছিল!

মৃগনয়নী তাকায়। কথা বলে না। মনে মনে একটু শঙ্কিত হয়। রান্না কিছু হয়নি এখনও। কি খাবে বনবিহারী? খিদের সময় খাবার পাবে না, এটা কি ঠিক হবে?

রান্না সে করতে পারবে না। থাক না খেয়ে। তার একটু মায়া নেই আর। তীব্র অভিমানে চুপ করে বসে থাকে মৃগনয়নী।

বনবিহারী জামা খুলে একটা বিঁড়ি নিয়ে বসে।

—গামছা দাও।

মৃগনয়নী চুপ করে বসে থাকে।

—কই গামছাটা দাও। হাতমুখ ধোব।

মৃগনয়নী কথা বলে না।

—কি হোল তোমার?

মৃগনয়নী নীরব।

একটু রেগে ওঠে বনবিহারী,—নাঃ! খেটেখুটে এসে এমন হাঁড়ির মত মুখ দেখতে ভাল লাগে না।

এবারে বলে মৃগনয়নী,—যার মুখ দেখতে ভাল লাগে, সেখানে গেলেই পারতে?

চটে ওঠে বনবিহারী, সেখানেই গিয়েছিলাম, তাকে পাইনি বলেই এসেছি।

—কি করে পাবে? সে যে এখানে এসেছিল।

—তাই নাকি?—বনবিহারী হঠাৎ যেন নরম হয়ে গেল।—এসেছিল?

—হ্যাঁ।—মৃগনয়নীর স্বরটা খুব রুক্ষ।

—খোঁজ করেছিল বুঝি?

—হুঁ।

—সঙ্গে কে ছিল ?

—স্থরেন মাতাল।

—খেয়েই এসেছিল ?

বনবিহারীর চোখে এক কদর্য লোভের জ্বলজ্বলানি লক্ষ্য করে মৃগনয়নী।

—কিছু বললে বুঝি ?

মৃগনয়নী ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে,—আমিই বললুম।

—তুমি কি বললে ?

মৃগনয়নী ওর এত আগ্রহে হঠাৎ চটে যায়,—আদর করে এনে ঘরে বসালুম ভেবেছ বুঝি ? লোকটা যে আমার হাতে মার খায়নি এই ভাগ্যি।

—মার ! তুমি মারবে ?

—হ্যাঁ। কেন মারব না ? আর কত সইতে বল ? বেশ্যাটিকেও ভেবেছিলাম ঘরে বন্ধ করে মারব। মাথা হোল তাই ছেড়ে দিলাম।

—শোভাকে নিশ্চয়ই অপমান করেছ ?

—তবে কি ভালবাসব ?

বনবিহারী এবার গর্জে ওঠে,— আলবত ভালবাসবে। আমি যাকে ভালবাসি, তাকে তোমার ভালবাসতে হবে।

ঘৃণায় ভ্রূ দুটো কুঁচকে মৃগনয়নী বলে,—তুমি ভালবাস। আমার সামনে বলতে লজ্জা হোল না ?

—কিসের লজ্জা। যাকে ভাল লাগে। মিথ্যে খারাপ লাগে বলতে যাব কেন ?

মৃগনয়নী মুখ ফিরিয়ে রইল।

বনবিহারী বলে,— কি অপমান তাকে করেছ বলো ?

—বলব না।

—বলতে হবে।

—কিছুতেই বলব না।

—তোমার ঘাড় বলবে। বল বলছি।

মৃগনয়নী নীরব।

—বলো ?

চুপ করে আছে মৃগনয়নী।

—ভয়ানক খারাপ হবে বলছি।

তবুও কথা নয়।

—খুন করে ফেলব।

একটা রা নেই মৃগনয়নীর মুখে।

বনবিহারীর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায় এতক্ষণে।

—তবে রে।—বলতে বলতে মৃগনয়নীর নাক আর মুখের ওপর বেশ জোরে গোটা কতক চড় মেরে বসে।

দাঁতে লেগে ঠোঁটটা কেটে যায় মৃগনয়নীর। গালের কস বেয়ে রক্ত পড়তে থাকে। তবু একটা কথা নয়। একটু শব্দ নয়।

বনবিহারী গর্জাতে থাকে,—বল বলছি। নইলে খুনই করব আজ।

মৃগনয়নী পাষাণের মতই বসে আছে। বড় ছেলে কমল জেগে ওঠে। বাবার হুংকারে ভয় পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে। ছোট ছেলে অমল জেগে উঠে কাঁদতে থাকে।

নীচু থেকে কমলির মা ওপরে উঠে আসে। ভবানীর মা জানালা দিয়ে উঁকি দেয়।

ডাক্তারের বউ বীণা ভবানীর মাকে ইশারায় জিজ্ঞেস করে, ব্যাপার কি!

ভবানীর মা ইশারায় বোঝায়,—বোধহয় মদ গিলে এসে ঠ্যাঙাচ্ছে।

বনবিহারী ওদের সামনেই গর্জন করে চলেছে। হঠাৎ গিয়ে মৃগনয়নীর গলাটা চেপে ধরে। মৃগনয়নী উপুড় হয়ে পড়ে যায়।

কমলির মা বাইরে থেকে ঘরে ঢুকে পড়ে। বনবিহারীর দিকে তাকিয়ে বলে।—একেবারে মরে যাবে যে! কি কচ্ছেন আপনি?

বলে মৃগনয়নীকে সাপ্‌টে নেয় নিজের কোলের কাছে।

অন্য স্ত্রীলোক দেখে বনবিহারীর সংবিৎ ফিরে আসে। ওদিক থেকে চলে এসে জামাটা গায়ে দেয়। জুতো পরে। হনহন করে বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে।

কমলির মা বনবিহারীর যাবার দিকে তাকিয়ে বলে,—অ! মিনসের আবার রাগ! অমন সোয়ামি থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি! ছ্যা, ছ্যা! এমন করে মারে গা! নিজের ইস্তিরি!

মৃগনয়নীর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, কেঁদো নি বাছা! অমন কত মার খেইচি! একদিন উল্টে গুঁতো লাগালুম বলেই ত' পাইলে গেল।

বলে আবার,—কমলির পর একটা মেয়ে পেটে এল। একদিন পেটে এমনধারা

লাথি মারলে, একবারে বেহুঁশ। পেটের ভেতর বাচ্চাটা মরেই গেল। শেষকা
আমার পেরান নিয়ে টানাটানি। তারপর থেকে মারতে এলেই উল্টে মারতু
তবে মারের রোগ গেল! তারপর কি যে হোল!—

কমলির গলাটা একটু ধরে আসে। কত বছর আগে কমলির বাবার কথা স্ম
করবার চেষ্টা করে। কি একটা যে হয়েছিল। সেটা বড় গোপন। কাউকে ব
যায় না। কাউকে নয়।

কমলির মায়ের চোখদুটো একটু জোলো জোলো দেখায়।

মৃগনয়নী তেমনি উপুড় হয়েই পড়ে থাকে। ভবানীর মা আসে এবার ঘরে
ডাক্তারের বউ বীণাও।

—কি হোল গা?

—কি আবার! কতায় কতায় বাবুর মেজাজ বিগড়ে গেল, মারতে লাগল
আমি এসে পড়েছিনু তাই রক্ষে! নইলে থানা পুলিশে রমারম লেগে যে
এ্যাতক্ষণে। বললে কমলির মা।

একটা হাই তুলে বলে ভবানীর মা,—আমি আবার একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল
কিনা?

—কই ঘুমোলে বাছা, দেখনু ত' জানলায় দাঁইড়ে আচো।—বলে কমলির মা।

—ভবানীর মা ধরা পড়ে কথা ঘোরায়,—সেত এই মাত্তর? যাক্। বেশী কি
হয়নি এই ভাল।

আর একটা হাই তুলে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরোয়। পেছন পেছ
বীণা।

বীণা একটু অল্প বয়েসী। একটু লাজুক। এদের ভেতর সব চেয়ে সুন্দরী।
এসেছিল একটু মজা দেখতে। নীরবে চলে গেল। ব্যাপারটা মৃগনয়নীর ক
থেকেই না হয় পরে শোনা যাবে।

আরও কিছুক্ষণ বসে থাকে কমলির মা? সাধে মৃগনয়নীকে ওঠবার জন্যে
মৃগনয়নী পাশ ফেরে, শুধু বলে—একটু ঘুমোব আমি।

—ওমা একি গো! এ যে রক্তারক্তি কাণ্ড!

কমলির মা আবার বসে পড়ে।

—থাক দিদি।

মৃগনয়নীর গলাটা ভেঙ্গে গেছে। কমলির মা বলে,—তা কখনও হয়!

বলে বাটি করে জল আনে। নিজের আঁচল ভিজিয়ে, ভাল করে মুখ মুছিয়ে দেয়। ঠোঁট ফেটে গেছে। ওপরের ঠোঁট।

মৃগনয়না চুপ করে শুয়ে থাকে। কমলির মা ওকে এক গেলাস জল খাইয়ে মুখ মুছিয়ে তবে উঠে যায়।

রাত তখন অনেক হবে। মৃগনয়নীর চোখে ঘুম নেই। ও ভাবছে কি হোল! ...র কথাটা মনে হয়।—নিজের দোষ দেখো মা। তবেই সংসারে শান্তি পাবে।

দোষ তারও আছে। সে কেন এত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। কেন এত চঞ্চল হয়ে পড়ল। এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে। বিভ্রান্ত হয়ে সংসারে লাভ কিছু হয় না। লোকসান প্রচুর। জীবনে ধৈর্যের প্রয়োজন আছে। কেন সে ধৈর্য হারিয়েছিল। দোষ ...ই। আর কারুর নয়।

রামতারণের প্রশান্ত মুখখানা দৃঢ় করে মনের ওপর এঁকে নেয়। ওই প্রশান্ত ওই ...গ আনতে হবে তার প্রত্যহের আচরণে। তবেই জীবনে সহজ হয়ে চলতে দেখা ...বে! সহজ হয়ে চলা বড় কঠিন। সহজ হওয়া সবচেয়ে কঠিন। এ জীবনের এই ...ধনাই তাকে করতে হবে। এ আঘাতের হয়ত প্রয়োজন ছিল। ভালই হয়েছে।

বারবার প্রণাম জানায় মৃগনয়নী তার উদ্দেশ্যে যে এত কষ্ট দেয়, যে এত সুখ ...য়। যে এত আঘাত করে। যে এত জ্বালায়। যে সান্ত্বনা দেয়, বুঝিয়ে দেয়। ...ন্তরে তার আভাসটুকু আজ যেন পরিষ্কার অনুভব করতে পারে মৃগনয়নী। সে ...ছে। তাই সংসার আছে। তাই জীবন আছে। নইলে জীবনের কোন মানে ...জে পাওয়া যেত না।

জীবনের এই অর্থটুকুর অন্বেষণ কত যুগ ধরে করতে হয়। কত জন্মের পর জন্ম ধরে ...রতে হয়। মৃগনয়নী বারবার প্রণাম জানায় তাকে। দুগাল বেয়ে অজস্র চোখের ...ল পড়তে থাকে ওর।

রাত কেটে গেছে। সে রাত্রে বনবিহারী আসে নি।

মৃগনয়নী সকালে ওঠে। শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছে ...কে। বাবা যেন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কি ঠাণ্ডা করুণ স্পর্শ।

হাসছিল একটু একটু। ফিসফিস করে, বলছিল,—ভয় নেই। কিছু ভয় নেই। ...পেয়ো না। ভয়ই পাপ।

বাবার সেই হাস্যকরুণ চোখ দুটো। শীতল দীপ্তিতে ভরা। মৃগনয়নী রোমাঞ্চিত ...বারবার। জীবনে এই প্রথম বাবাকে স্বপ্ন দেখল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হোল শরীরে মনে যেন একটুও গ্লানি নেই। স মালিন্য মুছে নিয়ে গেছে বাবা। আর ভয় নেই।

সকালে উঠে দৈনন্দিন কাজ সারতে আরম্ভ করে মৃগনয়নী। কমল পড়তে বসে অমলকে একবাটি মুড়ি দিয়ে বসিয়ে রাখে। মনে হয় এক একবার, বনবিহারী কা রাত্রে এলো না কেন? হয়ত কোথাও ছিল। রাগ পড়লেই আসবে। আসতে হবে। দুশ্চিন্তা হয় না বনবিহারীর জন্যে। ভয় হয় না একটুও।

জল তুলে বাসন মেজে ওপরে ওঠে মৃগনয়নী। কমলকে একটা পয়সা দেয় মুড়ি মুড়কি আনতে। সকালের জলখাবার ওদের মুড়ি-মুড়কি। খেতে খেতে পড়তে থাকবে কমল যতক্ষণ না রোদ্দুরটা এসে পড়ে বারান্দা পেরিয়ে চৌকাঠের ওপর এইটেই ওদের ঘড়ি।

চৌকাঠে রোদ্দুর এলেই বুঝবে, এখন স্নান করবার সময় হয়েছে। স্নান করে খে যাবে। ততক্ষণে রান্না হয়ে যাবে মৃগনয়নীর। মৃগনয়নী ওদের জলখাবার দি স্নান করতে নামে।

কলতলার কাছে যেতেই কমলির মাযের সঙ্গে দেখা। হেসে বলে কমলির মা,-কেমন আছো? গা গতরে ব্যথা নেই ত?

—না।—সলজ্জ হাসে মৃগনয়নী।

—কত্তা এসেছিল?

—না।

—ওমা সেকি গো? কোথা রইল?

—ভাশুরের ওখানে থাকতে পারে।

বলে কথাটা চাপা দিয়ে কলতলায় ঢোকে মৃগনয়নী।

স্নান সেরে রান্না। ওদের খাইয়ে ঘুম পাড়ান। তারপর আবার বাসন মেজে কয়লা ভেঙে নিজে খাওয়া। তারপর কোনদিন ভবানীর মা বা কমলির মায়ের সং গল্প করতে করতে বেলা কাত।

আবার যথারীতি সন্ধ্যে এলো। রাত হোল। এলো না বনবিহারী। ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

খোলা বারান্দায় আকাশের নীচে মৃগনয়নী বসে রইল অনেকক্ষণ। দুশ্চিন্তা নয়। কর্তব্যের তাগিদে। হয়ত আসবে মদ খেয়ে—টলতে টলতে। ধরে ওঠালে পড়ে যাবে।

কেমন একটু মায়া হয় বনবিহারীর জন্যে। মনে হয়, ওর কোন দোষ নেই। সময়ের দোষ। অবস্থার দোষ। মনে ওর আর এতটুকু কালিমা নেই।

তাই বারবার মনে হ। মানুষের আর কি দোষ!—ঠিক ওমনি অবস্থায় পড়লে সব মানুষই যে ওই রকম হোত না এমন কথা হলপ করে বলা যায় না!

সুরেনবাবুর দোষই বা কি। আর ওই মেয়েটার, শোভার? হয়ত মানুষ তারা কেউই খারাপ নয়। বাইরের চোখে মানুষকে সব সময় বিচার করতে যাওয়ার মত মূর্খামি আর নেই।

হঠাৎ একসময় চমকে ওঠে। মনে হয় যেন বনবিহারী এসেছে। কাছে দাঁড়িয়েছে।

একি! চমকে মৃগনয়নী কি একটা ভাবে বিভোর হয়ে থাকে। রাত অনেক হয়। বসে বসে ঝিমোয় মৃগনয়নী। উঠে চোখদুটো কচলায় মৃগনয়নী। না। কেউ ত নয়। তবে কি মনের ভুল?

গাটা ছমছম করে। ওঠে মৃগনয়নী। উঠে দাঁড়ায়। দুবার পায়চারি করে। তারপর আস্তে আস্তে নীচে নামে। সদর দরজার কাছে যায়। সবাই ঘুমোচ্ছে। দরজাটা খোলে। একবার গলিটা দেখে। কেউ নেই। না।

ওপাশে কে বসে? ভয়ে একটু পিছিয়ে যায় মৃগনয়নী।

বনবিহারী নয়? ভাল করে দেখে মৃগনয়নী। হ্যাঁ। ঠিক বনবিহারীর মতই মনে হয় যেন। আস্তে আস্তে এগোয়।

—কে?

উত্তরটা আসতে খুব দেরি হয় না,—আমি।

বনবিহারী বসে আছে চুপ করে।

গলিতে নামে মৃগনয়নী।

—একি! এখানে বসে কেন? চলো।

হাত ধরে বনবিহারীকে ওঠায়। নীরবেই ওঠে বনবিহারী।

মদ ত ও খায়নি। একটুও মদের গন্ধ নেই মুখে। ওকে নিয়ে দোতলায় ওঠে। ঘরে নিয়ে বসায়।

কাপড় নিয়ে দেয় বলে,—কাপড় ছাড়ো। ধুলো লেগেছে যে।

—লাগুক।

বনবিহারীর মুখখানা কালো। চোখদুটো যেন অগাধ হতাশায় ডুবে আছে।

—কি হোল তোমার? অমন করছ কেন?

বনবিহারী চুপ করে থাকে।

—আমাকে ডাকেনি কেন?

বনবিহারী একটা নিশ্বাস ফেলে বলে,—তুমি যদি তাড়িয়ে দাও?

—মানে? কি বলছ—তুমি?

—ঠিকই বলছি। আমার কি তোমার সামনে আসবার আর মুখ আছে?

—কেন?

—তোমার ওপর এতবড় অন্যায় করবার পরও কি করে তোমার সামনে আসি?

বনবিহারী কোথায় যেন সর্বস্ব খুইয়ে এসে হতাশ হয়ে পড়েছে। প্রতিটি কথায় ওর নিদারুণ দুর্বলতার আভাস পাচ্ছে।

—অন্যায়টা কি করেছ শুনি? নাও, কাপড় ছাড়ো।

বনবিহারী বলে,—আমাকে ক্ষমা করেছ বলো।

—ক্ষমা?

—হ্যাঁ। যার জন্যে তোমাকে মেরে গেলাম। সে যে এমন জানোয়ার তাতো জানতাম না।

—কে?—সব যেন ভুলে গেছে মৃগনয়নী।

—শোভা। ওর জন্যেই ত তোমার ওপর এত বড় অত্যাচারও করেছিলাম। তারপরে ওর কাছেই গিয়েছিলাম। গিয়ে কি দেখলাম জানো?

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে।

—গিয়ে দেখি আর একটা লোক এসে তার ঘরে বসে আছে। ডাকলাম, এলো না। চেঁচামেচি করবার পর এসে মুখের ওপর বললে, আপনি চলে যান। আর কখনও আসবেন না।

থামে বনবিহারী। আবার বলে,—অথচ এই কুত্তিটাকে গেল মাসেও চারশ টাকার গয়না দিয়েছি। তোমাকে দিইনি। এই ভালবাসা!

মাথাটা নীচু করে বনবিহারী। মৃগনয়নীর চোখের ওপর ভেসে ওঠে শোভার মুখখানা। ভ্রূ কোঁচকান মুখখানা!

কত অনুরোধ করেছিল মৃগনয়নী, তুমি আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও। সত্যিই কি ছেড়ে দিল? কিন্তু তেমন কথা ত বলে যায় নি।

বলে বনবিহারী।—বললাম এই তোমার ভালবাসা! বললে, ভালবাসা কাকে

লে আমরা জানি না। আপনি চলে যান। বললাম তোমার জন্যে আজ নিজের স্ত্রীকে মেরে এসেছি। শুনে কি রকম যে মুখ হয়ে গেল। বললে,—তাকে মেরেছেন। তারপরই চোখমুখ লাল করে দরোয়ানকে ডাকলে।

দাঁতে দাঁত চেপে বলে বনবিহারী,—হারামী মেয়েমানুষ! তাড়িয়ে দিলে!

চোখদুটো প্রায় সজল হয়ে আসে বনবিহারীর,—আর নয়! আজ বুঝেছি কত বড় ভুল করেছি!

মৃগনয়নীর চোখও সজল হয়ে আসে। শোভার মুখখানা ভেসে ওঠে চোখের ওপর। সেই ভ্রূ-কুঞ্চিত মুখখানা। কঠিন ওষ্ঠাধর।

তবু শোভাকে মনে মনে প্রণাম করে মৃগনয়নী। তার অনুরোধের মর্যাদা দিয়েছে শোভা। কিন্তু মুখে একবারও স্বীকার করেনি। হয়ত জানাবেও না।

বহুকাল পরে মৃগনয়নী কথাটা শুধু আমাকেই বলেছিল,—বাইরে থেকে কাউকে বিচার কোর না বাবা। বাইরে থেকে ওই বেশ্যা মেয়েটিকে বিচার করলে কত বড় ভুল করে বসতাম।

এ কথাও স্পষ্ট বলেছিল আমায়, জীবনের অনেক মানুষের মিছিলের ভেতর শোভার স্থান সকলের আগে।

মৃগনয়নীর শ্রদ্ধার অনেকটা ভাগই পেয়েছিল ওই বেশ্যা মেয়েটি।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—শোভা বেশ্যা হয়েছিল কেন জানেন?

বলেছিল একটু হেসে—জানাবার কি দরকার বাবা। সব জানতে হয় না। সংসারে সব জানতে যাওয়া বোকামি নয় কি? সব পাতা বাছতে যেও না। গাছের একটা পাতা দেখেই বলে দিতে পারো সেটা আম কি জাম গাছ। শোভাকে যা জেনেছিলাম, তাতে এটুকুও জানা হয়েছিল যে কোন একটা অবধারিত চাপে ওকে বেশ্যা হতে হয়েছিল। আর এইটেই বোধহয় সমাজের সব চেয়ে বড় কলঙ্ক। পরে একদিন দুপুরে শোভা একখানা সাদা শাড়ী পরে আমার কাছে এসেছিল, এসে কেঁদেছিল। সেদিন আমার মার খাবার জন্যে ক্ষমা চেয়েছিল। সেদিন ওর গায়ে একখানি গয়নাও ছিল না। এ কথাটা তুমি লিখো না যেন।

অবাক হয়েছিলাম মৃগনয়নীর কথায়।—কেন একথা লিখতে বারণ করছেন।

ভাবে বিভোর হয়ে বলেছিল মৃগনয়নী,—কত মানুষ দেখলাম, কিন্তু জীবনে ওই একটি দিনের মত অত বড় সম্পদ আর পাইনি। তাই ও সম্পদটুকু

গোপনেই রেখেছি। আমার স্বামীকেও কোনদিন বলিনি। তাই এই কথাটুকু লিখো না।

তাই হবে। রাজী হয়েছিলাম। পরে আর একদিন দুপুরে শোভা এসেছিল কি বলেছিল জানি না। কেন কেঁদেছিল জানি না। তাই সে কথা আর লিখতে পারব না। তবু মৃগনয়নীর অটুট শ্রদ্ধাটুকু নজরে পড়েছিল, তাই আমিও শোভাকে মনে মনে আমার শ্রদ্ধা জানালাম। আজ সে বেঁচে নেই। মৃগনয়নীও বেঁচে নেই। আমিই বেঁচে আছি অনন্ত জীবন-প্রবাহে মৃগনয়নীর একবিন্দু জীবনের সাক্ষী হয়ে। যাক সে কথা।

এর পর বনবিহারী আর কখনও শোভার কাছে যায় নি। মাঝে মাঝে বড় বেশি মদ খেয়ে ফিরত। এত মদ খেত যে অনেক রাত্রে কাদা মেখে প্রায় গড়াতে গড়াতে বাড়ী আসত।

মৃগনয়নী ধরে তুলত। গা মোছাত। শুইয়ে দিত। সবই করত নীরবে। একটা প্রতিবাদও করত না। জানত, এ করে চিরদিন কাটবে না। কাটতে পারে না।

কোন একরকম অবস্থাই চিরকাল থাকে না। পরিবর্তন এর হতেই হবে। একটা কথাও বলত না তাই। বনবিহারী যে মদ খাওয়া এত বাড়াচ্ছে তাতেও কিছুই বলত না।

অনেকগুলো দিন কাটতে লাগল। অনেকগুলো রাতও দেখতে দেখতে কেটে গেল। এক ভাবেই কাটছে।

একদিন দুপুরে ছেলেদের নিয়ে শুয়ে আছে মৃগনয়নী। কমল স্কুলে পড়ছে। ছোটটিকেও ভর্তি করতে হবে সামনের বছর। এই কথাই ভাবছে মৃগনয়নী। খরচ ক্রমশঃ বাড়ছে। রোজগার আগের চেয়ে কমে গেছে। উপরি রোজগার আগের মত আর নেই।

তা হোক, টাকার চাপ দিয়ে বনবিহারীকে ও ব্যতিব্যস্ত করতে চায় না। এই টাকাতেই চালাতেই হবে। ঝি ছাড়িয়ে দিতে হবে। একটু অল্প ভাড়ায় না হয় একটা ঘর দেখতে হবে। আর কি খরচ কমান যায়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দরজায় আওয়াজ পেয়ে চমকে ওঠে। কালো বৌ এসেছে।

—দিদি! এসো।—উঠে পড়ে মৃগনয়নী।

কালো বৌকে কতকাল দেখেনি। কাছাকাছি থেকেও মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল কতকাল। ওরাও যেত না। তারাও আসত না।

কালো বৌয়ের একি চেহারা হয়েছে। কালো রঙ আর নেই। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। গলার নীচে হাড়টা উঁচু হয়ে আছে। হাতখানা যেন চামড়ায় মোড়া দুখানা হাড়। চোখদুটোর ঠিক নীচে চোয়ালের হাড়ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কালো বৌ আস্তে আস্তে এসে ঘরে বসে। .

—একি এযে মরতে বসেছ দিদি ?

কালো বৌ হাসে। হাসে, না কাঁদে ঠিক বোঝা যায় না।

—এত কালের ভেতর একদিনও ত এলে না ?—মৃগনয়নীই প্রথম জিজ্ঞেস করে।

—আসবার ত উপায় ছিল না ভাই। আজও লুকিয়ে এসেছি, ওরা সব ঘুমুচ্ছে।

—লুকিয়ে কেন ?

—জানতে পারলে নতুনবৌ যে ভাত বন্ধ করে দেবে ভাই।

—ভাত বন্ধ !

কালো বৌ আবার সেই কান্নার মত হাসে। কথা বলে না।

মৃগনয়নীও আর কথা বলতে পারে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর কালো বৌ বলে—একটা কথা বলতে এসেছিলুম। ওরা ঘুম থেকে ওঠবার আগেই চলে যাব।

মৃগনয়নী চুপ করে থেকে তাকায়।

—আমার ভাইয়ের ঠিকানাটা রেখে যাচ্ছি। তাকে একখানা চিঠি দিয়ে দিবি। তুই ত একটু লিখতে পারিস, আমি যে মুখ্যু ভাই, লিখতেও জানি না।

—বেশ লিখে দোব। কি লিখব ?

—লিখবি।—লিখবি। আর সইতে পারছি না। আর কিছুতেই সইতে পারছি না।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে কালো বৌ।

মৃগনয়নীর চোখদুটোও সজল হয়ে ওঠে।

—বললে বিশ্বাস করবি না। ভাল করে খেতে দেয় না। সকলের পাতে যে ভাত পড়ে থাকে, সেই ভাত জড়ো করে খেতে হয় আমায়। তার ওপর—।

গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে সরলার। সরলার এমন দশা মৃগনয়নী আন্দাজ করতে পেরেছিল যেন। যখন চলে আসে তখন সরলার কথাই ভেবেছিল। জানত, ওর

দুঃখের সীমা থাকবে না। আবার এও জানত, ও সব মুখ বুঁজে সইবে। অসাধারণ সহ্য করবার ক্ষমতা ওর। সেই সহিষ্ণুতার বাঁধও ভেঙে গেছে আজ।

—লিখে দিস। যদি নিতে না আসো, তোমার মেজদি মরে যাবে। ঠিক মরে যাব আমি।

চোখের জলে বিশুষ্ক গালদুটো ভেসে যায় ওর। চুপচাপ সময় কাটে।

সমস্ত সংসারটা যেন নীরস হয়ে যায় মৃগনয়নীর চোখে।

একটু পরে বলে—লিখে আমি দেব। কিন্তু একটা কথা বলছিলাম।

—কি?

—এখানে এসে থাক না দিনকতক?

—ছাড়বে না যে!

—ছাড়বে না মানে? দেওরের সংসারে দুদিন থাকবে, এতে না ছাড়বার কি আছে?

কালো বৌ বলে,—এসে হয়ত ঝগড়া করবে। বেশ শান্তিতে আছিস, তোর আর অশান্তি বাড়াতে চাই না।

—তুমি থাকলে আমি খুব ভালই থাকব দিদি।

কালো বৌ মুখ নীচু করে চুপ করে থাকে।

—আর নাই গেলে ওখানে। এখানেই থাকো।

ধীরে ধীরে বলে কালো বৌ—তাতে ভাল হবে না। আমি বলছি ভাল হবে না।

কালো বৌ ভিজে চোখেও হাসে,—তুই অমন জোর করিস নি ভাই, আমি চলি, ঠিকানাটা লিখে নে।

—বলো।—কমলের খাতা বার করে কালো বৌয়ের ভাইয়ের ঠিকানাটা লিখে নেয় মৃগনয়নী। কালো বৌ ওঠে।

—এবারে উঠি। ওরা জাগলে মুশকিল হবে।

—শোন।—ডাকে মৃগনয়নী।

কালো বৌ ফিরে দাঁড়ায়।

—এরপর কোনদিন আমি গিয়ে যদি নিয়ে আসি? আসবে?

—আসব। কিন্তু তুই যাসনি। প্রমদাঠাকুরুন খুব ক্ষেপে আছে তোর ওপর।

—কি করবে আমার?

—হয়ত অপমান করবে।

—বয়ে গেল। আমি ভাশুর ঠাকুরের কাছে যাবো। তোমাকে নিয়ে আসব। তখন আসব না বোল না যেন। তাহলে কিন্তু বড্ড খারাপ হবে।

—বেশ, যাস।

কালো বৌ চলে যায়। যেমন এসেছিল, তেমনি চলে যায়।

মনটা আবার বিষিয়ে ওঠে মৃগনয়নীর। সংসারে কি কোন সুবিচার নেই। কালো বৌয়ের কষ্টটা যেন ভগবানের এক প্রহসন। তার একটা দৃশ্য হয়ে গেল একটু আগে। তবু মনে হয় আজকের ঘটনা নিয়ে জীবনকে বিচার করা চলবে না। তাতে জীবনের সবটুকু চোখে পড়বে না।

আরও সময় রয়েছে। সময়ে আবার কি পরিবর্তন হবে কে জানে। কে বলতে পারে।

ভাল করে নিশ্বাস নেয় মৃগনয়নী। আবার শান্ত হবার চেষ্টা করে।

একুশ

এবারে নীরব দর্শকের মত চুপ করে থাকা অভ্যাস করে মৃগনয়নী। প্রতি মুহূর্তের এই অপূর্ব অপরূপ পরিবর্তনগুলো দেখতে ভারি ভাল লাগে। মাঝে মাঝে এখন মনে হয়, কি হাস্যকর। অথচ কি সুন্দর মুহূর্তগুলোর নোতুন নোতুন স্রোত। এতে গা ভাসিয়ে দিয়ে এক পরম আরামের আস্বাদ পাচ্ছে মৃগনয়নী। কোন কিছুই ওকে আর তেমন করে স্পর্শ করতে পারছে না। বিভ্রান্ত করতে পারছে না।

বড সহজে আরও অনেকগুলো দিন কাটে। এমন সহজ করে দিনকাটান জীবনে এই প্রথম। খুব ভাল লাগে। খুব ভাল লাগে মৃগনয়নীর। ঘটনাগুলো যেন আপন নিয়মে ঘটে যায়। তাতে নিজের ভূমিকাটুকু ঠিক রেখে চুপ করে দেখে যাওয়া।

এই প্রথম এ শিক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চলেছে ও। ও বলত,—এই সময়টাতেই জীবনে সাধনার প্রথম ধাপটা পার হয়েছিলাম। কিছুতেই যেন টলাতে পারছিল না আমায়। সহজ হয়ে হালকা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। এ সাধনা ওর জীবনে যে কতটা এগিয়েছিল জানি। কিন্তু সে কথা পরে।

এই সময়টাতেই গুরুতর অসুখ হোল বনবিহারীর। অপিস থেকে প্রায়ই অসম্ভব মদ খেয়ে ফিরত। একটু রাতও হোত।

সেদিন সকাল সকাল ফিরেছে দেখে মৃগনয়নী একটু চমকে গেল, কিন্তু বলল না কিছু।

—শিগ্‌গির বিছানাটা পেতে দাও। দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

মৃগনয়নী দেখলে, সত্যিই কাঁপছে বনবিহারী। থরথর করে কাঁপছে। উঠে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো।

—উঃ! মরে গেলুম। বিছানাটা পাত।

বিছানা পাতল মৃগনয়নী। এগিয়ে এসে জুতোটা রেখে দিল এক পাশে। না বলতেই পায়ে জল দিল। পা ধুয়ে জামা পরেই শুযে পড়ল বনবিহারী।

ওঃ! মরে গেলুম!

কি ব্যাপার!

নিজেই বলে বনবিহারী—ভীষণ জ্বর। মরে গেলুম। কি যন্ত্রণা! উঃ মাগো!

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে মৃগনয়নী। কাছে বসে। বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করছে বনবিহারী। মৃগনয়নী কপালে হাত রাখে। হাতটা যেন পুড়ে গেল। জ্বরটা খুব বেশী।

—যন্ত্রণা কোথায়?

—পেটে। উঃ!

ছটফট করতে থাকে বনবিহারী। মৃগনয়নী পেটে হাত বুলিয়ে দিতে যায়। চীৎকার করে ওঠে বনবিহারী। পাকা ফোঁড়ার মত বেদনা।

কপালে জল-পটি দিতে হয়। পাখা হাতে নিয়ে বসে মৃগনয়নী। ছোট ছেলেটা কোলে এসে বিরক্ত করছে। উঠে গিয়ে ওকে কমলির মায়ের কাছে দিয়ে আসে মৃগনয়নী,—উনি জ্বর নিয়ে অপিস থেকে এসেছেন। ছেলেটাকে একটু দেখবেন দিদি।

কমলির মা কোলে নেয় ছেলেটাকে। কোল থেকে নেমে দৌড়োদৌড়ি করে ছেলেটা। করুক। মৃগনয়নী ওপরে এসে বনবিহারীর পাশে বসে।

বনবিহারী তাকায়। চোখদুটো লাল টকটকে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে কখনও। ওর দিকে তাকিয়ে বলে,—আর বাঁচব না। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি,—আর বাঁচব না।

মৃগনয়নী ওর কপালে গায়ে হাত বুলোয়। বাতাস করে।

—দেখো, এই জ্বরই শেষ জ্বর।

ছেলেমানুষের মত কথা বলে বনবিহারী। একটুও বিচলিত হয় না ও।

শুধু বলে,—জল খাও ত একটু।

বনবিহারী জল খায়।

মৃগনয়নী কমলকে বলে,—শোন্, এই সামনের বাড়ীর ডাক্তারের বৌকে একবার ডেকে দে ত, বলবি, বাবার অসুখ করেছে। মা একবার ডাকছে।

কমল বারান্দার কোণে বসে বোর্ড কেটে কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে একটা কাগজের গাড়ী বানাবার চেষ্টা করছিল। মায়ের কথা শুনে উঠে পড়ে। ডাক্তারের বৌ বীণাকে ডাকতে যায়।

মুখখানা আরও গম্ভীর হয়ে যায় মৃগনয়নীর। চোখের দৃষ্টিটা আরও শীতল স্থির মনে হয়। যেখানে মন এমনিতেই বিভ্রান্ত হবার কথা সেইখানেই ও যেন মনকে টান-টান করে রাখতে পারছে। ভারি অবাক লাগে পরে ভাবতে গেলে।

বনবিহারীর পাশে একভাবেই বসে থাকে। বনবিহারীও তেমনি ছটফট করে চলেছে। কিছু কিছু অসংলগ্ন কথাও বলছে। এটা বনবিহারীর স্বভাব। একটু জ্বর-জ্বারি হলেই ও যেন বড় বেশী ছটফট করতে শুরু করে। ঠিক বিকার না হলেও বাজে বকতে থাকে। ওগুলো চুপ করেই শুনে যেতে হয়। শুনে ঘাবড়ালে চলবে না।

পাখাখানা সমানে চলছিল। বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেল তবু ঠিক একই ভাবে পাখা চলছে। মৃগনয়না পারে। কমল ফিরে আসে।

—কি হোল রে ?

—মাসিমা আসছেন।

একটু পরেই ডাক্তারের বউ বীণা আসে।

—কি হোল দিদি ?

মৃগনয়নী সব বলে।

—আচ্ছা উনি এলেই আমি পাঠিয়ে দোব।

—ওঁকে বোল ভাই এখন কিন্তু টাকা বেশী দিতে পারব না।

—এখন দেবার দরকার নেই। এক পাড়ার মানুষ! এটুকুও যদি—।

বীণা হাসে।

মৃগনয়নী বলে,—এলেই কিন্তু পাঠিয়ে দেবেন। বড্ড চীৎকার করছে।

—ওতে ভয় পাবেন না। এলেই পাঠিয়ে দোব।

বীণা চলে যেতে চায়।

মৃগনয়নী ওর ব্যবহারে একটু সাহস পেয়ে বলে,—ভরসা দেন ত একটা কথা বলি।

—বলুন।

—যদি দরকার হয়, শুধু চিকিৎসা নয়। হয়ত কিছু টাকাও আমায় দিতে হবে।

বীণার মুখখানা শুকিয়ে যায়।

—টাকা ত ভাই আমার কাছে থাকে না। ওকে বরং বলে দেখতে পারি।

—না। আপনাকেই দিতে হবে। অবশ্য আমার গয়না রেখে টাকা দেবেন।

—গয়না!

—হ্যাঁ। গয়না রেখে দিতে পারবেন না?

ডাগর চোখ দুটি একটু বিস্ফারিত হয় বীণার। বলে,—আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে।

মৃগনয়নী ভরসা পায়। বীণা চলে যায়।

মৃগনয়নী বউটির উদারতার কথা বার বার ভাবে। যত ভাবে ততই মুগ্ধ হয়। বড ভাল বউটি। বড সুন্দর চোখদুটি। কেমন ছেলেমানুষের মত। মায়া মায়া চোখ। কি মিষ্টি কথা। ভরসা পেয়েছে মৃগনয়নী।

সত্যিই ত' ওর কাছে টাকা নেই বললেই হয়। গোটা পনরো টাকা হয়ত আছে। সংসারে আর কিছু সে দেখতে পারবে না। বনবিহারী না সেরে ওঠ পর্যন্ত।

আজ ও যাবে কালো বৌকে আনতে। এই সুযোগে কালো বৌকে আনতে হবে শুধু তাই নয়। কালো বৌ এলে তার যথেষ্ট উপকার হবে এ সময়। কিন্তু যাবে কখন? সন্ধ্যার পর যদি বনবিহারী একটু ঘুমোয় তবে যাওয়া যাবে।

কতকাল পরে ও বাড়ীতে যাবে আজ। কে কি ভাববে, কার মুখ কেমন হবে ভাবতে ভাবতে একটু তন্ময় হয়ে যায় মৃগনয়নী।

ঘরের বাইরে একটু কাসির শব্দে চমকে ওঠে। বনবিহারীও যেন হঠাৎ চমকে ওঠে।

—কে?

ডাক্তার ঢুকছে ঘরে।

—কি ব্যাপার? আমার স্ত্রী বলছিলেন—।

চেয়ার নেই ঘরে। তা হোক ট্রাউজার সার্ট পরে জানালার তাকের ওপরই বসে ল ডাক্তার।

বনবিহারী কিছু বলতে পারে না।

মৃগনয়নী কপালের ওপর পর্যন্ত ঘোমটা রেখে বললে—এই ত অপিস থেকে এসেই। সর্ব শরীর যন্ত্রণা। বড্ড কাতরাচ্ছে।

ডাক্তার কাছে এলো। অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলো। ভ্রূ কোঁচকালো। চোখ গালো।

মৃগনয়নী হাঁ করে দেখছিল আর মাঝে মাঝে ভাবছিল। এই কালো মোটা কার লোকটার এমন সুশ্রী লাবণ্যময়ী স্ত্রী! সংসারে কত আশ্চর্যই যে আছে!

লোকটার গলাটাও কর্কশ। বড বিশ্রীভাবে বললে,—আপনি কি মদ খান?

বনবিহারী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।—আজ্ঞে।

—আজ্ঞে নয়, সব কথা বলুন। মদ খেতেন? কতটা করে?

বনবিহারী যেন একটু ইতস্তত করে।

মৃগনয়নীই বলে—হ্যা, খেতেন।

—আপনাকে ত আমি জিজ্ঞেস করিনি। যাকগে, খুব বেশীই খেতেন বোধহয়?

বনবিহারী ঢোক গিলে বলে—এই একটু বেশী মাত্রা মাঝে মাঝে।

—মাঝে মাঝে নয়। রোজই হোত। তার ফলটা দাঁড়িয়েছে খুব সাংঘাতিক!

সাংঘাতিক কথাটা শুনে ভয় পেয়ে যায় বনবিহারী।

মৃগনয়নী তক্ষুনী বুঝতে পারে। বলে ডাক্তারকে,—বীণা বুঝি আপনাকে খবরটা দেছিল?

কথাটা পালটাবার চেষ্টা করে।

ডাক্তার বলে,—আজ্ঞে হাঁ। বলে ওঠে।

আবার বলে,—আমার সঙ্গে কাউকে দিন ওষুধটা নিয়ে আসবে।

মৃগনয়নী চারদিকে তাকায়। কমলকে দেখে না।

বলে,—আচ্ছা আমি কমলকে পাঠাচ্ছি।

ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে আসে।

—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু।

—ভাল নয়। লিভারের আর কিছু নেই।

—সারবে ত?—মৃগনয়নীর গলাটা ভেঙে গেছে।

ডাক্তার এতক্ষণে একটু হাসে,—তা কি বলা যায়। চেষ্টা করতে হবে।

মৃগনয়নী নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলে,—আপনার টাকাটা—।

—এখন থাক। দিন দু' তিনের ভেতরে ভরসা দিতে পারি না। যে কো সময় যে কোন ঘটনা ঘটতে পারে। হার্টও ভাল নয় কিনা?

মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছে মৃগনয়নীর।

—সেবার ত্রুটি আশা করি হবে না। নমস্কার।

ডাক্তার চলে যায়।

প্রায় টলতে টলতে ঘরে আসে মৃগনয়নী। আবার বুঝি ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ে না। কিছুতেই ভেঙে পড়বে না। যা হবার হবে। নিজেকে দুর্বল করে ফেলে আরও বিপদ ঘটতে পারে। আপ্রাণ শক্তিতে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে মৃগনয়নী।

বনবিহারী তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ফ্যালফ্যাল করে। শিশুর মত।

মৃগনয়নীকে হাসতে হবে। ধরা পড়লে চলবে না। ভয় পেলে চলবে না। একটুও যেন বুঝতে না পারে বনবিহারী। ও অমন করে তাকাচ্ছে কেন? ওরে! ওর মুখে ভয় বোঝা যাচ্ছে।

আরও একটু হাসতে চেষ্টা করে মৃগনয়নী। চোখদুটো খুব স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করে। একটু উদ্বিগ্ন ভাবও যেন বোঝা না যায়।

—ডাক্তার কি বললে?—জিজ্ঞেস করে বনবিহারী অতি কষ্টে।

পারছে। মৃগনয়নী পারছে। হাসছে মৃগনয়নী। বললে,—আর আবার কি বলবে? দিন কত শুয়ে থাকলেই সেরে উঠবে।

—তবে সাংঘাতিক বললে কেন?

—ও অমনি। মদ খাও শুনে রেগে বলেছে।

মৃগনয়নী চোখদুটোকে যতটা সম্ভব ওর চোখের দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে নিয়ে জানালার দিকে তাকাতে তাকাতে এসে বসে। আবার পাখা হাতে নেয়।

সন্ধ্যার সময় কমল এলে ওকে টাকা দিয়ে পাঠায় ডাক্তারের বাড়ি ওষুধ আনতে।

এর পর থেকে আর কোন কথাই ভাবতে পারে না মৃগনয়নী। কোন কাজ না কোন চিন্তা নয়। শুধু ডাক্তার আর ওষুধ। ওষুধ আর ডাক্তার।

কমলির মা এসে ছেলে দুটোকে দুটিখানি করে খাইয়ে দেয়। ঘুম পাড়িয়ে দে মৃগনয়নী তাকিয়ে দেখেও না একবার।

মাঝে মাঝে হাতের শাঁখার দিকে তাকায়। তাকাতে তাকাতে চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসে। একটু রগড়ে নেয় দুটো চোখ। পথ্য, থার্মোমিটার, ডাক্তার, ইনজেকসন। দিনরাত। রাতদিন।

একদিন শুধু গয়নাগুলো জড় করে ডাক্তারের বৌয়ের হাতে তুলে দেয়।

—চারশ টাকা দিতেই হবে ভাই।

চারশ! দেখি কাউকে বলে, আমার কাছে ত নেই। দেখি বেনে বাড়ির বৌয়ের কাছে পাই কিনা?

—বেনে বাড়ি কোথায়?

—সে আছে। কাল দুপুরে আসবেন।

ডাগর চোখদুটো বিস্ফারিত করে গয়নাগুলো পেট-কোমরের আঁচলে বেঁধে নিয়ে যায় বীণা। টাকা পেল পরদিন মৃগনয়নী। মাত্র সাড়ে তিনশ।

—আর পঞ্চাশ টাকা কিছুতেই দিলে না ভাই।—তেমনি সরল ডাগর চোখ তুলে বলে বীণা।

মুখখানা কালো করে শুধু বলে মৃগনয়নী—ও গয়না গড়াতে আমার সাতশ টাকা লেগেছিল।

—তাই নাকি!—

টাকাটা হাতে নিয়ে আর কোন কথা বলে না মৃগনয়নী। বীণা চলে যায়।

এরপর আর ওঠে না মৃগনয়নী। কোন চিন্তা নয়। কোন কথা নয়। বনবিহারীর রোগা ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। মুখে ওষুধ, জল আর পথ্য। পথ্য চলছেই সমানে।

কমলির মা পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে যায়। এমন আর দেখিনি। শুনিওনি।

ভবানী গালে হাত দেয়। ওর শরীর রক্ত মাংসের বলে মনে হয় না।

কিন্তু এত করেও কি কিছু ফল হয়? বনবিহারী কি বেঁচে উঠবে? বাঁচাতে কি পারবে ও?

একদিন সব আশা বুঝি নির্মূল হতে চলল। সন্ধ্যা থেকে অবস্থা খুব খারাপ। দুপুর থেকে কথা বন্ধ হয়ে গেছে। হাত পা সব ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। গলার কাছটা নড়ছে। বুকের ওঠানামা ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট।

মৃগনয়নী পাষাণের মত বসে থাকে। এক ভাবে। নির্বাক। চোখের পাতাও পড়ে না।

সন্ধ্যার পর অবস্থা রীতিমত খারাপ হয়ে আসে। বাড়িতে শুধু একটা অস্ফুট গুঞ্জন শোনা যায়।

কমলির মার ফিসফিসানি,—আর কি বাঁচবে!

ভবানীর মায়ের চাপা উত্তর। আর বোধহয় কয়েক ঘণ্টা। রাত কি কাটবে?

মুখ সব গম্ভীর।

কমল অমল রয়েছে কমলির মায়ের ঘরেই।

ডাক্তার এলো। হাতখানা তুলে নিলে হাতের ভেতর। স্টেথিস্কোপ লাগাল বুকে। মুখখানা আরও গম্ভীর হয়ে এলো। ব্যাগ থেকে বার করে ইনজেকসন দিতে হোল।

—বসে থাকতে হবে।

মৃগনয়নী ডাক্তারের দিকেও আর তাকায় না।

—খুব ঘামছে?

মাথা নাড়ে মৃগনয়নী।

—পাউডার মাখাল গায়ে। তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল।

সেবায় মৃগনয়নীর তুলনা মেলে না। ডাক্তার বসে বসে দেখে।

আবার মৃগনয়নী বাতাস করে। বাতাস করতে করতে তাকায় হাতের শাঁখার দিকে। ধবধবে সাদা শাঁখা। কি উজ্জ্বল! চোখদুটো শাঁখার ওপর থেকে ফেরাতে পারে না মৃগনয়নী। এ শাঁখায় ত' কোথাও ফাটল ধরেনি? না। কোথাও না। পরিষ্কার মসৃণ সাদা। আঁটসাট করে পরা মৃগনয়নীর হাতে। এই শাঁখা ভাঙবে? কে ভাঙবে? সংসারে এমন ঘটনা কি হতে পারে?

আবার ইনজেকসন! ডাক্তার বসে আছে। চুপ করে। গালে হাত দিয়ে। জানালার তাকের ওপর।

সময় আর কাটতে চায় না। প্রতিটি মুহূর্তকে নীরবে অনুভব করতে পারছে মৃগনয়নী।

ডাক্তার ঘড়ি দেখছে মাঝে মাঝে। এ ধারে ও ধারে উঁকি ঝুঁকি।

কমলির মায়ের চোখ দুটো জলে ভরা। যম মুখপোড়ার চোখও নেই গা! এমন সংসারটা এমন করে তইলে যাবে!

সময় কাটছে। রাত প্রায় বারোটা বাজতে চলল। তেমনি বসে আছে ডাক্তার। তেমনি মৃগনয়নী।

ডাক্তারের কর্কশ মুখখানা আজ কোমল মনে হয় মৃগনয়নীর কাছে। পরমাত্মীয় মনে হয় তাঁকে।

প্রথম দিন ডাক্তারকে ভুল ভেবেছিল মৃগনয়নী। আজ অবাক করে দিল ডাক্তার। বাড়ী থেকে দুবার ডেকে পাঠিয়েছে বীণা চাকর দিয়ে।

—এখন যাব না। দেরী হবে।

ডাক্তার গম্ভীর মুখে বলে দিলে চাকরকে। বসে রইল তেমনি।

চলল ওষুধ আর ইনজেকসন।

রাত আরও বাড়ল।

প্রায় দেড়টার সময় বনবিহারী একবার পাশ ফেরবার চেষ্টা করল। একটু খেল। একটু তাকাল। ওষুধটা জিভে ঢেলে দিয়ে হাসল ডাক্তার।

—এ যাত্রা বোধহয় বেঁচে গেল। এখন আসি। তেমন বুঝলে ডেকে পাঠাবেন।

এতক্ষণে ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার।

মৃগনয়নীও একটু বোধহয় হাসল। উঠে দাঁড়াল না। এগিয়ে দিল না। ওই হাসিটুকুই জানাল যে আপনি যা করলেন, কখনও ভুলব না।

বেঁচে গেল বনবিহারী। মৃগনয়নী যেন জোর করে ওর প্রাণটুকু রেখে দিল।

লোকে বললে, ওর সেবায় নাকি আয়ু ফিরে পেল।

মৃগনয়নী জানে তা নয়। সেবা যে ও করেছে, বেশী করেছে কি কম করেছে সে খেয়ালই ওর ছিল না। দিনরাত্রি যে কি করে কেটেছে ওর ঠিক যেন স্মরণও নেই। একটা ঘোর ভাব ওকে ঘিরে রেখেছিল। ও যা করত তা যেন ভেতর থেকে কে একজন করাতো। তারই তাগিদে ও যন্ত্রের মত কাজ করে গেছে।

একটু কষ্ট হয়নি। একটু গর্বও হয়নি। ওর ভেতরের শক্তিটুকু যেন কেন্দ্রীভূত হয়ে এক অসাধারণ তাগিদের সৃষ্টি করেছিল মনের অবচেতনে। মনের চেতনায় তার ছিল মোহ আর আতঙ্ক। বাইরে তার প্রকাশকে চেপে ছিল মাত্র।

উদ্বিগ্ন হয়েছিল কিন্তু উদ্বিগ্নভাব দেখায়নি এক মুহূর্তের জন্যেও। এইটে সংযম ঠিকই। কিন্তু মনের তরঙ্গকে রোধ করবার শক্তি ওর ছিল না।

মনের নিদারুণ বেগের কাছে কতবার যে মানুষের হার হয়! তবু মনটাকে ঢেকে রাখবার এক চেষ্টা চলে অনবরত। আশ্চর্য শক্তি এই মনের। এর খবর কিছু কিছু জানে মৃগনয়নী। দৃষ্টিটা ছোটবেলা থেকেই ওর ভেতরের দিকেই বেশী। মনের ওঠানামা দেখতে ভারী মজা লাগে ওর।

এটুকু ওর বাবার কাছ থেকে পাওয়া। ওর নিজের আর কিই বা সাধন। মৃগনয়নী মনে মনে হাসতে জানে। মনে মনে দেখতে জানে। ভাবতে জানে। এইটুকু মাত্র সম্পদ নিয়ে ও সংসারটায় ভেসে চলেছে। এখনও চলছে।

কিছুটা ভাল হবার পর বনবিহারী বললো একদিন,—একটা কথা শুনবে?

মৃগনয়নী তাকায়।

—বিশ্বাস করো ত বলি।

—বলো।

—মদ আর জীবনে ছোঁব না। মা আমাকে এই শিক্ষাই দিলেন।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে।

বনবিহারী বলে।—আমার এ অসুখটার প্রয়োজন ছিল। মনে মনে মায়ের কাছে কাঁদতাম।

মা বলত, ভালই হয়েছে। এরও প্রয়োজন ছিল।

মৃগনয়নীর ভাল লাগে কথাটা শুনে। ও ত মনে প্রাণে জানে। সংসারে যা কিছু কষ্ট যা কিছু ভোগ তার পেছনে থাকে পরম মঙ্গল। জীবনে বার বার এর প্রমাণ পেয়েছে মৃগনয়নী। পর পর তাই প্রণাম করেছে পরম মঙ্গলময়কে, আজ আরও একবার প্রণাম জানাল।

বাইশ

আট নটা বছর প্রায় কেটে গেল। মৃগনয়নীর জীবনে এ আট ন'বছর খুব মসৃণ। খুব সহজ।

বনবিহারী মদ আর খায়নি। অতি সাধারণ এক চাকুরের মত সকাল সন্ধ্যা খেটে যা টাকা আনত, তাতে বেশ কেটে যেত।

মৃগনয়নীরও বেশ কাটল। এ কবছর যেন একটা দীর্ঘ দিনের মত কেটেছে। আলোর অভাব ছিল না। অভাব ছিল না কিছু দেখবার। জীবনটা শুধু মাত্র একটা সুদীর্ঘ সাধনা। এর মর্ম মনে মনে বেশ অনুভব করেছে ও। এ সাধনা যে নিজের পূর্ণ হবার। নিজের সবটুকু নিজের দেখবার—এইটে বেশ বুঝতে পেরেছে এই নটা বছরে। ধীরে ধীরে তিলে তিলে নিজেকে ভরে নিয়েছে পূর্ণতায়। আস্বাদ পেয়েছে

অনেক আনন্দের। বাইরের নয়। ভেতরের। তাই হয়ত বা বাইরের কোন মালিন্য এই সময়ে ওকে স্পর্শ করতে পারে নি।

ঘটনা যে কিছু ছিল না তা নয়। বছর দুয়েক পরেই একদিন সাড়ে তিনশ টাকা নিয়ে ডাক্তার বউ বীণার কাছে ওকে যেতে হয়েছিল।

বলেছিল,—আমার গয়নাগুলো দাও ভাই, তোমার টাকা নাও।

—গয়না! সে ত আমার কাছে নেই! সে ত বেনে বউয়ের কাছে। তাছাড়া দুবছরে ও সুদ নেবে দুশ টাকা। সাড়ে পাঁচশ টাকা নইলে ত পাওয়া যাবে না।

বীণার তেমনি ডাগর চোখদুটো বড়ই সুন্দর আর নিষ্পাপ মনে হোল।

—তবে কবে পাওয়া যাবে বেনে বউয়ের কাছ থেকে?

বীণা চোখদুটো তেমনি বড় বড় করেই বলে,—সে কথা ভাই আমি ঠিক করে বলতে পারছি না। বেনে বউ আবার বছর খানেক কেটে গেলে যদি সুদ না পায়, সুদে গয়না দিতে চায় না। আপনি ত সুদও দেননি। তাছাড়া ক'বছর কিছু বলেনও নি।

—তবে কি হবে?

—আমি যাব একবার। দেখি যদি বার করতে পারি। তবে—।

বলে মৃগনয়নীর দিকে ডাগর সুন্দর চোখদুটো তুলে তাকিয়ে বলে,--তবে যা মনে হয়—বোধহয় পাওয়া যাবে না।

মৃগনয়নী শান্ত থাকতে পারে এমন কথা শুনেও।

শুধু বলে,—না পাওয়া গেলে আর কি করা যাবে!

—পাওয়া যাবে।—বলে একটু নাটকীয় ভাবেই ডাক্তার ঘরে ঢোকে।

কদাকার মুখখানা আরও কদাকার করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে,—তুমি বোধহয় জানতে না আমি একটু আগেই ফিরেছি। আর পাশের ঘরেই ছিলাম। সব শুনেছি।

বীণার সুন্দর মুখখানা একটু রাঙা হয়ে ওঠে।

কালো মস্ত মুখখানা মৃগনয়নীর দিকে ফিরিয়ে বলে ডাক্তার,—গয়না আপনি পাবেন। গয়না আমাদের সিন্দুকেই আছে।

—যদি না থাকে?—বীণার স্বর কি মিষ্টি ঝাঁজালো!

—আছে। চাবি দাও। অনেককে এই রকম করে ঠকিয়েছ। এঁকে আর ঠকিও না। এঁর স্বামী-সেবা যদি দেখতে তবে পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে হোত তোমার।

মৃগনয়নী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ডাক্তারের এই ধরনের কথায় যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করে।

বীণা চাবির গোছাটা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সুন্দর কোমরটি দোলাতে দোলাতে।

ডাক্তার সিন্দুক খোলে।

—দেখে নিন আপনার গয়না। এমন জিনিস এভাবে ইনি অনেক যোগাড় করেছেন।

মৃগনয়নী ডাক্তারের মুখের দিকে তাকায়। ধীরে ধীরে সিন্দুকের কাছে গিয়ে নিজের গয়নাগুলো বার করে নেয়।

ডাক্তার হাতজোড় করে বলে,—একটা কথা ছিল।

মৃগনয়নী তাকায়।

—আমার স্ত্রীকে আপনি ক্ষমা করবেন।

মৃগনয়নী একটু হাসতে পারে শুধু। ওই হাসিটুকুতেই যেন ওর সব কথা বলা হয়ে যায়।

ডাক্তারের কালো অমসৃণ মস্ত মুখখানা পরম সুন্দর মনে হয়। আর বীণার ডাগর মিষ্টি চোখ দুটো?

অবাক হয়ে ভাবে সৌন্দর্যটা সত্যি কি বাইরে? না, ভেতরে? এর পর থেকে এই প্রশ্নটাই বহুবার ওর মনে আনাগোনা করেছে। উত্তরটা পেয়েছে অতি সহজে।

এমনিতরো কিছু ঘটনা যা জীবনেও ভোলা যায় না। নটা বছরে কত সংবাদ। চিঠি পাওয়া গেল দেশ থেকে।

শাশুড়ীর জবানীতে।—তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। তুমি মাতাকে একবার দেখিতেও আস নাই। নতুন বধূমাতা কলিকাতা হইতে আমাদের খেদাইয়া দিয়াছে। দেশে চলিয়া আসিয়াছি। চোখে ভাল দেখিতে পাই না। অন্ধ মাতার দিকে তুমি না চাহিলে মরিয়া যাইব জানিবা। ইতি আশীর্বাদিকা তোমার মাতাঠাকুরাণী।

চিঠিটা আবেদন। মৃগনয়নী চিঠিখানা পেয়ে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল।

প্রমদাসুন্দরীও নিশ্চয়ই তার দেশে গেছে। নতুন বৌ এদেরও তাড়িয়েছে তাহলে। ওঁরা ত' এখানেও আসতে পারতেন? এখানে এলে মৃগনয়নী সাধ্যমত তাদের সেবা করত। তাদের সঙ্গে বনাবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করত। আসবেই বা কি করে!

কলকাতায় আসবার পর থেকে ছেলেকে ত একবার দেখতেও আসেনি। অসুখের সময়েও আসেনি। অসুখের সময় যে আসেনি, এইটেই সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে। বৃদ্ধা ত' তেমন মানুষ নন। মৃগনয়নীকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি কেন এলেন না।

মৃগনয়নীর দৃঢ় বিশ্বাস নতুন বৌয়ের ভয়ে আর ছেলের ভয়ে আসতে পারেন নি।

দু' ছেলের মাঝে পড়ে বুড়ীর কি কষ্ট। জন্মটা আমার কষ্টে দুঃখেই কাটল মা। দাওয়ার ওপরে বসে বুড়ীর সেই অন্তরের আক্ষেপটা আজও কানে বাজে। মৃগনয়নীর কষ্ট লাগে।

সন্ধ্যায় বনবিহারী ফিরে সন্ধ্যা সেরে জলখাবার পর চিঠিখানা দেয়। ঠিক যা ভেবেছিল তাই। চিঠি পেয়ে বনবিহারী আগুন।

—এ ত আমি জানি। দাদা তাড়িয়েছে। নতুন বৌয়ের কথামত। আমি ত' অনেক আগে জানি।

ভার ভাবে বলে মৃগনয়নী,—আমায় ত বলো নি?

—বলব আবার কি! এর আবার বলবার কি আছে শুনি? ওরা কি আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রেখেছে? একবার ত আসতেও পারত আমার কাছে?

—ওদের ওপর মিছিমিছি রাগ করছ। ওদের কি দোষ? না আসতে দিলে আসবে কি করে শুনি?

—জোর করে আসবে। তুমি বাজে বক না।—রেগে যায় বনবিহারী।

—রাগ করছ কেন? মেয়েদের অবস্থা তুমি কি করে বুঝবে বলো?

—যাই বলো ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।

—মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক কি উঠিয়ে দেয়া যায়!—মৃগনয়নী ঠাণ্ডা হয়ে বলে।

বনবিহারী মাদুরের ওপর শুয়ে পড়ে।

—আমার মনে হয়—।

—কি?

মৃগনয়নী বনবিহারীর মাথায় পাতলা চুলের ভেতর আঙুল বোলাতে বোলাতে বলে,—বলছিলাম কি, ওদের কিছু কিছু টাকা মাসে মাসে দিতে হয়।

—এক পয়সাও দোব না।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে।

বনবিহারীর পাতলা চুল লক্ষ্য করে বলে,—মাথায় কিন্তু টাক পড়ে গেল।

বনবিহারী কথা বলে না। চুপ করে শুয়ে থাকে।

বারান্দার শেষ প্রান্তে মাদুর পেতে পড়ছে কমল আর অমল। হ্যারিকেনের আলোয় ঝুঁকে পড়ছে দুজন। দেখাচ্ছে বেশ। পড়ার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে।

—শোন?

—কি?

মৃগনয়নী বলে,—কালকেই কুড়িটা টাকা পাঠিয়ে দাও।

—যা খুসী করো। কমলকে দিয়ে পাঠাও। আমি পারব না।

বনবিহারীর হুকুমটা পেয়ে বেঁচে যায় মৃগনয়নী।

—ওদের বাড়ির আর খবর জানো? এক অপিসে কাজ করো। নিশ্চয়ই কথা কানে আসে।

—কানে আসে।

—আর কি খবর শুনলে?

—খবর তোমায় বলে লাভ কি? কালো বৌঠাকরুনকে তার দাদা নিয়ে গেছে।

—বাপের বাড়ি চলে গেছে?

—হ্যাঁ।

মনে পড়ে মৃগনয়নীর, একদিন দুপুরে, কালোবৌ তার কাছে এসে চিঠি লিখিয়েছিল। তার পরেই বোধহয় ভাই এসে নিয়ে গেছে। বেঁচেছে। তবু ভাইয়ের কাছে দুটো খেতে পাবে। ভাই আবার কেমন কে জানে! তার একটা পেট ত। ছেলেপুলে নেই। কেটে যাবে কোনমতে।

—নতুনবৌ তাহলে একা।

—হ্যাঁ, চাকর ঠাকুর। তাছাড়া—।

—তাছাড়া কি?

—মাসে মাসে গয়না গড়াচ্ছে।

—এ খবর কোত্থেকে পেলে?—হাসে মৃগনয়নী।

—আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে পাঁচুবাবুকে গল্প বলে কিনা?

—তোমার সঙ্গে কথা বলে না?

—বলে, খুব কম।

মৃগনয়নী আর কথা বলে না।

মনে মনে একটা কথাই ভাবতে থাকে। কালই কমলকে দিয়ে কুড়িটা টাকা

পাঠাতে হবে। বুড়ী শাশুড়ীর জন্যে মনের কোথায় যেন ওর একটা বেদনা জাগে। ও মনে স্থির করে প্রত্যেক মাসেই টাকা পাঠাবে। আর বনবিহারীকে বলবার দরকার নেই।

এর পর থেকে এই কবছরই মাসে মাসে টাকা পাঠায় মৃগনয়নী। মাঝে মাঝে চিঠিও লেখে। নিজের নামেই লেখে।

উত্তরও পায়। সাবিত্রী সমান হও। রাজরানী হও।

এমনিভাবেই কাটছে। মৃগনয়নী খুশী। বনবিহারীও যে খুশী নয় এমন কথা বলা যায় না।

এক একবার তবু বলে—মাসে মাসে পাঠানর কি দরকার। দাদা ত এক আধলাও দেয় না।

—তা হোক। মনে কর ও টাকাটা তুমি আমায় দিচ্ছ।

বনবিহারী হেসে ফেলে,—তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই।

আর কিছু বলেনি বনবিহারী।

বছর দুই আগে আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। মর্মান্তিক। টেলিগ্রাম এসেছিল। বিকেলে। টেলিগ্রাম যে এত আকস্মিক আঘাত দিতে পারে আগে জানত না মৃগনয়নী। এরপর থেকেই টেলিগ্রামের কথা শুনলে ওর ভয় হয়। নিশ্চয়ই কোন খারাপ সংবাদ। কারণটা স্বাভাবিক। একটা কোন সুসংবাদের তার ও জীবনে পায়নি।

টেলিগ্রামটা পেয়ে ও বুঝতে পারেনি কিছু। ভবানীর মায়ের ঘরে গেল। ভবানীর বাবা ছিলেন। তাঁকে দিয়ে পড়াতে হোল।

বললেন তিনি,—লিখেছে আপনারই নামে। বাবা মারা গেছে। চলে এসো।

মৃগনয়নী কি বলবে কি করবে কিছু ভেবে পাচ্ছিল না। বাবা মারা গেছে! মাত্র তিনটি কথা। ভবানীর বাবার মুখের নির্বিকার উচ্চারণ।

অথচ কথা তিনটি মাথায় সব ওলট পালট করে সর্বাঙ্গ অবশ করে দিলো। কথার কি অমোঘ শক্তি!

কাঁদতে পাচ্ছে না মৃগনয়নী। কান্না কাকে বলে ভুলে যাচ্ছে যেন। হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রামটা নিতে গিয়ে বুঝল হাত কাঁপছে। দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখে দাঁড়াতে পাচ্ছে না। অগত্যা বসে থাকতে হোল যতক্ষণ না কথা তিনটে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে মনের পরিধিতে, যতক্ষণ না গাল বেয়ে অনবরত চোখের জল পড়তে থাকে।

সন্ধ্যেবেলা বনবিহারী এসে সব শোনে। মৃগনয়নী কিছু বলতে পারে না।

কমল বাপকে টেলিগ্রাম দেখায়। সব কথা বলে। বনবিহারী মৃগনয়নীর কাছে আসে। মৃগনয়নী শুয়ে পড়ে আছে। তখন থেকে আর ওঠবার মত সামর্থ্য নেই ওর।

—কিন্তু উঠতে ত তোমায় হবে। আজকের ট্রেনেই চলে যাও বরঞ্চ। কমল যাবে সঙ্গে।

যাবার কথায় মৃগনয়নীকে উঠতে হয়।

বনবিহারী আবার বলে,—আমি কালকের ট্রেনে যাব। টাকা নিয়েই যাব।

মৃগনয়নী একটা বাক্স গুছিয়ে নেয়। বিছানা বেঁধে দেয় বনবিহারী।

—কত টাকা নেব বলত?

—যা পার। চতুর্থীর কাজ করতে হবে ত আমায়।

—শ দুয়েকে হবে।

—তা হবে।

ওরা প্রস্তুত হয়ে নেয়। বনবিহারী ওদের নিয়ে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসে।

বনবিহারী পরদিন সন্ধ্যায় প্রায় দুশ টাকা ধার করে নিয়ে রওনা হয়। মনে মনে ঠিক করে বেশীদিন ওখানে মৃগনয়নীকে রাখা চলবে না। সে পাঁচদিনের ছুটি নিয়েছে। আসবার সময় ওদের নিয়ে আসবারই ইচ্ছে।

বহুকাল পরে বাপের বাড়ী এসে মৃগনয়নীর একেবারেই ভাল লাগল না। এসে দেখল অনেক ব্যাপারই ও জানত না। মাঝে মাঝে কুশল সংবাদ দেয়া-নেয়া আর পুঁটিদির চিঠি এ ছাড়া আর কোন সংবাদ জানবার কথা নয়। ইদানীং পুঁটিদিও চিঠি দিত না আর।

চিঠি দেবে কি করে। ও এসে পুঁটিদিকে যা দেখল, তাতে চিঠি দেবার মত অবস্থা তার নেই। ভোর থেকে বেলা দুটো তিনটে পর্যন্ত তার ঠাকুর ঘরেই কাটে। জপতপ পূজা সন্ধ্যায় কিযে আনন্দ ও পায়। সংসারের আর কোনদিকে কিছু ভাববার বা দেখবার অবসর থাকে না।

বেলা তিনটে সাড়ে তিনটেয় রান্নাঘরে গিয়ে যা হোক কিছু খেয়ে নেয়। খাওয়া দাওয়া তখন মিটে যায়, কাজেই নিজের হাতে সব নিয়ে খেতে হয়। একটু বিশ্রাম করে, একটু কথাবার্তা বলে সন্ধ্যায় চলে যায় ভাগবত পাঠ শুনতে।

সেখান থেকে ফিরে আবার ঠাকুরঘরে। ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে কখন যে এসে

শোয় সে খবর কেউ জানে না। রাত্রে খায় না কিছু। প্রথম প্রথম নাকি খুব রোগা হয়ে গিয়েছিল। এখন সয়ে গেছে।

মুখখানির দিকে তাকিয়ে মৃগনয়নী অবাক হয়। যেন আনন্দমাখা মুখখানা। চাউনী কি শান্ত কি ঠাণ্ডা। ও যেন অনেক গভীরে বাস করছে যেখানে এরা কেউই নাগাল পাচ্ছে না।

তবু মৃগনয়নী ওর সঙ্গেই কথা বলল বেশী। ওর কাছেই শুনল সব। রামতারণ পুরো জ্ঞান নিয়েই দেহত্যাগ করেছেন।

—কথা বলেছিলেন কিছু?—জিজ্ঞেস করলে মৃগনয়নী।

—আহা! কি সুন্দর ভাসাভাসা চোখদুটি আধবোজা করে বলতে লাগলেন, এ আমায় কোথায় আনলে, এ বুঝি পুরী? আর এখানে ও, এ ত গয়া? মধুর, মধুর, মধুর মধুর কথা কাকে বলি।

পুঁটিদির মুখখানি বলতে বলতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—ঠাকুর মশাই বললেন, মৃত্যুর আগে সব তীর্থ দর্শন হোল। মহাপুরুষদের নাকি এটা হয়।

—উনি ত যেমন তেমন মানুষ ছিলেন না? ওঁর কদর কে আর বুঝবে বল!

মৃগনয়নীও আনন্দে ভরে ওঠে। এমন মৃত্যু হয়েছে তার বাবার? এমন ত কখনও শোনেনি সে।

—বাবা ত মানুষ ছিলেন না। বাবা কি ছিলেন আমি কিছু কিছু জানি।

বলতে বলতে চোখ জলে ভরে ওঠে। বেদনায় নয়, আনন্দে।

ও ত নিশ্চিত জানে সংসারে ওর গুরু যদি কেউ থাকেন, সে এই বাবা। মৃত্যু-সময় তাঁর কাছে থাকতে পেলুম না এই দুঃখ।

পুঁটিদি মৃগনয়নীর সঙ্গে কথা বলল ঠিকই, কিন্তু সন্ধ্যা হতেই বললে,—আমি এবার পাঠ শুনতে যাই ভাই।

—আজ না হয় নাই গেলে?

মৃগনয়নীর অনুরোধে পুঁটির মুখখানা কেমন হয়ে যায়।

উঠে পড়ে বলে,—একটু ঘুরে আসি ভাই। নইলে আমার মোটে ভাল লাগবে না।

বলে মৃগনয়নীর কথা বলবার অপেক্ষা না করেই চলে যায়।

সবচেয়ে অবাক হয় ও দেখে যে রামতারণরা সব সম্পত্তি বাড়ী ভাগ করে নিয়েছে।

কর্তামার সঙ্গে মায়ের আর সম্পর্ক নেই তেমন। সবই যেন ছাড়া-ছাড়া। ছন্নছাড়া এক বিরাট প্রাসাদ ভেঙে পড়বার আগে যেন ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছে তার চুনবালি ইট কাঠ।

একেবারে ভাল লাগে না মৃগনয়নীর। বনবিহারীকে ও নিজেই বলে,—তোমার সঙ্গেই চলে যাবো।

বনবিহারী ত রাজী হবেই এসেছে। তাই বনবিহারীর সঙ্গেই সে যাত্রা আবার কলকাতায় চলে আসে।

ঘটনাটা কিছুই নয়। প্রথম প্রথম শোকটা সাধারণ ভাবেই গ্রহণ করেছিল মৃগনয়নী। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই যেন ও ভেঙে পড়তে লাগল বেশী।

হঠাৎ দুপুরে হয়ত একা একা শুয়ে মনে দম নিতে পাচ্ছে না ও। বুকের ভেতরটা যেন ফাঁকা। একেবারে শূন্য। ওর ভয়-ভয় লাগে। হয়ত পা ঘেমে ওঠে। তারপর কিছুক্ষণ ওই অবস্থায় থাকবার পর আবার আস্তে আস্তে যেন নিশ্বাস নিতে পারে ও। মাঝে মাঝে এ অবস্থাটা হতে থাকে। এখন ও বেশ বুঝতে পারে বাবার কথা বেশী ভাবলেই এই রকম হয়ে যায় ও।

একি হোল তার! একটু ভয়-ভয় লাগলেও কাউকে কিছু বলে না। যতদিন যায় ততই ও বাবার মৃত্যু যে ওর কাছে কত মর্মান্তিক হয়েছে সেটা বুঝতে পারে। তবুও বাবাকেই ভাবে বেশী করে, ভরসা যে অভয় পেলে তাঁর কাছ থেকেই পাবে।

অভয় পেলোও ঠিকই। বছরের পর বছর কেটে গেল। নটা বছর কাটল। ন বছর ও যেন স্থির হয়ে গেল নিজের ভিত্তিতে। নিজের ভেতরে নিজেকে আর একবার আবিষ্কার করবার আনন্দে শান্ত হয়ে গেল। তবু আবিষ্কার শেষ হয়নি। এ জন্মে আর হবে কিনা কে জানে! তবু যেটুকু আভাস সে পেয়েছে ওতেই সে ভরপুর।

এ কবছর কমল অমল দু' ভাই বড় হয়ে উঠেছে। কমল ফার্স্ট ক্লাসে পড়ছে, অমল ফিপ্‌থ্‌ ক্লাসে।

সকাল হলে ওরা একপয়সা করে জলখাবার পায়। মুড়ি মুড়কি কিনে এনে পড়তে বসে। পড়তে পড়তে রোদটা যখন বারান্দার একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়ায় তখন ওরা ওঠে স্নান করতে। রোদের ওঠানামায় ওরা সময়ের হিসেব ঠিক করে নেয়।

কমল বেশ গম্ভীর। ফরসা রোগা। চেহারা অনেকটা বাপের মত। কিন্তু মনটা অনেক গভীর। কথা কম বলে। যা বলে তাঁর নড়চড় বড একটা হয় না।

অমল তা নয়। বড্ড বেশী কথা বলে। দূরন্ত আর চঞ্চল।

—বুদ্ধি স্থির নয়। ওর কপালে যে কি আছে কে জানে!

মাঝে মাঝে আক্ষেপ করতে শোনা যায় মৃগনয়নীকে।

অমল ভ্রূক্ষেপও করে না। বলে,—কপালে খুব নাম আছে মা। গেলবার থিয়েটারে ত কত নাম হয়েছিল। পরশুর থিয়েটারে দেখবে ফাটিয়ে দোব।

কমল একটু বিরক্ত হয়ে ভাইয়ের দিকে তাকায় শুধু। তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই অমলের।

—অই দেখলে ত মা। দাদার অমনি রাগ হয়ে গেল।

আবার তাকায় কমল। পড়তে পড়তে।

—ওকে ত বিশুদা পার্ট দেয়নি, তাই ওর রাগ।

—বাজে বকিসনি!—ধমক দেয় কমল।

অমল বলে,—যা বলব পষ্ট কথা। বলো বিশুদা কি বলেছে তোমায়।

কমল বলে,—বিশুদা পার্ট দিলেও করতাম না।

—অ! কত ইয়ে!

অমল হাসতে থাকে।

মৃগনয়নীও হাসে ওদের কাণ্ড দেখে। একবার ধমক দেয় অমলকে,—দাদাকে অমন করে বলে নাকি?

বলে চলে যেতে চায়।

অমল পিছু নেয়,—চারটে পয়সা দাও না মা!

—কেন, আবার পয়সা কি হবে?

—ইস্কুলে একটা জিনিস খাব।

—কি শুনি?

কমল ওদিক থেকে বলে,—পয়সা দিও না মা, পাঁঠার ঘুগ্‌নী খাবে।

—মিছে কথা বলবিনি দাদা!

বলতে বলতে অমল কমলের কাছে রেগে চলে আসে। মৃগনয়নী চলে যায় রান্নাঘরে।

কয়েক মাস ধরে উপরি রোজগার কিছু নেই বনবিহারীর। সামান্য মাইনেতে সংসার চলতে আর চায় না। ছেলেদের স্কুলের মাইনে। তার ওপর কমল প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে। তার জন্যে মাস্টার। তবু ত কমল গিয়ে পড়ে আসে মাস্টারের কাছে। তাতেই দশটাকা!

কমলের জন্যে একটু দুধও রোজ করতে হয়েছে। বনবিহারী বলেছে, ওকে বাজার-টাজার পাঠিও না। সামনে পরীক্ষা। আর ওর খাওয়াটার দিকে একটু নজর রেখো।

বড় আশা বনবিহারীর। নিজের পড়াশুনা কিছুই হয়নি। কারুরই হয়নি ওদের বংশে। কমল এই প্রথম ম্যাট্রিক দেবে। একটু গর্ব হয় বইকি!

ওর পিঙ্গল চোখদুটো চিকচিক করে ওঠে, দেখে কমল পড়ছে অনেক মোটা মোটা বই, বড় বড় বই। ম্যাট্রিক ত আর ছেলেখেলা নয়? এরপর আবার কলেজ, আই. এসসি একটু শক্ত। তা হোক, কমল পাস করলে তাই পড়বে।

—টাকা পাবে কোথায়?—মৃগনয়নী বনবিহারীকে বলে।

—তা হোক, যেমন করে হোক, ওকে পড়াতে হবে। পাস করতে পারলে—.

বনবিহারীর পিঙ্গল চোখদুটো স্বপ্নে বিভোর হয়। তারপর কমলকে ডাক্তারি পড়াবে। নাও যদি পারে একটা বড় চাকরি ত পাবেই।

রোগা ফরসা পিঠখানা একটু কুঁজো হয়েছে বনবিহারীর। সন্ধ্যায় অপিস থেকে এসে গামছা পরে তামাক টানতে টানতে স্বপ্নে ডুবে যায়। উপরি রোজগারটা একেবারেই নেই। না থাক।

—বাজারটা বরং রোজ না করলেও হয়।—হয়ত বলে মৃগনয়নী।

বনবিহারী কথা বলে না। তামাক টানে। তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে কলঘরে চলে যায়।

কিই বা বলবে বনবিহারী। মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে। উপরি ছাড়া চলা অসম্ভব। তবু কি করে যে মৃগনয়নী চালায়। মৃগনয়নীই জানে। মৃগনয়নী কখনও একটু অভিযোগ করে না। এইটেই বড় আশ্চর্য।

বনবিহারী কলঘর থেকে এসে শোনে, কমল ধমকাচ্ছে অমলকে,—তুই বিক্রি করে দিলি!

অমল প্রতিবাদে বলে,—বলছি, হারিয়ে গেছে। কি করে পড়া দোব?

কমল অমলের পড়া দেখিয়ে দেয় বরাবরই। হয়ত আজ পড়া ধরতে গিয়ে বকছে।

আবার কমল বলে,—মিছে কথা বলিসনি বলছি। আমি নিজে দেখেছি বই কাল ছিল। তাছাড়া আজ তুই অত পয়সা পেলি কোথায়?।

—কই পয়সা পেইছি?

—স্পোর্টে তিনটে ইভেণ্টে নাম দিইচিস, এই মাত্তর বললি।

—দিইচি ত ?

—তিন দুগুণে ছ' আনা। তুই পেলি কোথায় ?

অমল চুপ করে থাকে।

—মা দিয়েছে ?

ওদের চেঁচামেচি শুনে মৃগনয়নী এগিয়ে এসেছিল। বনবিহারীও।

মৃগনয়নী বললে,—আমি ত পয়সা দিইনি ?

—তবে কোথায় পয়সা পেল মা। ও নিশ্চয়ই ভূগোল বইটা বিক্রি করেছে।

—বলছি হারিয়ে গেছে।

বনবিহারী দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এসে অমলের কান ধরে।

—হারিয়ে গেছে। বল বই কি করেছিস ?

বনবিহারীর কানদুটো রাঙা হয়ে ওঠে।

ও অমলের কাণ্ডটা বুঝতে পারে। বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারে যে অমল কত বড় অন্যায় করেছে।

এই যে অভাব! এত কষ্টে বই কিনে দেয়! অপিসে হেঁটে গিয়ে বাসের পয়সা বাঁচিয়ে ছেলেদের পড়ার খরচ চালাবার আপ্রাণ চেষ্টা! অমল এ সব কিছুই বোঝে না!

অমলকে মারতে শুরু করে বনবিহারী। মৃগনয়নী তাড়াতাড়ি গিয়ে থামায় বনবিহারীকে।

—থাক। আর মেরো না। আর কখনও যেন বই বিক্রি কোর না! বলে অমলকে।

অমল গোঁজ হয়ে বসে থাকে। চোখে এক ফোঁটা জল নেই। চেহারাটা মোটাসোটা। পায়ের হাঁটু অবধি ময়লা। বড় বড় চোখদুটো শুধু লালচে হয়ে ওঠে একটু।

কমল ভাইয়ের মার দেখে একটু চুপ হয়ে যায়।

বনবিহারী কমলের জন্যে যতটা গর্বিত হয়, অমলের জন্যে ততটাই আতঙ্কিত হয়। ওর কথাবার্তা চালন বলন কিছুই কমলের সঙ্গে মেলে না। মাঝে মাঝেই একটা না একটা গোলমাল করে বসে।

কারো ছেলেকে হয়ত এক একদিন এমন মার দেয়, তার বাবা বাড়ি বয়ে এসে

নালিশ করে যায়। বনবিহারী অমলকে হয়ত মারে, শাসন করে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই ওর।

পরদিন হয়ত রাত আটটায় নিজেরই কপালটা ফাটিয়ে বাড়ি আসে। মৃগনয়নী সহ্য করে। পারতপক্ষে বনবিহারীকে কিছুই জানায় না। মনে মনে মৃগনয়নীও যে বেদনা পায় না এমন নয়। তবু চিন্তা করবার স্বভাবটা মৃগনয়নীর চলে গেছে। বিশেষ করে দুশ্চিন্তার।

বনবিহারী চলে যাবার পর মৃগনয়নী বলে অমলকে,—তুই একটু বুঝবি না, একটু কথা শুনবি না।

চুপ করে থাকে অমল।

ভাই যে এত মার খেল, এতে কমলেরও খুব ভাল লাগে না।

ও মুখখানা শুকনো করে বলে,—ওকে এত বোঝাই। একটুও বোঝে না। ম..:

মৃগনয়নী বলে,—বইটা বিক্রি না করে আমার কাছে পয়সা চাইলেই পারতিস।

অমল তেমনি গোঁজ হয়েই বসে থাকে।

—স্পোর্টে নাম না দিলেই হোত!

—সবাই যে দিয়েছে? কথা বলে অমল।

—তা' দিক। সবাই নাম দিলেই যে আমাদের দিতে হবে, এমন কথা কিছু নেই।

মৃগনয়নী বলে,—বেশ ত পয়সা চাইলেই হোত?

—চাইলে ত দিতে না।

—থাকলে কি তোদের কখনও না বলি।

—থাকে না ত!

—না থাকলে মা কি করবে?—বলে কমল।

মৃগনয়নীর মুখটা শুকিয়ে যায়। সত্যিই ত অনেক সময়ই পয়সা চাইলেও পয়সা দিতে পারে না। জলখাবার পয়সাও এক আধদিন দেওয়া হয় না।

টিফিনের পয়সা চাইলে কমলকে বলতে হয়, পয়সা নেই বাবা!

কমল আর একটা কথাও বলে না। অমল বোঝে না। হয়ত জেদ করে, বলে পয়সা না দিলে ইস্কুলে যাব না।

অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাঠাতে হয় ইস্কুলে। বরাবরই অমল একটু অবুঝ।

কমল বলে,—কিন্তু তাই বলে বই বিক্রি করবি, মিছে কথা বলবি?

অমল কথা বলে না।

মৃগনয়নী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে,—থাক্, আর কিছু বলিস নি।

বইটা ত কিনতে হবে?

কমল বলে,—সামনের মাসের গোড়ায় কিনে দোব।

একটু চুপ করে মৃগনয়নী বলে,—কত দাম?

—এক টাকা বোধ হয়।

একটু সময় চুপ করে থাকতে হয় মৃগনয়নীকে। ভাবতে হয় কোথা থেকে এই টাকাটা আবার বাঁচাবে। ভাবতে ভাবতে ওখান থেকে চলে যায় মৃগনয়নী।

বনবিহারীর আহ্নিক হয়ে গেছে। কালীর পটের কাছে মা মা করে ডাকছে বনবিহারী।

জিজ্ঞেস করলে বলে,—ডাকতে বেশ ভাল লাগে। মনটা খোলসা হয়ে যায়। তাছাড়া—

—তাছাড়া কি?—মৃগনয়নীর ভাল লাগে ওর বিশ্বাসটা। তাই জিজ্ঞেস করে।

—তাছাড়া কি জানো, মাকে ডাকলে মা শোনে।

লোকে শুনলে বলবে, পাগল। কিন্তু মৃগনয়নী জানে অন্তরের কত বড় সম্পদ ওর এই বিশ্বাস। এ বিশ্বাসকে কিছুতেই যেন উড়িয়ে দেয়া যায় না। এই সুগভীর নির্ভরতার যে পরম শান্তি, এটা বেশ অনুভব করতে পারে মৃগনয়নী।

আজ সন্ধ্যে করে উঠে বনবিহারী চুপ করে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে। মৃগনয়নী আস্তে আস্তে কাছে যায়।

কি খাবে?

—কিছু না।—

বনবিহারী বিড়ি টানতে থাকে।

মৃগনয়নী আবার বলে,—একেবারে ভাত খাবে?

—তেমন খিদেও নেই।

দু জনেই চুপ করে বসে থাকে। দু জনেই বোধকরি এক কথাই ভাবছে। তবু কেউ কাউকে কিছু বলতে পারছে না। দু জনের মন ভার কিন্তু মুখ বন্ধ।

হারিকেনের আলোটা কমিয়ে দেয় মৃগনয়নী। ও পাশ থেকে কমলের পড়বার আওয়াজ আসে। সময় কাটে।

বনবিহারী আর একটা বিড়ি ধরায়।

একসময় বনবিহারী বলে ফেলে,—ও ছেলেটার কি হবে বলো ত'?

মৃগনয়নী একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

—কি যে হবে!—নিজের মনেই আর একবার বলে বিড়িটা টানে বনবিহারী।

মৃগনয়নী বলে,—আচ্ছা ওর জন্যে আলাদা একটা মাস্টার রাখলে কেমন হয়!

বনবিহারী ভাবে, মাস্টার রাখা মানেই টাকা। টাকা পাবে কোথায়? বিড়িটা তেতো লাগে।

ফেলে দিয়ে বলে,—কমলের পরীক্ষাটা হোক, তারপর না হয়—।

মৃগনয়নী বলে,—রাখলে এখনই রাখতে হয়। এর পর আর লাভ হবে না।

—কেন?

—আমি যা বলছি সত্যি।

—মানে?

—আমি ত মা, আমি তোমার চেয়ে বেশী জানি। ও খুব খারাপ সঙ্গে পড়েছে।

—সে রকম কিছু টের পেয়েছ?

মৃগনয়নী একটু চুপ করে থেকে বলে,—ওর মুখে ত দু একদিন—।

—কি?

—আমার মনে হোল বিড়ির গন্ধ।

—সে কি?—বনবিহারীর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়।

তারপর বলে,—তুমি কিছু বললে না?

—কি বলব।

—দেখছি আমি।—বলে উঠতে চায় বনবিহারী।

মৃগনয়নী ওর হাত ধরে,—মেরো না।

—মারব না?

—না। মেরে লাভ হবে না কিছু।

—তবে চুপ করে থেকে কি লাভ হবে?

মৃগনয়নী শান্তস্বরেই বলে,—মারতে গেলে নিজেরই লজ্জা।

বনবিহারী বসে পড়ে। কথাটা সত্যি। নিজেরই লজ্জা।

—এক কাজ করব।—বলে মৃগনয়নী,—কমলকে বলব, ওকে একটু চোখেচোখে রাখতে।

—তাতে আর কি হবে?

—হবে। কমলের চোখে কিছু পডলে ও নিজেই ভয় পাবে।

—যা খুশী করো।

বনবিহারী চুপ করে বসে থাকে। মৃগনয়নী চলে যায় রান্নাঘরে।

বাইশ

কিছুদিন পরেই একদিন সন্ধ্যায় বনবিহারী এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পে। জামাটা ছাডতেও তার মনে থাকে না। মৃগনয়নী ছেলেদের জলখাবার টি আর একটু করে গুড দিয়ে বনবিহারীর কাছে এসে একটু অবাক হয়।

—কি হোল জামা ছাডলে না?

বনবিহারীর চোখ দুটো রাঙা।

—কি হোল কি?

বনবিহারী ওর দিকে একবার তাকিয়ে বলে।—সর্বনাশ হয়েছে।

—কি?

ফিসফিস করে বলে বনবিহারী,—ক্যাশে পাঁচশ টাকা সর্ট।

—তার মানে? কি করে?

বনবিহারীর চোখদুটো জলে ভরে ওঠে,— বরাতক্রমে আবার বডবাবু আজ ক্যাশ চেক কচ্ছিল।

চেক করতে গিয়ে ধরা পডেছে।

—কি করে হোল?

—কি করে হোল জানি। কিন্তু বলতে পারছি না কাউকে।

মৃগনয়নীর মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে। সর্বনাশ যে কত বড ও আন্দাজ করতে যে পারছে না তা নয়। তবু মুখের ভাবে ওর কিছু প্রকাশ পায় না।

খুব সহজ ভাবে চেষ্টা করে।—বলো না। কি হোল?

বনবিহারী মুখটা নীচু করেই বলে।—ক্যাশ থেকে টাকা যখন দিচ্ছিলুম, তখন দাদা ছিল সামনে। এর ভেতরে বডবাবু ডেকে পাঠালেন। দাদা সামনে আছে ভেবে আমি আর বাক্সে চাবি না দিয়ে গিয়েছিলুম বড়বাবুর কাছে। এ ছাড়া আর ত এক মুহূর্তও আমি ক্যাশ থেকে নডিনি।

মৃগনয়নী অসম্ভব গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। বনবিহারীর মুখটা তেমনি নীচু।

মৃগনয়নী জিজ্ঞেস করে,—তাহলে কি হবে?

—বড়বাবু হেড অপিসে রিপোর্ট করেছে। কাল সায়েব আসবে।

—সায়েব এলে বলবে কি?

—তাই ত ভাবছি।

মৃগনয়নী বলে,—সত্যি কথাই বোল।

—সত্যি কথা বললে ত চাকরি থাকবে না। তাছাড়া—

—তাই ত ভাবছি।

—তাছাড়া কি?

—দাদাকে সন্দেহ করে যদি সায়েব পুলিশে দেয়?

নির্বিকার কঠিনস্বরে বলে মৃগনয়নী,—দেয় ত দেবে।

—তারপর?

—তারপর যা হয় হবে।

বনবিহারী বলে,—তবে সত্যি কথাই বলব?

—নিশ্চয়ই।—দৃঢ়কণ্ঠে বলে মৃগনয়নী।

—কিন্তু।

—আবার কিন্তু কি?

—আমার যদি চাকরি যায়?

আবার মৃগনয়নীর মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে।—যায় ত যাবে।

—কিন্তু—বনবিহারীর চোখে জল টলমল করে,—খাবে কি?

—সে যা হয় হবে।

বনবিহারী চোখ মোছে। চাকরি নেই। এমন একটা অবস্থা ভাবতেই পাচ্ছে না ও। ভাবতে গেলেই দেখছে সব অন্ধকার।

কমল পরীক্ষা দেবে। কি করে দেবে? চাল আসবে কোত্থেকে? বাড়ি ভাড়া? মৃগনয়নীর নিশ্চিন্ত ভাবটা ও কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না।

—যা হয় হবে ত বলছ।—কিন্তু—

—কিন্তু কি? তুমি সবাইকে খাওয়াও বলে মনে করো নাকি? এসব কি তুমি করো?

মৃগনয়নীর দিকে তাকিয়ে থাকে বনবিহারী।

—তুমিই ত আবার বলো তোমার মা সব করে।—বলে মৃগনয়নী।

বনবিহারী চুপ করে থাকে। কথাটা সত্য।

মৃগনয়নী বলে,—মা কি একটা কিছু করবে না। তবে কি আর তাকে ডাকো ?

কথাটা অবধারিত সত্য বলেই মনে হয় বনবিহারীর। তবু কেন যে মন মানে না। কেন যে ভয় হচ্ছে ভাবতে। ভাবতেই পাচ্ছে না যে চাকরি নেই।

মৃগনয়নীও বলেছে ঠিক। মা কি কিছুই করবে না? মা কি জানে না তার কোন দোষ নেই? তবু দোষ না করেও শাস্তি! একি মায়ের বিচার!

—যা কিছু হচ্ছে। সবই জানবে মঙ্গলের জন্যে।

মৃগনয়নীর কথা আবার কানে যায় ওর। ঠিকই ত। হয়ত এর ভেতরেই কিছু মঙ্গল নিহিত রয়েছে। দেখবার চোখ নেই ওর নিজের। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত ঘটনা, অনন্ত মনের ওঠানামা এ সবই কি মঙ্গল? কি হবে অত ভেবে। মা যা করে তাই হবে।

মা কালীর পটখানার দিকে তাকায় বনবিহারী। মনটা ধীরে ধীরে যেন সহজ হয়ে আসে। সংসারে কি আশ্চর্য কাণ্ড! ছোট একখানি পটের কি অনন্ত শক্তি! তাই কি! ঠিক তা নয়। শক্তিটা বনবিহারীর বিশ্বাসের। বিশ্বাসের মত এত সম্পদ সংসারে আর দ্বিতীয় আছে বলে মনে হয় না।

রামতারণ বলতেন মৃগনয়নীকে। বিশ্বাসে অঘটন ঘটান যায়। বিশ্বাস যদি অটল হয়, তবে সেই হিমালয়ের মত স্থৈর্য জগতে অনেক অনেক বড় কাজে লাগে। মনের বিশ্বাসের সেই স্থির শান্ত শক্তিকে কিছুই আর নুয়ে দিতে পারে না।

—তাই হবে।

অনেক হাল্কা হয়ে গেছে বনবিহারী। মা যা করে তাই হবে। জামা খুলতে ওঠে পড়ে। কলঘর থেকে এসে বসবে পটের কাছে। মা মা করে ডাকবে—অনেকক্ষণ। প্রাণভরে।

—যা সত্যি তাই বলব। এতে যা হয় হবে।

মৃগনয়নী হাসে,—খারাপ কিছু হবে না দেখো।

বনবিহারীও হাসে।—চাকরিটা যাবে।

—ভালই হবে। একটু বিশ্রাম পাবে।

অশান্তি আর দুশ্চিন্তার স্রোতটা একমুহূর্ত উলটো দিকে চলে। সংসারের এত

বড একটা আতঙ্ককে মৃগনয়নী আর বনবিহারী এমন করে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে কিসের আশায় ? আশা কি আছে ?

না, আশা নয়। কোথায় একটা জায়গায় নির্ভর করতে শিখছে ওরা। নির্ভরতায় কোন খাদ নেই। পুরোপুরি। তাই এত অঘটনেও এত ভ্রুক্ষেপহীন।

যথারীতি সব কাজই হয়। পরদিন ভোরে ওঠে বনবিহারী অপিস যাবার আগে মৃগনয়নীর কাছে একবার দাঁড়ায়।

ফিসফিস করে বলে,—একটু যেন ভয় ভয় কচ্ছে।

মৃগনয়নীর মুখে প্রশান্ত হাসিটুকু আছে,—ভয় আবার কি ? যা সত্যি বলবে।

দু জনেই আপ্রাণ চেষ্টা করছে ভয় না পেতে। তবু ভয় জিনিসটা ভারি অদ্ভুত। কোথা দিয়ে কখন যে মনের ভেতর এসে একটু উঁকি মারে। আবার দূর করে তাড়াতে হয়।

বনবিহারী অপিসে বেরিয়ে যায় ভয়টাকে দূর করবার চেষ্টা করতে করতে। চেষ্টা ভারি কঠিন কিন্তু ভারি আনন্দের।

সমস্ত দিনটা কাটে। নিশ্চিত থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও যেন পেরে উঠছে না মৃগনয়নী। কি হবে ভেবে ? অপিসে গেছে। যা হয় হবে। তবু ভাবনা আসে।

দুপুর বেলা স্কুলে চলে গেছে ছেলেরা। মৃগনয়নী বিশ্রাম করে দুপুরটা। একটু বা ঘুমোয়। আজ ঘুমোতে পারে না। থেকে থেকে মনে হয় সত্যিই কি চাকরি গেল ?

বনবিহারী অপিসে এতক্ষণ কি করছে কে জানে ! চাকরিটা যদি যায়ই, তবে কি হবে।

বনবিহারীকে সাহস দিলেও মৃগনয়নীও সামনের দিনগুলোর কথা ভেবে একটু চমকে ওঠে। এত খরচা। চাকরি না থাকলে কি হবে ? গয়না। কিন্তু কদিন চলবে গয়নাতে ?—তারপর ?

তারপর আর কিছু না হয় আবার বাপের বাড়ী চলে যাওয়া যাবে। কিন্তু বাপের বাডী চলে যাওয়া যাবে। কিন্তু বাপের বাড়ীর যা অবস্থা দেখে এসেছে ও এবার। সেখানে যেতে আর মন চায় না।

তবু যেতে হবে। নিরুপায় হয়েই যেতে হবে।

এমনি সব নানা ভাবনায় দিনটা কাটে। তবুও ওরই ভেতর অনেকটা স্থির থাকবার চেষ্ট করে ও। স্থির হতে যতটুকু পারে। ততটুকুতেই যেন ভারি আনন্দ।

এই ত জীবন। এই সব তরঙ্গকে ভয় করলে চলবে কেন? তরঙ্গ সত্য নয়। জলই সত্য।

সন্ধ্যা হয়ে যায়। কমল আর অমল স্কুল থেকে এসে জলখাবার খেয়ে বেড়িয়ে ফিরে এলো। এবারে পড়তে বসবে।

সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়ে মায়ের পটের কাছে দাঁড়ায় আবার মৃগনয়নী। এইটুকুই বুঝিবা সম্বল। কমল মায়ের গম্ভীর মুখখানা লক্ষ্য করে।

—তোমার কি অসুখ করেছে মা?

ওর শরীরে বড় মায়া। দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ।

মৃগনয়নী হাসবার চেষ্টা করে।—না ত?

লণ্ঠনটা নিয়ে যায় কমল। অমল বসে বসে কাটাকুটি খেলছিল।

বলে।—মাকে বলে দেব?

—কি বলবি।

—তুমি আজ স্কুলের হরতালের ভলেন্টিয়ার ছিলে?

—বলিসনি ভাই।

কমল আজ হরতালে ভলেন্টিয়ার ছিল। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। গান্ধীজী গ্রেপ্তার হয়েছেন। চারদিকে পুলিসের অত্যাচার শোনা যাচ্ছে। স্কুল কলেজ হরতাল। কমল তাতে যোগ দিয়েছিল।

অমল বলছে,—তুমি কেন পুলিসের লাঠির গোঁজা খেতে গেলে। যদি লাগত?

—কত মানুষের যে লাগছে জানিস। কত মানুষকে ওরা মারছে। তুই শুধু আমারটাই ভাবছিস।

—তা হোক। তোমার ও বন্ধুগুলো ভাল নয়।

—কোনগুলো?

—ওই যে ছেলেটা মাঝে মাঝে গান্ধীটুপি পরে। ভাল ফুটবল খেলে। ওকে কি মারলে আজ!

—তুই একটা গাধা। ওদের কত সাহস জানিস। পুলিসকে ওরা গ্রাহ্যই করে না। ওসব মারকে তোয়াক্কা করে না।

অমল কিন্তু বলে,—ওসব তুমি আর করতে যেও না।

কমলের ভাল লাগে না ওর কথা। ওর এই ভীতু মনোভাবটা। বড্ড বিশ্রী। অমলটা কি যে হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

রেগে বলে,—আর বই বিক্রি করতে যাওয়াটা খুব ভাল বুঝি?

—নিজের বই নিজে বেচেছি। এতে খারাপটা কি করেছি?

অমল বেশ সোজাসুজি বলে।

—আর তুই যে সব ছেলেদের সঙ্গে মিশিস। স্কুলের সব চেয়ে ওঁচা ছেলে তোর বন্ধু।

অমল মানতে চায় না,—ওরা একজামিনে কি করে দেখো।

—দেখিচি। সব টুকলিফাই চালাবে।

—কক্ষনো নয়।

—বাজে বকিস নি।

কমল বইটা খোলে। অমলও আর কথা না বলে বই খোলে।

মৃগনয়নী সদরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রান্না করতেও ভাল লাগছিল না।

রাত হয়ে এলো। এখনও ত বনবিহারী এলো না। কি ব্যাপার? ইদানিং ত এত রাত কখনও করে না? তবে কি আবার—। ভাবতেই অনেকগুলো বছর আগের কথা মনে পড়ে।

মনে পড়ে বনবিহারীর সেই বন্ধুর কথা। সেই মেয়েটার কথা। আরও কত অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। কি হোল আজ! অন্য কোনদিন রাত করলে ভাবনা হোত না। কিন্তু আজ এমন একটা গুরুতর ব্যাপার রয়েছে অপিসে। হোল কি? আজ এত রাত করবার কারণ কি?

সদর থেকে আবার রান্নাঘরে চলে আসে। ঠাকুরকে স্মরণ করে মৃগনয়নী। এ কি হোল! আসছে না কেন? তার কি জেল হাজত কিছু হোল? ধরে নিয়ে গেল অন্য কোথায়? কয়েক মাস যদি আর না ছাড়ে। আটকে রাখে জেলে? ঠাকুর ত' জানে ও চুরি করেনি! মিছিমিছি ওকে আটকাবে? একজনের দোষে আর একজনের শাস্তি! চোখদুটো ওর ভিজে ওঠে।

আবার সদরের কাছে চলে আসে। কোন উপায়ও ত নেই। কাউকে যে কোথাও পাঠাবে তারও কোন উপায় নেই। তবে এটা ঠিকই যে কোন খবর না পেলেও ভাশুরের বাড়ী খবর আনতে কাউকে পাঠাবে না। সংসারে ভাই যে ভাইয়ের এমন শত্রু হয়, এ কথা ও ধারণাও করতে পারেনি। তাই বা বলি কি করে। ভাশুর ত খারাপ নয়। এ ভাশুর তাকে যত্ন করতও প্রথম প্রথম। কত মিষ্টি করে কথা বলত। নতুন বৌ আনবার পর সব ওলটপালট হয়ে গেল।

এর কারণটাও ঠিক নতুন বৌ নয়। ভাশুরের দুর্বল-জায়গাটুকু আবিষ্কার করে ফেলেছে। তাই সুযোগ সে আর ছাড়ছে না।

বনবিহারীর দুর্বল জায়গাটা মৃগনয়নী জানে। কিন্তু ভুলেও কখনও সেখানে আঘাত করে না। দুর্বলতার সুযোগ নেয় না। ওটা ত একধরনের অত্যাচার।

আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে রাত আরও বেড়ে যায়। ওপরের ঘরে এসে চুপ করে বসে ছেলেদের পড়া শোনে।

সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ পাওয়া যায়। এসেছে বোধহয়। হ্যাঁ, এসেছে। নীরবে ঘরে ঢোকে বনবিহারী। একটুও টলে না। ছাই ভস্ম কিছু খায়নি তবে।

মৃগনয়নী গামছাটা এগিয়ে দেয় নীরবে। কথা না বলে বনবিহারী জামা খোলে। কাপড় ছেড়ে গামছা পরে। আস্তে আস্তে কলকেটা নিয়ে তামাক সাজতে বসে। তামাক টানে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে। পিঠটা বেয়ে ঘাম ঝরছে।

মৃগনয়নী রান্না ঘরে যায় একবার। আবার উঠে এসে বাতাস করে ওকে। তামাক টেনে কলঘরের দিকে যায় বনবিহারী।

এই ফাঁকে কমল আর অমলকে খেতে ডাকে মৃগনয়নী। ওদের খাওয়া হলে ওরা শুতে আসে ঘরে। বিছানা করে দেয় মৃগনয়নী।

সবাই চুপচাপ। কেউই কথা বলছে না। বনবিহারী কলঘর থেকে এসে আসন পেতে বসে পটের সামনে। আহ্নিক সেরে নেবে।

মৃগনয়নী বসে থাকে অমলের পাশে। আহ্নিক আর বনবিহারীর শেষ হয় না। একটু ভাল করে লক্ষ্য করে মৃগনয়নী। বনবিহারী দু চোখ বেয়ে গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে। পটের দিকেই তাকিয়ে আছে। মা মা বলে চীৎকার করে উঠবে বুঝি। মৃগনয়নীও ঠাকুরকে স্মরণ করে।

অনেক পরে বনবিহারী ওঠে কাপড় পরে।

—খাবে না?

এই প্রথম কথা বলে মৃগনয়নী।

চলো।

আবার চুপচাপ। চুপ করে মাথা নীচু করে খেয়ে ওপরে চলে আসে বনবিহারী।

মৃগনয়নীর আর খেতে ইচ্ছে নেই। হাঁড়ি তুকে রান্নাঘরে তালা দিয়ে ওপরে আসে।

বনবিহারী শুয়ে পড়েছে। মৃগনয়নী আলোটা কমিয়ে দেয়। আধা অন্ধকারে ঘরটা যেন আরও গুমট হয়ে ওঠে। একটুও বাতাস নেই আজ। হাত পাখাটা নামিয়ে নেয় বাক্সের ওপর থেকে। কমল আর অমলকে খানিকক্ষণ বাতাস করে।

তারপর আস্তে আস্তে বনবিহারীর বিছানার কাছে আসে। বনবিহারী ঘুমিয়েছে কি না বোঝা যায় না। বনবিহারীকে বাতাস করতে থাকে মৃগনয়নী।

—ঘুমোলে ?—এই দ্বিতীয় কথা।

—না।—বনবিহারীর স্পষ্ট গলা শোনা যায়।

আবার নীরবে বাতাস করতে থাকে মৃগনয়নী। ভেবেছিল নিজে থেকেই বনবিহারী কিছু বলবে। কিন্তু বনবিহারী কিছুই বলে না। চুপ করে শুয়ে থাকে তেমনি।

মৃগনয়নী জিজ্ঞেস করে,—কি হোল ?

বনবিহারী নীরব।

মৃগনয়নী আবার বলে,—কি হোল ?

—চাকরির ?

—হ্যাঁ।

—ওটা গেছে।

হাতের পাখা বন্ধ হয়ে যায় মৃগনয়নীর। শরীরের ভেতরটা শির শির করতে থাকে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে হাত পা।

ভালই হয়েছে।—নিদারুণ সংযম নিয়ে বলে মৃগনয়নী।

একটা নিঃশ্বাস পড়ে বনবিহারীর,—হ্যাঁ। ভালই হয়েছে।

মৃগনয়নীরও একটা বড় নিঃশ্বাস পড়ত ; কিন্তু চাপতে পারে ও। সর্বশরীর ঘামতে থাকে। কি গরম পড়েছে আজ। গুমট্ গরম। একটু বলে কি বাতাস থাকতে নেই।

তবু পাখাটা চালাতে আর ইচ্ছে হয় না। হাত অবশ অবশ লাগে। ঘরে অন্ধকার বড় বেশী। যেন গ্রাস করছে অন্ধকার।

ওঠে মৃগনয়নী। দিয়াশলাই জ্বালায়। দিয়াশলাইয়ের আলোতে দেখতে পায় বনবিহারীর মুখখানা। রোগা শরীরটা। বনবিহারীর জন্যেই কষ্ট। আজীবন হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে গেল। পেল কি ?

আবার খাটতে হবে। কিন্তু খাটবার সুযোগ কি কেউ দেবে আর ?

লণ্ঠনটা জ্বালায়। বনবিহারী একবার ফিরে তাকায়। কিছু বলে না। আলোটা একটু কমিয়ে আস্তে আস্তে দু ছেলের মাঝখানটায় এসে শুয়ে পড়ে মৃগনয়নী।

বনবিহারীর গলা শোনা যায়, গিয়েছিলাম দাদার বাসায়।

মৃগনয়নী পাশ ফিরে তাকায়।

বনবিহারীর গলাটা ভাঙা,—বলে,—কথা বললে না।

—কথা বলবার মুখ থাকলে ত বলবে!

নতুন বৌঠানের ভাইকে দেখলাম।

মৃগনয়নী আবার ওপাশ ফিরে বলে,—না গেলেই পারতে ওখানে।

বনবিহারী আর কথা বলে না। মৃগনয়নীও নয়। কিন্তু ঘুম? ঘুম ভুলে গেছে ওরা। ভোরের অপেক্ষায় আছে।

তেইশ

একটা ভোর নয়। অনেকগুলো ভোর হয়। অনেক রাত পার হয়। বনবিহারী চাকরির চেষ্টা করে। মৃগনয়নী হাসিমুখে একবেলা খেয়ে কাজ করে যায়।

কমল আর অমল জানতে পারে সব। অমল ঠিক বোঝে না। ও এখনও আগের মতই এসে পয়সা চায় মায়ের কাছে। না পেলে চীৎকার করে।

কমল সব শুনে একটু বেশী গম্ভীর হয়ে যায়। বাড়ীতে প্রায় কথাই বলে না। দিনরাত পড়াশুনো করে।

—কমলই ভরসা!

বনবিহারীও সায় দেয়,—ওকে মানুষ করতে পারলেই নিশ্চিন্ত হই।

তবু আশায়! ওই একটুখানি প্রাণের ওপর নির্ভর।

গেল মাসে ওপর হাতের দুটো গয়না বিক্রি করে দুশ টাকা পেয়েছিল। এ মাসের শেষের দিকটা আর চলতে চায় না যেন। শুধু ডাল আর ভাত।

অমল মাঝে মাঝেই চেঁচায়। কমল একটা কথাও বলে না। ওর টেস্ট পরীক্ষা একেবারে সামনে। সেদিন সকালে উঠে মৃগনয়নী দেখে আর ডালও নেই। শুধু ভাত ও ছেলেদের সামনে কি করে দেবে? কি করে বনবিহারীর সামনে ভাত বেড়ে দেবে!

শীত পড়েছে একটু। তবু ঘামে মৃগনয়নী। কমল পড়ছিল। ওকে ডাকে।

—শোন।

কমল উঠে আসে।

—গামছাটা নিয়ে একবার বাজারে যাবি ?

বাজারের কথা শুনে একটু অবাক হবারই কথা। অবাকই হয় কমল।

একটু ম্লান হাসে মৃগনয়নী।—বাজারে গিয়ে দেখবি যেখানে কপি বিক্রি করে, সেখানে কপির পাতা ফেলে দেয়। কিছু কপির পাতা যদি চেয়ে আনিস, কালজিরে দিয়ে কেমন সুন্দর চচ্চড়ি করে দোব দেখবি।

কমল একটু হাসে।—দাও গামছা।

গামছাটা ওর হাতে দিয়ে মৃগনয়নী রান্নাঘরের দিকে যায়। অমলকে দিয়ে চা পয়সার তেল আনতে হবে। আর একপয়সার কালোজিরে।

বনবিহারী বেরিয়ে গেছে এক দোকানের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে। চাক হবার সম্ভাবনা আছে সেখানে। লোকটি কয়েকদিন ঘুরোচ্ছে ওকে।

অনেকটা দূর হেঁটে যেতে হয়। ট্রামে গেলেই ভাল হয়। কিন্তু পয়সা কই! বনবিহারীকে হেঁটে যেতে হবে। তাই একটু সকাল সকাল বেরিয়ে যায়।

বেলা অনেকটা হয়ে গেল। কমল ফিরছে না এখনও। অমলকে দিয়ে তেল আর কালোজিরে আনানো হয়ে গেছে। ভাত নামিয়ে বসে আছে মৃগনয়নী। কমল ফিরছে না এখনও। মিছিমিছি কয়লা খরচা। উনুন থেকে কয়লা দুচারখানা তুলে রাখে মৃগনয়নী।

ওপরে ওঠে মৃগনয়নী।

শোনে অমল বলছে,—কি হোল দাদা, কাঁদছিস কেন ?

বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে মৃগনয়নীর। তাড়াতাড়ি যায় বারান্দায়।

কমল তখন ওপরে উঠে এসেছে, ও রান্নাঘরে বসে টের পায়নি। সামনে গামছায় বাঁধা কপির পাতা। চোখদুটো রাঙা কমলের। টসটস করছে জলভরা।

—কি হোল রে ? কখন এলি ?

কমল কথা বলে না।

গামছা হাতে নিয়ে মৃগনয়নী বলে,—কেউ কিছু বলেছে ?

—কি আর বলবে ? বললে এগুলো গরু খায়। তোমাদের বাড়ীতে বুঝি গরু আছে ?

টপটপ করে জল পড়ে কমলের গালের ওপর।

মৃগনয়নী হাসে। এ হাসি কান্নার চেয়েও করুণ।

—এই কথা! এতেই এত!

কমল বই গুছিয়ে উঠে পড়ে।

মৃগনয়নী সেই কপির পাতা ডাঁটা নিয়ে নিচে নেমে আসে। রান্নাঘরে এসে বঁটিটা নিয়ে বসে ডাঁটা থেকে শাকগুলো আলাদা করে।

কমলের ছেলেমানুষিতে এমন হাসি পায় ওর! কিন্তু বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে কেন। অসম্ভব জ্বালা। যেন কতকগুলো জলন্ত উনুনের কয়লা বুকের ভেতরে পুড়ছে। এমন ত' কখনও হয় না! একি ও যে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। চোখে অন্ধকার লাগছে! স্নিগ্ধ মুখখানি একমনে ভাবতে থাকে মৃগনয়না। তবে জ্বালাটা কমছে। অনেক কমেছে। ওই চোখের শীতল স্পর্শে ধুয়ে গেল যেন অনেক ময়লা।

কি গভীর প্রশান্তি! কি অপার অভয়!

—বাবা গো! আর যে পেরে উঠছি না!—অস্ফুট কণ্ঠের উচ্ছ্বাস।

হু হু করে চোখের জল বেরিয়ে আসে মৃগনয়নীর। গাল ভেসে যায়।

রামতারণের চোখে তবু অভয়। তবু কি শান্তি!

তাই ত কতবার আমাকে বলত মৃগনয়নী। কত দিনই ত গেল। কত দিন হাসলাম। কত দিন কাঁদলাম। একটা দিনও ত রইল না বাবা! ওগুলো থাকে না। ওগুলোকে যদি লীলা বলে মেনে নিতে পারতাম সেদিন।

—কেন পারতেন না? জিজ্ঞেস করেছিলাম।

বলেছিল,—তখনও ত' বাবার সাধনা আমার ভেতর দিয়ে পূর্ণ হয়নি। আনন্দের আসন পেলে নতুন নতুন দিনের হাসি আর কান্না নতুন নতুন খেলা বলে মনে হয়, মজার লাগে।

আবার একটু চুপ করে থেকে হাঁপ নিয়ে বলত,—সংসারটা বড়ই মজার বাবা!

স্তম্ভিত হয়ে ভাবি। মৃগনয়নী কোন্ আস্বাদের কথা বলছে। যে আস্বাদ পেলে দৈনন্দিন কান্না বেদনাগুলোও মধুর হয়ে ওঠে? মৃগনয়নীর জীবন বোধের সীমা খুঁজে পাই না।

তাইত লিখছি মৃগনয়নীর কাহিনী।

এই সময়টার কষ্টটা মাঝে মাঝে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেত। কমলের চোখের

জলটা ঠিকমত সয়ে উঠতে পারেনি মৃগনয়নী। তবু কোনোদিন ত চিরকাল পুরোনো হয়ে থাকে না। নতুন সংবাদ নিয়ে নতুন দিন আসে।

বনবিহারীও একদিন সংবাদ নিয়ে এলো,—চাকরি তার হয়েছে। একটা বড় কাপড়ের দোকানে।

—কত দেবে?

—এখন পঁয়তাল্লিশ টাকা দেবে। তিনমাস পরে ষাট টাকা। এ মাসটা তবে চলবে কি করে।

বলে মৃগনয়নী।—এই চুড়ি দুগাছা বেচে এসো। তোমার মাইনে পেতে ত একমাস দেরি।

মুখখানা ম্লান হয়ে যায় বনবিহারীর,—কিছুই ত' রইল না।

এইবার হাসি পায় মৃগনয়নীর,—কি যে বলো! তুমি রয়েছ, কমল অমল রয়েছে। আমার ত সবই রয়েছে। এ ছাই গয়না আমার ভাল লাগে না। আমি পরিও না।

গয়না বেচতে হয়। আরও একটা মাস কষ্ট করতে হবে।

কমলের টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। তার পরীক্ষার টাকা জমা দিতে হবে। আর দু'গাছা চুড়িও বোধহয় থাকবে না। না থাক। ওগুলো এই সব কাজে লাগলেই সার্থক। অগত্যা বনবিহারীকে আবার গয়নাই বিক্রি করতে হয়।

দিন ঠিকই কেটে যায়। মৃগনয়নী এখনও একবেলাই খায়। রাত্রে ভাত খায় না। কাউকে কিছু বলেও না।

অনেক রোগা হয়ে গেছে মৃগনয়নী। মাঝে দুর্বল লাগে, মাথা ঘোরে। তবু হাসিটি ওর মুখ থেকে যায় না।

আনন্দকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তে। একটা দিন আনন্দ নষ্ট হলে মনে হয়। দিনটা আজ বৃথাই গেল।

সেদিন সন্ধ্যের পর খেতে বসে অমল ডাল আর ভাত নাড়া-চাড়া করে। বেশী ভাত খেতে পারে না।

মৃগনয়নী জিজ্ঞেস করে।—কিরে ভাত খাচ্ছিস না যে?

কমল তাকায় না কারো দিকে, মুখ নীচু করে ভাত খেয়ে যায়। অমল একবার কমলের দিকে তাকায়।

তারপর বলে,—মা, শোন।

—কি বলনা?

—কাছে এসো না।

মৃগনয়নী কাছে আসে।

কানের কাছে মুখটা নিয়ে অমল ফিস ফিস করে বলে,—একদিন মাংস খেতে ইচ্ছে হচ্ছে মা!

—অ! এই কথা!—হাসতে গিয়েও হাসতে পারে না মৃগনয়নী।

কমল মুখ তোলে না। ওদের কথা যেন কানে যায়নি, এমনি ভাবেই খেয়ে যায়।

খেয়ে উঠে আবার পড়তে বসবে। রাত দেড়টা দুটো অবধি। এমনি সামান্য সামান্য ব্যাপারে মৃগনয়নীর আনন্দে ভাটা পড়তে চায়। তবু কিছুতেই টলান যায় না।

জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বলে,—তোর বাবা মাইনে পেলে মাংস আনব।

—সে ত' অনেক দেরি।

—অনেক দেরি আর কই, বাবা! এই দু চারটে দিন গেলেই মাইনে পাবেন।

আর কথা বলে না অমল। ওরা ওপরে উঠে যায়।

মৃগনয়নী চুপ করে বসে থাকে রান্নাঘরেই। ওপরে আর উঠতে ইচ্ছে হয় না।

বনবিহারী আসবে অনেক রাত্রে। দোকান বন্ধ হলে।

ভোরে বেরোয়। দুপুরে খেতে আসে। খেয়ে বেরোয়। ফেরে অনেক রাত্রে। ছুটি নেই একটা দিনও।

এই যে খাটুনি! ওই রোগা মানুষ এত খাটুনি কি সইতে পারবে? কে জানে? দোকান থেকে যখন ফেরে। মুখখানার ওপর একটা কালো আবরণ পড়ে যায় যেন। অত ফরসা মানুষটা, যেন পুড়ে আসে। আধঘণ্টা বাতাস করতে হয়। জিরিয়ে তামাক খেয়ে তবে উঠতে পারে। খেয়ে শুতে শুতে রাত একটা। আবার ভোরে ওঠা।

ভোরে উঠে মৃগনয়নী রান্নাঘরে। বনবিহারী দোকানে। কমল ওঠে রাত থাকতে। উঠে পড়তে সুরু করে। পরীক্ষার আর দেরি নেই। কমলের শরীরটাও ভেঙে পড়েছে। একটু দুধ খাওয়াতে পারলে ভাল হোত।

একটা নিশ্বাস পড়ে মৃগনয়নীর। দুধের স্বপ্ন না দেখাই ভাল! বরং সকালে

ছুটিখানি করে ছোলা ভিজিয়েও যদি খায়! কাল থেকে তাই করবে মৃগনয়নী। বনবিহারী এলে আজ একবার বলে দেখবে। কিন্তু বলবার মত অবস্থা আর থাকে না। শরীর এত ক্লান্ত হয়ে আসে। একটা কথা বলতেও চায় না বনবিহারী।

মৃগনয়নীও বলে না। কিই বা বলবার আছে? বোবার মত চুপ করে সয়ে যাওয়া! বোবা মনে আর কথা ফোটে না।

চব্বিশ

একটা একটা করে বোবা দিন কেটে যায়। জীবনে আর কোন বৈচিত্র্যই যেন নেই। একঘেয়ে একটানা। মৃগনয়নী স্থির হয়ে থাকবার চেষ্টা করে, তবু মাঝে মাঝে যেন হাঁপিয়ে ওঠে। বাইরের আনন্দ পাবার চেষ্টা যে সংসারে কত বৃথা, মৃগনয়নী ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারছে। আনন্দর যেখানে উৎস সেইখানেই ও মনকে ডুবিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। এ বড কঠিন সাধন। তবু মৃগনয়নী এই দীক্ষাই ত ওর বাবার কাছ থেকে পেয়েছে! অটল স্থৈর্য আর অতল আনন্দ। রামতারণের চিন্তায় বিভোর হয়ে বসে থাকে মাঝে মাঝে।

এমনি এক দুপুরে খবর এল বনবিহারীর দাদা হঠাৎ মারা গেছে।

খেতে বসেছিল বনবিহারী। হঠাৎ খাওয়া ফেলে ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠল। মৃগনয়নী প্রথমটা স্তম্ভিত হলেও একটু পরে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল যে এসেছিল তাকে,— কি হয়েছিল?

—কিছুই নয়। জামাইবাবু সকালবেলা কল থেকে বেরিয়ে ঘরে এসেই বললে শরীরটা কেমন লাগছে, তারপরই ডাক্তার আনতে আনতে সব শেষ।

বোঝা গেল এই লোকটিই নতুনবৌয়ের ভাই।

মৃগনয়নী ভাবল একবার বলে,—সকালে মরেছে, খবর এল একটায়।

কিন্তু বলল না কিছু। বনবিহারীর দিকে তাকিয়ে বলল,— চলো এখুনি যেতে হবে।

বনবিহারী কাঁদছে।

আশ্চর্য! যে দাদাকে দেখলে তার গায়ে জ্বালা ধরত, তার জন্যে এত কান্না! রক্তের সম্পর্কটা যে এতই নিগূঢ় এ খবর কি বনবিহারীই জানত!

ওরা যথারীতি ওখানে যায়। মৃগনয়নী নতুনবৌয়ের কাছে যায়।

নতুনবৌ কাঁদছে; কিন্তু খুব নীরবে গুমরে গুমরে।

মৃগনয়নী কাছে গেল।

নতুনবৌ উঠে অন্য দিকে চলে গেল। তাকাল একবার মৃগনয়নীর দিকে শ্যেন-দৃষ্টিতে, কঠিন মুখে।

মৃগনয়নী আর কোন কথা বলল না।

শবদাহ করতে ওরা শ্মশানে চলে যাবার পর নিজের বাড়ীতে ফিরে এল।

বনবিহারী এল সন্ধ্যার পর। এসে শুয়ে পড়ল। রাত্রে উঠল না। মৃগনয়নী ডাকলও না।

দিনকতক কাটল। শ্রাদ্ধের দিন গিয়ে শুনতে পেল মৃগনয়নী, নতুনবৌ দেশে চলে যাবে। কলকাতায় আর থাকবে না।

টাকা গয়না যা আছে তাই দিয়ে ওখানে বেশ কিছু জমি কিনে নতুনবৌয়ের ভরণপোষণের একটা সুবন্দোবস্ত করে দিয়ে আসবে ওর ভাই। অর্থাৎ ওর ভাইও যাবে।

মৃগনয়নী কথা বলল না।

বনবিহারীও কিছু বলল না।

নীরবে সেদিন রাত্রে চলে এলো ওরা।

আসবার পথে মৃগনয়নী বললে বনবিহারীকে,—কত টাকা আছে সবসুদ্ধু?

—শুনেছি হাজার পনরো।

মৃগনয়নী হঠাৎ বলে,—আচ্ছা মাকে আমাদের বাসায় নিয়ে এলে হয়!

বনবিহারী একটা বিড়ি ধরায়,— তা হয়। কিন্তু—।

কিন্তুটা যে কি সেটা মৃগনয়নীও জানে। শাশুড়ী এলে তার নিরামিষ রান্নার জন্যে রোজ একটা আলাদা খরচ করবার মত অবস্থা ওদের নেই।

তবু নতুনবৌ আর তার ভাই গিয়ে যে বৃদ্ধার ওপর দিনের পর দিন জুলুম চালাবে, নানাভাবে তাকে বিব্রত করবে, এটা ভাবতে তার মনে কষ্ট হচ্ছে।

—জীবনটা আমার কষ্টে কষ্টেই গেল মা!—বৃদ্ধার এ আক্ষেপ ত' এখনও মৃগনয়নীর কানে বাজে। সে কি করতে পারল তার শাশুড়ীর জন্যে? দিনকতক একটু সুখও ত' দিতে পারল না?

পারল না। আর হয়ত পারবেও না।

ও জানে বৃদ্ধা আর বেশীদিন হয়ত বাঁচবে না। শেষকটা দিন যদি তাকে কাছে এনে রাখতে পারত! একটা নিশ্বাস ফেলে মৃগনয়নী।

বলে,— খবরটা কি মা পেয়েছে?

—না। নতুনবৌ গেলেই খবর পাবে।

আর কথা বলে না মৃগনয়নী। নীরবে বাড়ী পৌছোয় ওরা। নীরবেই শুয়ে পড়ে।

বনবিহারী শোবার আগে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে শুধু,—কাল সকালে উঠেই আমার দোকানে বেরোতে হবে। আমার শরীরেও আর বইছে না। আমিও হয়ত শিগ্‌গিরই মরে যাব।

মৃগনয়নী কথা বলে না।

ও কিই বা বলতে পারে। কিই বা করতে পারে!

মৃগনয়নী যা ভেবেছিল, তাই সত্য হোল। ভাবলে বিস্ময় লাগে মৃগনয়নীর। খারাপ কথাটা যা ভাবে সেটা আশ্চর্য ভাবে ফলে যায়। ভাল কিছু যদি ভাবে, তা ফলে না! সত্য হয় না।

মাসছয়েক পরে প্রমদাসুন্দরীর জবানিতে একটা চিঠি পাওয়া গেল।—

শ্রীচরণেষু দাদা,

মাতাঠাকুরানী গত পরশু দেহত্যাগ করিয়াছেন। তোমাকে সংবাদ দিতে একদিন বিলম্ব হইল, তাহার কারণ, নতুন বৌঠান বড়ই জ্বালাইতেছে।

তাহার ভ্রাতা তাহার টাকা গহনা সর্বস্ব লইয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহার পর হইতেই তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। দিবারাত্র যন্ত্রণা দিতেছে। অনেক সময় শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

এবম্বিধ অশান্তিতে মাতাঠাকুরানী অতি দুরবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তুমি পত্রপাঠমাত্র টেলিগ্রাম মনে করিয়া চলিয়া আসিবা। না আসিতে পারিলে অন্তত পক্ষে দুইশত টাকা পাঠাইবা। টাকা না পাইলে মাতাঠাকুরানীর পারলৌকিক কার্য নির্বাহ করা যাইবে না জানিবা।

নয়াবৌঠানকে বলিও সে যেন একবার আসিয়া আমাদের দেখিয়া যায়। প্রণামান্তে ইতি। সেবিকা প্রমদাসুন্দরী।'

চিঠিখানা পড়ল কমল।

মৃগনয়নী চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ। বৃদ্ধা যে বাঁচবে না এ কথা ত' জান

রা। তবু এত তাড়াতাড়ি যাবে হয়ত ভাবতে পারেনি। ওর চোখের কোণদুটো একটু ভিজে উঠল। বৃদ্ধার সম্বন্ধে ওর সত্যি মনের কোথায় যেন একটা কোমল স্থান ছিল। আক্ষেপের কথা বলবার মানুষও তার ছিল না। তাই মৃগনয়নীকে বার বার বলত, কষ্ট আর আমার গেল না মা!

আক্ষেপের এক মস্ত বোঝা নিয়েই বিদায় নিল এ জন্মের মত। এ জন্মে বার-বার শুধু হেরে যেতেই হোল তার। সর্বদিক থেকে। ফাঁকে পড়ল সবকিছু থেকে।

—চিঠি কে লিখেছে মা?— কমল জিজ্ঞেস করে।

—তোর পিসীমা।

—পিসীমা লিখতে জানেন?

—কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে হয়ত।

নতুনবৌয়ের জন্যেও মৃগনয়নীর মনটা বড়ই করুণ হয়ে ওঠে। চূড়ান্ত অহংকারের এমন পরিণতির কথা কে ধারণা করতে পেরেছিল? জানোয়ারের মত বেঁধে রাখতে হয় এখন। শেকল দিয়ে!

সংসার কি নিষ্ঠুর। কি কঠোর!

রাঙা টুকটুকে মুখখানায় চাপা অহংকারের দীপ্ত সৌন্দর্য এখনও চোখের ওপর ভাসে। সেই নতুনবৌ। মাথা খারাপ হয়ে গেছে। টাকার শোকে।

মনটাকে কিছুতেই আর স্থির করতে পারছে না মৃগনয়নী।

সমস্ত দিনটা বসে বসে ভাবে। একটা কথাও বলতে ইচ্ছে হয় না কারো সঙ্গে।

রাত্রে বনবিহারী এলে তাকে চিঠিটা দেখাতে হয়।

—দু'শ টাকা।— মায়ের মৃত্যুর শোকের চেয়ে দু'শ টাকা দাবির বিভীষিকা বনবিহারীকে বেশী বিচলিত করে।

—তুমি কি যাবে?

বনবিহারীর চোখদুটো ছলছল করে,—আমার শরীরও ভাল নেই ন'বৌ।

—তবে না হয় টাকা পাঠাও।

—কোথায় পাব?

—পাবে। পঞ্চাশটা টাকা অন্তত পাঠাও।

মাথায় হাত রেখে বলে বনবিহারী,—তাই বা কোথায় পাই!

মৃগনয়নী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। একখানি গয়নাও ওর নেই যে সেইটে বিক্রি করে টাকা দেবে, তাই বলে,—তোমার বাবুর কাছে ধার নাও না?

—তা চাইতে পারি। কিন্তু শোধ করব কি করে?

—মাসে মাসে পাঁচ টাকা করে কেটে নেবে মাইনে থেকে।

—দেখি। চেয়ে দেখি।

খানিকটা আশ্বস্ত হয় বনবিহারী। মৃগনয়নীও।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বনবিহারী বলে,—কিন্তু এখানেও ত আমাদের কিছু কাজ করতে হবে।

—তা হবে।—মৃগনয়নী ঠোঁটটা দাঁতে চেপে বলে,—সে টাকা আমি দেব সংসার থেকে।

কি করে যে দেবে বনবিহারী বুঝতে পারে না। তবু আর কথা বলে না।

পঞ্চাশটা টাকা দোকানের মালিকের কাছ থেকে ধার করেই পাঠাতে হয়। এগার দিন পরে তাদের কিছু কাজও করতে হয়। এতে আর সংসারের অনটন যেন আরও বেড়ে চলে দিনদিন।

আর দিনকতক পরে কমলের পরীক্ষা। ছেলেটা দিনরাত পড়ে পড়ে চোখের ওপর রোগা হয়ে যাচ্ছে, একটু দুধ দেবার মত পয়সাও নেই। নীরবে দিন কাটাতে হয়। বনবিহারীও কথা বলতে ভয় পায়। মৃগনয়নীও কথা বলে না।

আবার বোবা দিন বোবা রাত কাটতে থাকে। একভাবে। একটানা।

পঁচিশ

খবরটা পেয়ে বেলা এগারোটার সময় একটা বড় মাছ হাতে করে দোকান থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছে বনবিহারী। এমন খবর জীবনে সবাই কি পায়?

কমল প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে পরীক্ষায়। তাছাড়া চারটে লেটার। মানে, খুব ভাল পাস।

বনবিহারীর মুখখানা বহুকাল পরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বহুদিন পরে হাসতে ইচ্ছে হয় খুব। খুব জোরে কথা বলতে ইচ্ছে হয়। যে দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায় বনবিহারী, সেই মালিককে গিয়ে আজ বলে,—আজ একটু সকাল সকাল যাব।

—কেন ?— চশমাটা মুছে তাকান দোকানের মালিক।

—আমার ছেলে খবর দিয়ে গেল ও পাস করেছে ম্যাট্রিক। চারটে লেটার পেয়েছে। বোধহয় টাকাও পাবে।

মালিক ওর বলবার ধরনে একটু থমকে যায়। তারপর বলে,—আচ্ছা, যাও।

—চারটে টাকা—।

—আবার টাকা! আচ্ছা নাও। তোমার ছেলেটিকে একবার দেখিও।

মালিকের ইচ্ছে ওঁর ফিফ্‌থ ক্লাসে দুবার ফেল করা ছেলেটাকে পড়াবার জন্যে যদি বনবিহারীর ছেলেকে সামান্য টাকায় বহাল করা যায়! কথাটা অবশ্য বনবিহারীর কাছে এখনই পাড়েন না।

বনবিহারী আড়াই টাকায় মস্ত একটা মাছ কিনে নিয়ে বাড়ী এসে হাজির। মৃগনয়নী অবাক। তবু মুখে কিছু বলে না।

বনবিহারীর মুখখানা বেশ রাঙা দেখাচ্ছে আজ। কমলকে ডেকে সামনে বসায়। বলে,—তোর মাকে পেন্নাম করেছিস ?

কমল মুখটা নীচু করে মাথা নাড়ে।

—আয় কাছে আয়!

কমল আস্তে আস্তে কাছে আসে। কমলের রোগা পিঠখানায় হাত বোলায় বনবিহারী।

স্বপ্ন নাকি সফল হয় না? আজ ওর স্বপ্ন সফল হয়েছে। পিঙ্গল চোখদুটো ওর চিকচিক করে। মৃগনয়নী পাশে দাঁড়িয়ে ফিক ফিক করে হাসে।

বনবিহারী বলে,—ওকে আজ বেশী করে মাছ দিও। যত খেতে পারে।

—আর আমাকে ?—অমল এগিয়ে আসে।

—তোকেও।—হো হো করে প্রাণ খুলে হাসে বনবিহারী।

ভাল করে তামাক সাজে। হুঁকোটা হাতে নিয়ে বড় আরাম করে তামাক টানে আজ। মৃগনয়নী মাছটা রাঁধবার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়।

—কমলির মাকেও কখানা মাছ দোব ?

—দিও।—তামাক টানতে টানতে বনবিহারী চোখ বুঁজেই বলে।

—আর ভবানীর মাকেও কখানা—।

—দিও।

মৃগনয়নী অমলকে বলে,—একটু তেল আনতে হবে বাবা।

বনবিহারী বলে,—আমার পকেট থেকে একটা টাকা নিয়ে যা। যা লাগবে নিয়ে আয়।

অমল পকেট থেকে টাকা নিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে যায়।

এক একটা দিনই যেন ভোর হয় শুধু অনেক হাসি নিয়ে। সেদিন শুধু হাসি আর আনন্দ।

হোক না একটা দিন। হোক না মাত্র কয়েক ঘণ্টা। এইটুকু হাসিই যেন সামনের আরও অনেকগুলো কাজ করবার শক্তি দেয়। অনেক সাহস দেয়। অনেক সহজ করে তোলে অন্তরকে।

মৃগনয়নী আজ হাল্‌কা হয়েছে বটে, কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি। সংযমের তীর টুকু ওর ভেসে যায়নি খুশির তরঙ্গে। তেমন অভ্যাস ত ও এতদিন করে নি। উলটো অভ্যাসই করেছে।

এক বাটি তেল এনে বনবিহারীর সামনে দেয় মৃগনয়নী,—নাও, স্নান করে নাও।

বনবিহারী চোখদুটো আধ বোঁজা করে তামাক টানছিল।

বলে,—যাই। তোমার রান্না হোল ?

—রান্না ত শুধু মাছ! ডাল ভাত আলুভাতে ত করাই আছে।

—তাই বলে, মাছটা তাড়াতাড়ি রেঁধো না। একটু জুত্‌ করে রাঁধ।

মৃগনয়নী একটু হেসে নীচে নেমে যায়।

বনবিহারী ওঠে। তেল মেখে গামছা কাঁধে নিয়ে নীচে নামে।

যেতে যেতে শোনে অমল বলছে কমলকে,—ওঃ! দাদার কি আদর আজ!

কমল বলছে,—বাজে বকিস নি।

হাসতে হাসতে নেমে যায় বনবিহারী।

স্নান খাওয়া সেরে ওপরে উঠে আসে ওরা সবাই। বনবিহারী পানটা চিবোতে চিবোতে তামাক টানে। চোখ দুটো আধ বোঁজা করে আয়াসে মৌতাতে।

—কমল। কমল বারান্দা থেকে আসে,—বাবা ডাকছ ?

অমলও আসে।

বনবিহারী বলে,—কাল পরশু আমার সঙ্গে একবার দোকানে যাবি।

কমল ঘাড় নাড়ে।

—আমাদের বাবু তোর সঙ্গে একবার আলাপ করতে চেয়েছে।

কমল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—তুই ইংরেজীতে কথা বলতে পারবি ? তাহলে ব্যাটা খুব জব্দ হয়।

নিজেই হাসে বনবিহারী, কমল ইংরেজীতে কথা বলবে এই গর্বে। দেখুক ব্যাটা মালিক সে একটা যা-তা মানুষ নয়।

কমল চুপ করেই থাকে। অমল বলে,—দাদা কি পড়বে জান বাবা ?

—কি ?

—কলেজে। আই. এস্-সি। মানে খুব শক্ত পড়া।

– হোক শক্ত! ওর কাছে আর শক্ত কি ?—তামাক টানতে টানতে বলে আবার বনবিহারী,—কবে ভর্তি হতে হবে ?

—সামনের মাসে।

—টাকা লাগবে কত ?

—টাকা লাগবে না।—মাথাটা নীচু করেই কমল বলে।

বনবিহারীর চোখদুটো খুলে যায়,—টাকা লাগবে না কেন ?

—ফ্রিশিপ্ পেয়ে যাব। তাছাড়া—।

—আবার কি ?

—বইও ভাবছি যোগাড় করব কতক কতক।

—কোথা পাবি ?

—দেখি।—কমল আর কিছু বলে না।

—কলেজের অন্য খরচা ত' আছে ?—বনবিহারী বলে।

—তাও লাগবে না।

—মাসে দশটাকা করে বোধহয় স্কলারশিপ্ পাব।

—দশটাকা মাসে।

বনবিহারীর ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয় হাসিতে, তামাকটা আজ কি মিষ্টি লাগে। পাতা মাদুরটার ওপর বেশ লেপটে বসে বনবিহারী।

কমল আর অমল চলে যায়।

বনবিহারী স্বপ্ন দেখছে। অনেক রঙ, অনেক রঙীন। স্বপ্ন কি শুধু স্বপ্ন ? না। কমল স্বপ্নকে সত্য করে তুলেছে। আজ তাই পঁয়তাল্লিশ টাকার দরিদ্র সংসারেও স্বপ্ন দেখতে বাধা নেই। মনের রঙ ধরাতে আপত্তি কি ?

কলেজ। আই. এস-সি। ডাক্তার কমল। একটি টুকটুকে বউ। তার পাটের অপিসের সায়েবের মতই কমলের মেজাজটা স্পষ্ট ভেসে ওঠে মনের ওপর।

ওই বয়সে ঝক্‌ঝকে প্যান্ট, কোট, কমল অপিসে ঢুকল। দাঁড়িয়ে উঠল সবাই। কিন্তু ডাক্তার হলে আবার অপিস কি করে হয়? নিজের কাছেই ধরা পড়ে নিজের মনের অসংবদ্ধ কল্পনা।

তা হোক। অপিসে কি সায়েব ডাক্তার থাকে না? ক্লার্ক সায়েবের সঙ্গে কি কমল ইংরেজীতে কথা বলতে পারবে না? খুউব।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে গড়গড় করে ইংরেজী বলছে কমল। জলের মত। সায়েব থ' মেরে গেছে। বলছে, তোমায় বিলেত পাঠাব। তারপর বিলেত! ভাবতে আপত্তি কি? বিলেতে কমল যাবেই। ক্লার্ক সায়েব ওকে সেধে পাঠাবে, ও কি না গিয়ে পারে!

বিলেতে যাবার দিন প্রণাম করতে এলো কমল ওকে। ও জড়িয়ে ধরল কমলকে। একি জড়িয়ে কি ধরল! দিবাস্বপ্ন ভাঙল। তাকিয়ে দেখে মৃগনয়নী ওর পাশে কখন এসে পা ছড়িয়ে বসেছে আর ও জড়িয়ে ধরেছে মৃগনয়নীর একখানা মাংসল পা।

—ও মা! একি!

মৃগনয়নী সরে বসে। বনবিহারী লজ্জিত হয়। পাশ ফিরে শোয়। মৃগনয়নী কি একটা সেলাই করছিল। বোধহয় অমলের জামার পকেটটা। ছিঁড়ে খুলে গেছে।

বনবিহারী ওপাশ ফিরেই বলে,—শুনেছ?

—কি?—মৃগনয়নী সেলাই করতে করতেই বলে।

—কমলের পড়ার খরচা কিছুই দিতে হবে না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, ও নাকি মাসে মাসে দশটাকা করে পাবে।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে।

—ওই টাকাটা ওর নামে পোস্ট অপিসের ব্যাঙ্কে রাখলে কেমন হয়?

মৃগনয়নী একটু বিরক্ত হয়। এ ধরনের আলাপ ভাল লাগে না ওর। কাঁঠাল গাছে, এখন থেকে গোঁপে তেল!

—প্রথম মাসে না হয় তোমায় একখানা শাড়ী কিনে দিক।

মৃগনয়নীর হাসি পায়, বিরক্তিও লাগে। চুপ করে থাকে।

আপনা-আপনি চুপ করে বনবিহারী। আবার স্বপ্নের আমেজ এসেছে। এবারে স্বপ্নটা বিলেত থেকে কমলের ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়ায় নেমে এসেছে।

সে চলবে না। তিনি যে মেয়ে গছিয়ে আমার ছেলেকে পর করে নেবেন।

সেটি চলবে না। আমার ছেলেকে বিয়ে দোব। নগদ পাঁচ হাজারের এক পয়সা কম নেব না।· জোর করে যদি মেয়ে দিতে আসে। আসবেই। মারতে আসবে। মারতে অমনি এলেই হোল? ব্যাটাচ্ছেলেকে থুড়ে দোব না? খবরদার এক পা।—

মৃগনয়নী ঠেলা মারে বনবিহারীকে,—কি হোল তোমার?

স্বপ্নে মারামারি করতে গিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করছিল বনবিহারী। চমকে উঠে পড়ে।

—অমন গোঁ গোঁ আওয়াজ কচ্ছিলে কেন?

আবার লজ্জিত হয় বনবিহারী,—কই? ও বোধহয় সর্দি আটকে গিয়েছিল।

—তবু ভাল।

মৃগনয়নী নিজের কাজে মন দেয়। আবার বনবিহারীর ঘুম-ঘুম আসে। এবারে আর স্বপ্ন নয়। ঘুম।

ঘুমের পর ঘুম। রাতের পর রাত কেটে যায়। মাস কয়েক বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছে বনবিহারী।

দোকান থেকে ফিরে কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ে। একটি লম্বা ঘুমে রাত কাবার। মাঝে একটু শান্তিভঙ্গ হয়েছিল অমলকে নিয়ে। অঙ্কে ফেল করেছিল আধ বছরি পরীক্ষায় আর একদিন মায়ের আঁচল থেকে আটআনা পয়সা চুরি করে ফিরেছিল রাত নটায়।

মারধর একটু করতে হোল। তারপর কমলের ওপরই ভার দিতে হোল। তুই ওর অঙ্কটা একটু দেখিস বাবা।

কমল তারপর থেকে ওকে নিয়ে বসে অঙ্ক করাতে। পড়ায়ও মাঝে মাঝে। আর ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি।

একদিন ঘুম আরও আরামের হয়েছিল, যেদিন দোকানের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কমল।

মালিক মশাই ফতুয়ার বোতামটা ভাল করে লাগিয়ে শুদ্ধ বাংলায় বললেন,—বড়ই প্রীত হলাম। আনন্দিত হলাম। এত উত্তম ভাবে পাস করা, একি ইয়ে মানে যাই হোক, এর পর কি করা হবে?

—পড়ব।—বললে কমল।

—কি পড়া হবে?

—আই. এস-সি!

—উত্তম! উত্তম! আরও বেশী প্রীত হলাম।

এর পরই আসল কথাটা পাড়লেন,—আমার সন্তান। ওই একটি মাত্র পুত্র। বুদ্ধিমান, সূক্ষ্মবুদ্ধিধারী কিন্তু একটু ইয়ে—। তা' বাপু, তুমি যদি তাকে একটু দেখাশুনো করতে পার!

কমল চুপ করে থাকে।

বলেন আবার,—বুঝেছি। কি বলতে চাইছ! তা সাধ্যমত দশ পাঁচ টাকা দোব।

বনবিহারী পুলকিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পাশে।

কমল গম্ভীর মুখে মালিকের দিকে তাকিয়ে বললে,—আমার একটু অসুবিধে আছে।

—কি অসুবিধে?

একটু চুপ করে থাকে কমল। বনবিহারীর বুক কাঁপে, কি না জানি বলবে কমল।

—কলেজ খুললে একটু বেশী পড়তে হবে।

—তাত হবেই। ওরি ভেতর একটু ইয়ে করে—।

—আজ্ঞে পড়াটা একটু শক্ত।

বনবিহারী এতক্ষণে কথা বলে,—খুব কঠিন। ষাট সত্তর খানা বইই পড়তে হবে।

—তা উত্তম। কিন্তু একটু সময় করতেও পারবে না?

—মাপ করবেন।

কি সুন্দর পরিষ্কার জবাব দিতে পারে কমল। বেটাচ্ছেলের মুখটা চুন হয়ে গেল।

একটু ভয় হোল বনবিহারীর। এর পর থেকে হয়ত পান থেকে চুন খসলেই তাকে গালাগাল করবে লোকটা।

তা করুক। তবু কমল যে মুখের ওপর এমন স্পষ্ট জবাব দিতে পারে দেখে অবাক হয়েছে বনবিহারী। খুশিতে মন ভরে উঠেছে।

এই একদিন গভীর আরামে ঘুমোতে পেরেছিল বনবিহারী। মৃগনয়নীকে বললে, —শালার মুখটা চুন হয়ে গেল!

মৃগনয়নীর হাসি পায়,—তুমি দেখছি তোমার মনিবকে খুব সম্মান করো ?

—সম্মান! ওই বেটাচ্ছেলেকে সম্মান! তিনমাস পর মাইনে বাড়াবে বলে আজ অব্দি বাড়াল না।

—আর বাড়াবেও না।—মৃগনয়নীর খুব হাসি পায়।—তোমার ছেলে আরও ভণ্ডুল করে দিয়ে এসেছে।

—তা করুক। তবু কমলের বুকের পাটা দেখে চোখ জুড়োল! কোত্থেকে ও যে অত সাহস পেলো।

মৃগনয়নী এবারেও হাসে। কেন পাবে না। ওর মামার বাড়ীর রক্ত কি ওর গায়ে নেই! দুর্দান্ত জমিদারের রাজসিক রক্তের উদ্দামতা কি কিছু পাবে না ?

পাবে। কিন্তু সেইজন্যেই মৃগনয়নীর সবচেয়ে ভয়। উদ্দামতার ফল সংসারে কখনও ভাল হয় না।

কর্তাবাবুর বিশাল মুখখানা আর চোখের সেই জান্তব সাহসের অসমতার কথা আজও ভুলতে পারেনি মৃগনয়নী। কর্তাবাবু কখনও বুক নীচু করে চলতে জানতেন না। বুক উঁচু করেই চলেছেন নিজের গর্জনে নিজে মত্ত হয়ে। সে মত্ততার ফলও ভাল হয়নি।

ভাল হয় না। একটা নিশ্বাস ফেলে চলে যায় মৃগনয়নী।

বনবিহারী মৃগনয়নীর মনের কথা বোঝে না। অবাক হয়ে চুপ করে থাকে সায় না পেয়ে।

এমনি করেই ত' কাটছিল। কিন্তু ইদানীং কলেজ থেকে ফিরতে কমলের অনেক রাত হয়। এত রাত অব্দি আবার কলেজ কি ?

প্রথম কেউ কিছু বলত না। ভাবত হয়ত পড়তে যায় কোথাও।

মৃগনয়নী বলত,—জানো, বড় রাত করে ফেরে কমল।

বনবিহারী বলত হেসে,—তা ফিরুক. ওসব খুব কঠিন পড়া। কোথাও হয়ত পড়তে যায়।

উত্তরে মন উঠত না মৃগনয়নীর। কমলের একটা অস্বাভাবিক পরিবর্তন ওর নজরে পড়ে। মায়ের নজরে সন্তানের যে কোন একটু পরিবর্তনই প্রথম ধরা পড়ে। মৃগনয়নী বেশ বুঝতে পারে, কিছু একটা হয়েছে ওর।

ওর টিকালো নাকের দুপাশে ডাগর চোখদুটো আরও গভীর হয়ে উঠেছে।

অনেক সময় এত গভীর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে যে ও যেন ভুলে যায়, ও কোথায় আছে।

মৃগনয়নী দুতিনবার তাকে ডাকে,—খোকা, অ খোকা!

হয়ত তৃতীয় ডাকে সাড়া দেয়।—কি বলছ?

—কি ভাবিস অত?

উত্তর পাওয়া যায় না কমলের কাছ থেকে। অসহ্য নীরবতা।

মৃগনয়নীর বুকটা কাঁপে,—কি ভাবিস দিনরাত?

কমল মায়ের দিকে তাকায়। একটু হাসে।

—বড় খিদে পেয়েছে মা! মুড়ি-টুড়ি যা হোক কিছু দাও না?

মৃগনয়নী একটু আশ্বস্ত হয়। জলখাবার এনে দেয়। তবু শান্তি নেই। সন্তানের চিন্তায় শান্তি অনেকটা ব্যাহত হয়েছে মৃগনয়নীর।

নাড়ী ছেঁড়া কিনা। নিজের রক্তের জিনিস! বলত মৃগনয়নী। ওর ওপর টানটা ছিঁড়ে আসা বড় কঠিন বাবা! আজ আর কোন ক্ষোভ নেই, কিন্তু তখন-তখন বুকের ভেতরটা কি যে করত, কি বলব!

কথাটা সত্যি! মৃগনয়নীর হাসি হাসি মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। নিজেকে এমন চিরে চিরে দেখবার সাহস, কঠোর সত্যকে জীবনের প্রতিটি নিষ্ঠুর মুহূর্তের বিচারে চিনে নেওয়া কি সহজ?

হাসত মৃগনয়নী,—এই ত' সবচেয়ে সহজ বাবা! আমরা ত' সহজ হতেই ভুলে যাই। তাই ভুল করি। সহজ হতে পারলে সংসারে ভুল হয় না।

তবু সহজ হওয়া সহজ নয়। যতই বলুক মৃগনয়নী।

কমলের পরিবর্তনটা মৃগনয়নীকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলল।

সেদিন ফিরতে কমল অনেক রাত করেছে। প্রায় সাড়ে বারোটা।

বনবিহারী একটু চিন্তিত হয়েছিল। ফেরবার পর আশ্বস্ত হয়ে বললে,—আই. এস-সি-টা বোধহয় বড্ড কঠিন।

শুয়ে পড়ল বনবিহারী।

মৃগনয়নী কমলকে ভাত দিতে গেল অত রাত্রে। মুখখানা ওর নীল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। যেন শুকিয়ে যাচ্ছে ছেলে। কি হোল ওর।

—কি হয়েছে বলত? আমার কাছে লুকোসনি খোকা!

কমল নীরব।

মৃগনয়নীর গলাটা কাঁপে,—আমাকে লুকোবি এমন কি আছে?

কমল নীরবে মায়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে মাত্র। তবু চিন্তা গাম্ভীর্যের কুয়াশা ওর মুখ থেকে যায় না। থমথমে মুখখানা ওর।

বৃথা ওকে বলা। একটা কথাও বলবে না। অগত্যা চিন্তার পাষাণ বুকে নিয়ে মৃগনয়নীই চুপ করে যায়।

সেদিন চাল আনতে মৃগনয়নী কমলকে একখানা দশটাকার নোট দেয়। ওইটেই মাসের এ কদিনের সম্বল। চাল, তেল, নুন, ডাল, সবই কিছু কিছু আনতে হবে।

কমল নীরবে দশটাকার নোটখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

বেরোবার আগে মৃগনয়নী চেঁচিয়ে বলে,—উনুনে কিন্তু আগুন দেয়া হয়েছে। দেরি করিসনি যেন।

কমল বেরিয়ে যায়।

অমল ইস্কুলে যাবে। রৌদ্রটা তখন বারান্দার আধাআধি। মানে দশটা বাজে।

—একটু তেল দাও মা। চান করব।

মৃগনয়নী বলে,—কমল দোকান থেকে না এলে কি করে দিই। সেই ত' কখন গেছে। একবার দেখত বাবা, দোকানের দিকে এগিয়ে। উনুন জ্বলে খাক্ হয়ে গেল।

অমল গামছাটা প্যান্টের ওপর জড়িয়েই দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

খানিকক্ষণ পর অমল ফিরে আসে।—দাদা ফেরেনি?

—না ত।

অমল মাথা চুলকে বলে,—দাদাকে ত' কোন দোকানে পেলুম না মা। অনেক খুঁজলুম।

মৃগনয়নী ঘর থেকে গায়ে জড়াবার একটা চাদর নিয়ে আসে।

—চল আমিও বেরোই। গেল কোথায়?

মৃগনয়নী অমলকে নিয়ে বেরোয়। পাড়ার দোকান, কাছাকাছি সব দোকানে ঘোরে। কোথাও নেই। কানদুটো ঝাঁ ঝাঁ করে মৃগনয়নীর। রোদের তাপে তালু দিয়ে আগুন বেরোয়, ফিরে আসে হতাশ হয়ে।

—খিদে পেয়েছে মা।—বলে অমল।

দুটো পয়সা দেয় মৃগনয়নী।— মুড়ি এনে খা।

বাড়ী এসে মৃগনয়নীর রাঙা মুখখানা ক্রমশঃ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। ওকি তবে গুণ্ডার হাতে পড়ল, না কোন খারাপ লোকের— মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে মৃগনয়নী।

এগারোটা বাজল। বারোটা। একটা বাজতে আর দেরি নেই।

কমল ফিরে এলো। মুখখানা শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। চুলগুলো রুক্ষ অগোছালো।

মৃগনয়নী তাকায় শুধু একবার। ওর চোখদুটোও রাঙা হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন করে,— কি হোল? চাল কই?

কমল কথা বলে না।

—টাকা কই?

—নেই।— মাত্র একটা কথা বলে অমল।

মৃগনয়নী ফিসফিস করে তর্জন করে ওঠে,—হয় বল কি হয়েছে তোর। নয়ত আমায় মেরে ফেল।

টস টস করে জল পড়ে মৃগনয়নীর রাঙা চোখ বেয়ে; কমল তাকায়। ওর চোয়াল-দুটো কঠিন হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে কথা বলে।

—সে কথা শুনলে তোমার রক্ত জল হয়ে যাবে মা।

কি এমন কথা? মৃগনয়নীর মুখটাও কঠিন হয়ে ওঠে বলে,—বুকের রক্ত আমার পাথর। জল হবে না। বল তুই।

আর উত্তর নেই। আর একটা শব্দ বেরোয় না কমলের মুখে।

কমল ওপরে চলে যায়। মৃগনয়নী আর পারে না।. পেছন পেছন ওপরে ওঠে।

পেট থেকে কি একটা বার করে কমল ওর বইয়ের তলায় রাখে। কাগজ দিয়ে ঢেকে। তারপর আবার বেরিয়ে আসে। বারান্দায় বসে থাকে।

মৃগনয়নী ঘরে ঢোকে। বইয়ের তলা থেকে জিনিসটা বার করে। কাগজে মোড়া। কাগজ খোলে। ভেতর থেকে বেরোয় ছোট একটি পিস্তল। পিস্তল! মৃগনয়নীর বুকের রক্ত এবার সত্যিই জল হচ্ছে। এর পর কি হয়েছে মৃগনয়নী আর জানে না। শুধু জানে ওর গা ঘেমে উঠেছিল, হাত পা অবশ হয়ে গিয়েছিল।

যখন জ্ঞান হয়, মৃগনয়নী দেখে কমল ওর চোখে মুখে জল দিচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে অমল। কমলের চোয়াল দুটো কি কঠিন। যেন স্ক্রু আঁটা ইস্পাতের।

গনয়নীর চোখ দুটো বেয়ে জল পড়ে। কমল এত কঠোর! নিজের সন্তান এত নষ্ঠুর হতে পারে!

—আমাকে বল। সব খুলে বল!

মৃগনয়নী উঠে বসে।

কমল মায়ের দিকে তাকায়। অমলকে বলে,—এ ঘর থেকে যা!

অমল বেরিয়ে যায়।

কমল এবার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে,—কি আর বলব মা। যেখানে আছি, সখান থেকে বেরোবার আর পথ নেই, একমাত্র মৃত্যু ছাড়া।

—তবে আমাকেও সেখানে নিয়ে চল!

—পাগল নাকি!

—কি হয় সেখানে?

—দেশের কাজ। দেশ স্বাধীন করতে প্রতিজ্ঞা করেছি আমরা।

মৃগনয়নীর গাল বেয়ে জল পড়ে।

—তুই এমন হলি খোকা?

কমল হাসে,—খারাপ ত' হইনি মা। দেশের কাজ খারাপ নয়।

আর কথা বলে না মৃগনয়নী। কথা বলা আর বৃথা। কাঁদাও বৃথা।

অনেকক্ষণ মুখ নীচু করে থেকে কি যেন ভাবে মৃগনয়নী। হয়ত বা নিজেকে শক্ত রে। তারপর মুখ তোলে। নীচে চলে যায়।

কমলও বসে থাকে ওপরে। সবাই নীরব। বোবা সরাইখানা যেন।

খানিকক্ষণ পরেই বনবিহারী আসে। নীচে মৃগনয়নী চুপ করে থাকে। শুধু চোখের জল পড়ে।

—কি ব্যাপার কি?—বনবিহারী বসে পড়ে ওখানে।

মৃগনয়নী তাকায় বনবিহারীর দিকে। আস্তে আস্তে সব কথাই জানাতে হয় বনবিহারীকে। সব কথা। কিছুই গোপন করে না। বলতে না পারলে আর বাঁচবে না গনয়নী। বুকে যেন পাষাণ চেপে আছে। এতক্ষণে যেন একটু হালকা বোধ করে ও।

শুনে বনবিহারীর মুখখানা সাদা হয়ে যায়। কমল এমন হোল! সত্যকে কি রে আজ গ্রহণ করবে বনবিহারী। কত আশা! কত স্বপ্ন! ডাক্তার হবে কমল! ায়েব হবে। টুকটুকে বউ! আরও কত অসার স্বপ্ন! সবই কি আজ একমুহূর্তে রমার হয়ে গেল।

বোবা হয়ে গেছে বনবিহারী। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে মৃগনয়নীর দিকে। চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থাকে একভাবে। ওর বুকের পাঁজরগুলো হাঁপরের মত ওঠানামা করছে।

দিনের পর দিন বছরের পর বছর বোবার মত সকাল সন্ধ্যা খেটেছে জোয়ালে বাঁধা বলদের মত। কত অপমান কত অসহ্য অভাব সয়েছে নীরবে, মুখ নীচু করে। কিসের আশায়?

বনবিহারী নিজের সমস্ত জীবনটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখতে চায় যেন। পিছনে ফেলে আসা অনেক বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে দিন। এগুলো সবই কি এমন করে বৃথা হয়ে গেল!

ওরা বসে থাকে, কিন্তু সময় বসে থাকে না। বেলা বেড়ে যায়। বনবিহারী একটা বড় নিশ্বাস ফেলে। আবার দোকানে যেতে হবে। আবার সেই ফতুয়াপরা মালিকের অকারণ চিৎকার আর খোঁটাগুলো নীরবে সইতে হবে। মাস গেলে টাকা ঘরে আনতে হবে।

উঠে পড়ে বনবিহারী। চামড়ার তালিদেওয়া জুতোটা পায়ে গলায়। পা যেন আর উঠতে চায় না। তবু যেতে হবে। আবার সেই একই রাস্তায় যেতে হবে হেঁটে। ট্রামের পয়সাও নেই একটা।

কোঁচার খুঁটটা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যায়।

না খেয়ে চলে গেল। দেখল মৃগনয়নী। তবু কিছু বলতে পারল না।

এরপর কি আর খাবার কথা কিছু বলা যায়! আবার কলে জল আসবে। বাসন মাজতে হবে। উনুনে আগুন দিতে হবে। ঠাকুরের প্রদীপ জ্বালাতে হবে।

কালও এ সব কাজেরই মানে ছিল। আজ আর কোন মানে নেই। শুধু করতে হবে। এই মাত্র।

ছাব্বিশ

শরীরটা একেবারেই ভেঙে পড়ল বনবিহারীর। মৃগনয়নী যেন জানত যে বনবিহারী সইতে পারবে না। কিন্তু এমন করে যে ভেঙে পড়বে ধারণা করতে পারেনি।

পাঁজরগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। মাংস যেটুকু দেহে ছিল, সেটুকুর চিহ্ন আর ইল না।

মৃগনয়নী দেখল। বলল না কিছু। বলবার আর কিই বা আছে! অম্বলটা ্টের। যা খায়, কিছুই হজম হয় না। যেমন খায়, তেমনি পড়ে।

—ডুপা চললে মাথা টলে।—বলে বনবিহারী ক্ষীণ কণ্ঠে।

তবু দোকানে বেরোতে হবে। জামা পরে দরজার বাইরে আসতে হয়।

মৃগনয়নী তাকিয়ে থাকে শুধু।

একবার বলে,—আজ না হয় দোকানে নাই গেলে!

বনবিহারী বিশুষ্ক মুখে হাসে.—না গেলে খাবে কি?

—এমন করে মরে গিয়ে খাওয়াবার কি দরকার? আজ দোকানে যেতে পাবে । শুয়ে থাক।

কাচকলার ঝোল ভাত খেয়ে বিকেলে যদি পার যেও। বনবিহারী মৃগনয়নীর ্ে তাকায়। একটু দাঁড়ায়। কি একটু ভাবে।

তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলে,—না। ঘুরেই আসি।

মৃগনয়নী কিছু বলে না।

আপনা-আপনিই বলে বনবিহারী,—বাবুর গালাগালটা বড অসহ্য লাগে! ্না কামাই করে ওবেলা গেলে যাচ্ছেতাই করে বলবে। তখন কিযে মনে হয়—।

মৃগনযনার আর কিই বা বলবার থাকতে পারে!

—ছেলেরা আর যাই করুক, চাকরী যেন জীবনে না করে।

বলে বনবিহারী। আর একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকে। যেতে ইচ্ছে আর হয় না। চলতে যেন আর চায় না। তবু যেতেই হবে যতক্ষণ বেঁচে আছে। নিশ্বাস ্কা অব্দি থামলে চলবে না।

বিশ্রাম! দোকানের বাবু বলেন, মরে গেলে। তার আগে কামাই-টামাই করা ই চলে! মানে কম্মক্ষেত্র তো'!

কথাগুলো মিঠে মিঠে,—সবাই সংসারে কাজ করতে জন্মেছে। দোকান পাইলে ে থাকা মানে কাজে ফাঁকি। ওটা ভগবানও সইবে না।

আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে দিয়ে এক একটা গরীব মানুষকে বারো ঘণ্টা াটিয়ে নেয়াটা ভগবান সইবে।

কর্মক্ষেত্রে শুধু কাজ করাই কর্তব্য। টাকা পয়সার দিকে তাকিও না। কর্মযোগের

এমন অপরূপ ব্যাখ্যাকে কেমন নিখুঁত ভাবে কাজে লাগিয়ে গেছে লোকটা ভাবলে অবাক লাগে।

উনি মালিক, উনি শুধু ব্যবসাই বেশী বোঝেন না, গীতাও বোঝেন বেশী। না বুঝলেও বেশী বোঝেন।

বনবিহারীকে ধীরে ধীরে যেতে হয় দোকানে। ফিরতে হয় দুপুরে আবার খেতে। দুপুরে ফেরাটাই আরও কষ্টকর হয়।

ওই জন্যে বনবিহারী আজকাল সবদিন দুপুরে ফেরে না। শরীরটা ভেঙে আসে। সবাই যখন চলে যায়, দোকানের মালিকও চলে যান। তখন ও দোকানের একটা বেঞ্চির ওপর শুয়ে খানিকটা গড়িয়ে নেয়। একটু গড়াগড়ি করে আরাম লাগে। খিদে হয়ত পায়। মরেও যায় খিদেটা।

একেবারে রাত্রে বাড়ী এসে স্নান করে ফেলে। তারপর কিছু খেয়ে ঘুম।

মৃগনয়নী দেখে। এক একদিন বলে,—এমন করে ত আর বেশী দিন চলবে না!

বনবিহারী হাসে।—না চলল! বাঁচবার সখ মিটে গেছে।

চোখের তারাদুটো ওর এক সুগভীর হতাশায় ঘোলাটে হয়ে গেছে।

মৃগনয়নী তবু একবার বলে,—না হয় ট্রামে এসো দুপুরে খেয়ে যেও।

—আবার ট্রামের পয়সা খরচা!

—তা হোক। খরচা আমি বুঝব।

বনবিহারী আর কোন কথা বলে না। পরদিনও দুপুরে আসে না। আসে অনেক রাত্রে। মৃগনয়নী গম্ভীর হয়ে চুপ করে থাকে।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে বনবিহারী শুতে আসে। মৃগনয়নী শুতে আসে আর খানিক পরে। এসে দেখে বনবিহারীর তামাক খাওয়া হয়ে গেছে। বসে আছে চুপ করে। তাকিয়ে রয়েছে অমল আর কমলের দিকে। কমল ঘুমোচ্ছে। অমল ও।

কমল আজকাল খুব বেশী রাত করে না ঠিকই। কিন্তু সকালে বেরিয়ে বাড়ী আসে সেই রাতে। এর ভেতর আর বাড়ী আসে না। অমলও আজকাল একটু রাত করছে। দুএকদিন ধমক দিয়েছিল মৃগনয়নী। আর ভাল লাগে না। একটা কথা ও মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছে যে ধমক দিয়ে ছেলে ভাল করা যায় না। বনবিহারীকে কিছু বলে না। অসুস্থ শরীরে হয়ত বেশী মারধোর করে বসবে। মনে মনে বেশ বুঝতে পারে মৃগনয়নী যে স্কুলের ছেলে অমল যতটা রাত্রি করে আর

য় ভাবে চলাফেরা করে তাতে ওর ভবিষ্যৎ খুব একটা কিছু নেই। উল্টো কোন বিপত্তি ঘটে যেতেও পারে।

সেদিন খুব নরম স্বরে জিজ্ঞেস করে মৃগনয়নী,—পড়াশুনা ত কিছুই করিসনে, কি করে পাশ করবি ?

অমল ভাত খেতে খেতে বলে,—ও পরীক্ষার আগে মেরে দোব।

—কি করে ?

—সে সব তুমি জান না। অনেক কায়দা আছে।

মনে মনে হাসে মৃগনয়নী। একি কুস্তির প্যাঁচ। কায়দা করে মেরে দোব!

—এত রাত অব্দি কোথায় থাকিস ?

মাথাটা চুলকে দুটো হাই তোলে অমল।

বলে,—ও ইয়ে—আমাদের ইয়ং ড্রামাটিক কেলাবের থিয়েটার হবে কিনা।

—তুই থিয়েটার করবি ?

—আমরই ত মেন পাট। পারুলের পাট আমার।

পারুলের পাট! বলে কি অমল ?

—পারুল কে ?

—ওই যে মনোতোষের সঙ্গে ইয়ে হবে, তার পর কাট্ মারবে। খুন করে ধরা পড়বে। কি বইখানা মা! তুমি যাবে দেখতে ? চ্যারিটি হবে। যাবে ? তোমার পয়সা লাগবে না।

মৃগনয়নী গম্ভীর ম্লান মুখে বলে,—না।

একছেলে পারুলের পাট করছে। এক ছেলে পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরপর আর কথা সরে না মৃগনয়নীর মুখে। বনবিহারীকে কিছু বলে না। আরও ভেঙে পড়বে ও।

ওপরে এসে যখন মৃগনয়নী দেখে বনবিহারী দু ছেলের দিকে চুপ করে তাকিয়ে আছে। ওর বুকের ভেতরটায় রোগা মানুষটার জন্য মায়া লাগে। কথা বলে না।

বনবিহারী আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে। ডাকে মৃগনয়নীকে।—শোন।

মৃগনয়নী ওর কাছে যায়। ওর গায়ে হাত রাখে। পাঁজরের হাড় হাতে ঠেকে। নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওঠা-নামা করে পাঁজর।

এই হাড় কখানা নিয়েই ত সে আজীবন সংসার করছে! কতকাল হয়ে গেল, বিয়ের দিনেই বনবিহারী অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। কত লোক কত বললে। সেই-

দিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল মৃগনয়নী এই সম্বল করেই তাকে ভাসতে হবে এক কংকাল হবে তার সঙ্গী। আজ পর্যন্ত চলে এসেছে।

—আমার বোধহয় রোজ জ্বর হয়।

বনবিহারীর কথাগুলো ওর কাণে আসে। ও নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করে। বনবিহারীর পাঁজরের ওপর ওর হাতখানা কাঁপে। আজ কেবলি মনে হয়, আর বুঝি টেঁকে না। এই সাজান হাড় কখানা আর বুঝি রইল না।

—আমি বুঝতে পারি, রোজ জ্বর হয়। আর পেটের যন্ত্রণাটা সবসময়ই হচ্ছে।

আবার বলে বনবিহারী।

মৃগনয়নী বলে আস্তে আস্তে,—কাল ডাক্তারের কাছে চলো।

বনবিহারী ম্লান মুখে বলে,—থাক। ডাক্তার আর কি হবে?

—তা কখনও হয়। অসুখ হলে ডাক্তার দেখাতেই হবে।

বনবিহারী যেন ভাবতে ভাবতে বলে,—আবার দোকান রয়েছে। কখন হবে—।

—দোকানে কাল যাবে না।

—তা হয় না।

—খুব হয়। আমি কাল শেকল দিয়ে রাখব তোমায়।

বনবিহারী হাসে। খুব খানিকটা হেসে ফেলে আজ।

মৃগনয়নী বলে,—হাসি নয়। কাল খোকাকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে

—কমলের আবার কলেজ!

—বাবার অসুখ হলে কলেজ যাবে না।

—না। ওর আবার শক্ত পড়া।

—হোক শক্ত পড়া। তোমার শরীরের কাছে পড়া কিছু নয়।

বনবিহারী মৃগনয়নীর হাতখানা ধরে কাছে টানে।

—তাছাড়া টাকা কোথায়—?

কথাটা মৃগনয়নীও ভাবছিল, বলে—টাকার ভাবনা আমার।

—একটা কথা সত্যি বলবে?

—বলো।

—কমল কি ওর জলপানির টাকা তোমায় দেয়?

মৃগনয়নী এতদিন এ কথার উত্তর এড়িয়ে যেত। আজ বলে,—না। দেয় না।

—একবারও দেয় নি?

—না।

—কি করে ও টাকা?

—জানি না। বোধহয় স্বদেশী কাজে দেয়।

বনবিহারীর মুখখানা আবার পাণ্ডুর হয়ে যায়। পাঁজরের হাড়গুলোর ওঠা-নামা বেড়ে যায়।

মৃগনয়নী বলে,—তার কাছ থেকে এ মাসে টাকা চেয়ে নেব।

—কেন?

—তোমার জন্যেই।

—না। কক্ষনো নয়। ওর টাকা ও যা খুশি করুক। কক্ষনো নয়।

হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে বনবিহারী।

মৃগনয়নী ওকে থামাবার জন্যে বলে,—তবে নোব না। থাক।

—না। নিও না! ওর সঙ্গেও আমি কোথাও যাব না। তুমি জান না। ওকে দেখলেই আমার শরীরের ভেতর কেমন করে।

—বেশত আমি তোমায় ডাক্তার খানায় নিয়ে যাব। এবার তুমি ঘুমোও।

গলার স্বরটা এবার নিস্তেজ হয়ে পড়ে বনবিহারীর,—ঘুম! ঘুম আর এ জন্মে হবে না।

মৃগনয়না হাতপাখাটা নিয়ে আসে। বাতাস করে বনবিহারীকে ধীরে ধীরে।

পরদিন বনবিহারী ভোরে উঠেই দোকানে বেরিয়ে যায়। মৃগনয়নীর কথা কিছুতেই শোনে না। দু চারটে দিন এমনি ঝোঁকের ওপরই কাজ করে। কিন্তু আর পারে না।

কয়েকদিন পর জ্বরটা খুব বেশি মনে হয়। সেদিন ভোরে আর উঠতে পারে না বনবিহারী। আর তেমনি যন্ত্রণা পেটে। যন্ত্রণায় কোঁকাতে থাকে।

একটু পরে কল ঘরে যায়। এসে বলে,—রক্ত পড়ল।

আমাশার সঙ্গে রক্ত। মৃগনয়নী জানত। কে যেন সব ওকে আগে থেকেই জানিয়ে দেয়। মনে মনে আশ্চর্য হয়ে যায় ও, আগে থেকেই ও জানত, এমনি একটা কিছু হবে।

কমলকে ডাক্তার ডাকতে বলে মৃগনয়নী। কমল ডাক্তারের বাড়ী চলে যায়।

মৃগনয়নী পাখা নিয়ে বসে বনবিহারীর বিছানার পাশে।

ডাক্তার আসেন। সেই বাইরেটা যার কুশ্রী, ভেতরটা শ্রীময়। বাইরেটা যার কঠিন, ভেতরটা শিশুর চেয়েও নরম। যার বউ বীণা বিপরীত ধর্মিণী। তিনি এলেন। দেখলেন। ভাল করে দেখলেন।

বাইরে এসে মুখটা কালো করে বললেন,—পাশেই ত ছিলাম। আগে ডাকতে পারেননি। এত আজকের রোগ নয়।

মুখ নীচু করে থাকে মৃগনয়নী। কিছু বলবার নেই। সব অপরাধই তার।

শুধু বলে।—কেমন দেখলেন ?

তেমনি কর্কশ স্বরেই মুখখানা আরও কুশ্রী করে বলেন,—তেমন আশা কিছু দেখছি না। চেষ্টা করা যাক। আপনার সেবা আর আমার ওষুধ।

মৃগনয়নী আর কথা বলে না। ভিজিটের টাকা দেয় হাতে।

ডাক্তার বলেন,—ওষুধ আনতে আধ ঘণ্টা পরে পাঠাবেন। চলে যান তিনি।

কমল কাছেই ছিল। সবই ওর কানে আসে। মৃগনয়নী কমলের দিকে তাকায়। কমল মুখটা নীচু করে। চোয়ালদুটো ওর তেমনি চাপা।

—সব ত শুনলি ?

—হুঁ।

—একটা কাজ করতে হবে তোকে।

কমল তাকায়।

—ওঁর দোকানে গিয়ে কিছু টাকা আনতে হবে। টাকা আর নেই বাবা।

কমল তেমনি গম্ভীর মুখে বসে থাকে। মৃগনয়নী ঘরে ঢুকে যায়। কমলকে না বলে আর উপায় নেই তার। একখানি গয়নাও আর নেই যে গয়না বেচে টাকা আনবে। কোন ভরসাই আর দেখা যায় না। শুধু সময় গোনা ছাড়া আর কি করবে সে।

বিকেলে কমল একবার বাড়ী আসে। মৃগনয়নী দেখে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। উঠে আসে ওর কাছে।

—দোকানে গিয়েছিলি ?

হুঁ।—কমলের মুখখানা নীল হয়ে গেছে লক্ষ্য করে মৃগনয়নী।

—টাকা পেলি ?

—না।

—কি বললে ?

কমল চুপ করে থাকে।

—কি বললে, বল। আর চুপ করে থাকিস নি বাবা।

—অপমান করে বেরিয়ে যেতে বললে।—থরথর করে কাঁপে কমলের গলা।

মৃগনয়নী দাঁড়িয়ে রইল একটু সময়। তারপর যন্ত্রের মত আস্তে আস্তে ঘরের ভেতরে চলে এলো। কমলও যেন যন্ত্রের মত বাইরে বেরিয়ে গেল।

পরদিন ডাক্তার এলো। ওষুধ এলো। টাকা লাগল না। আর একটা দিনও বুঝি যায় না। রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে। জ্বর বেড়েই রয়েছে। জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

বিকেলে কমল আবার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। মৃগনয়নী আজ আর উঠে এলো না।

—মা।

মৃগনয়নী শুনেও যেন শোনে না। কমল যেন আর ওকে মা বলে না ডাকে। মৃগনয়নীর মুখখানা কি পাথরের?

কমল আবার ডাকে—মা!

মৃগনয়নী তাকায় না। কমল ঘরে আসে।

পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে মায়ের হাতে দেয়। বলে।—দুশ' টাকা আছে। আরও লাগলে বোল।

মৃগনয়নীর পাথরের চোখ গলে পড়ছে বুঝি!

কমল হাসে,—এক বন্ধু দিলে। ধার দিলে।

মৃগনয়নী টাকাটা আঁচলে বাঁধে। কমলকে বলে,—আজ আর বেরোসনি।

—না। আর বেরোব না।

কথাটা বলতে বলতে গলা কেঁপেছিল। বেরোতে ওকে কেন বারণ করলে? মৃগনয়নী কি সব বুঝতে পাচ্ছে। মৃগনয়নী কি জানছে আর হাড় কখানা বুঝি রইল না। একি ভাবছে মৃগনয়নী। ভাববে না। কিছুতেই ওসব ভাববে না।

ভাবনাই সত্য হোল। সন্ধ্যের আগেই মারা গেল বনবিহারী। তেমনি পড়ে রইল বিছানার ওপর। শুধু পাঁজরের হাড় কখানার ওঠানামা বন্ধ হয়ে গেল।

মরবার দুদিন আগে থেকে কথা বলতে পারেনি। একবার শুধু মৃগনয়নী মুখের দিকে তাকিয়েছিল। চোখের কস বেয়ে পড়েছিল ফোঁটা ফোঁটা জল। কি ভাবছিল কে জানে? কেন চোখের জল পড়ল কে জানে! আর জানতে চায় না মৃগনয়নী।

কমল এলো। অমল এলো। দু ভাই অবাক হয়ে ভাবছিল মায়ের দিকে তাকিয়ে মা কি পাথরের? এমন অনড়। এমন অটল।

ভয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল ওরা। মৃগনয়নী আঁচল থেকে দুশ টাকাই খুলে দিল কমলের কাছে,—যা আনবার সব নিয়ে আয়।

কমলের টাকায় বনবিহারীর চিকিৎসা হয়নি। বনবিহারী চায় নি। তাই হয়নি। কমল মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায়। মায়ের চোখে ত জল নেই! ভয়ে ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

* * *

হিসেব করতে গেলে আর কিছুই থাকে না বাবা।

মৃগনয়নী বলত আমাকে। অবাক হয়ে শুনতাম তার কথা।

দুয়ে আর দুয়ে যোগ করলেও শূন্য হয়ে যায়, যদিনা সেই প্রথম এক থাকে সবই এক বাবা। দুই ছয় বারো যা দেখ ওগুলো ভাগাভাগি। কথায় বলে না আলেখে আসে আলেখে যায়। কিন্তু খোলা থেকে রস জাল হয়ে না নামলে সবই জোলো-জোলো।

তখন কি জানতুম। উনি মরেন নি। দেহটা ছেড়ে চলে গেলেন। দেহটার দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলুম, এইটে শ্মশানে পুড়লেই ওর সব শেষ হয়ে গেল। সেই কি অত সহজ হয়? নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারছি আজ। হাসত মৃগনয়নী।

আমার শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা। কথাগুলো সামান্য নয়। এই কন্যাও সামান্যা নয়। তবু ওকে দেখলে বোঝবার উপায় কি কিছু আছে! কিছু না। ভাগ্যিস মৃগনয়নী মনটাকে নিজে থেকে খুলে ধরেছিল আমার কাছে। তাই ত আজ সেই কন্যার কথা শোনাতে বসেছি।

জীবনটা গল্পের মতই। এক ছিল রাজা, হাতী, ঘোড়া, রাজবাড়ী, মন্ত্রী, কি না ছিল। কত জীবন! কত কথা! রাজকন্যে, রাজপুত্তুর! জমজমাট। রমারম।

রাজার রাজ্যি গেল। কোথায় গেল হাতী, ঘোড়া! কোথায় বা কি! গল্প ফুরিয়ে গেলো। নটে গাছটা কেমন তরতর করে বেড়ে উঠেছিলো। এখন মুড়োল।

তবু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, হ্যাঁরে নটে। মুড়োলি কেন? চিরদিন নটে-গাছটি থাকুক। এইটেই মানুষের প্রাণের ইচ্ছে কিনা। কিন্তু নটে গাছ ত চিরদিন থাকে না। এই সত্যিকে মেনে নিতে পারা যায় না কিছুতেই। কি বল বাবা?

আমার দিকে তাকিয়ে হাসত মৃগনয়নী। মৃগনয়নীর ওই হাসিটা আমি ভুলতে পারি না। অমন নিশ্চিন্ত খোলাখুলি হাসি আমি জীবনে দেখিনি।

বনবিহারী মরে যাবার পরও তেমনি নাকি হেসেছিল ও। কমলের সামনে। কমল ভয় পেয়ে গেল আরও। মায়ের হোল কি?

—কিছুই হয়নি বাবা! তোরা খুব ভয় পেয়ে গেছিস বোধহয়। ভয় কি!

হাসতে হাসতেই বলেছিল মৃগনয়নী,—এ আমি জানতুম। এখন যা কর্তব্য সব করে ফেল।

কর্তব্য সবই করতে হবে বই কি! কমল সে কথা জানে। কিন্তু তাই বলে মা যে এ রকম করে বলবে একথা ভাবতেও পারেনি কমল। যার কাছ থেকে একবার দুশ টাকা এনেছিল, তার কাছ থেকেই আরও দুশ টাকা আনতে হোল।

কাজও সব কোনমতে মিটল। মৃগনয়নী বেশী কথাও বলল না। অল্প কথাও বলল না।

শ্রাদ্ধের সময় পুরুত মশাইকে বলেছিল,—কাজটি ভাল করে করুন! ও যেন শান্তি পায়। বেঁচে থেকে ত' একদিনও একটু শান্তি পায় নি!

চোখদুটো একটু বা চিকচিক করে উঠল। তবু কাঁদল না মৃগনয়নী।

কমল কেঁদেছিল একেবারে লুকিয়ে কলঘরে। অমল কিন্তু কাঁদল সবচেয়ে বেশী। সকলের সামনে প্রায় চীৎকার করে।

কান্না আর কদিনই বা থাকে। আবার ভোর হোল, সন্ধ্যা হোল। কমল কলেজে বেরোল। অমল ইস্কুলে। মৃগনয়নী রান্নাঘরে গেল। রান্না করল। সবই করল। কিন্তু মৃগনয়নী মনটাকে যেন ফেলে অন্য কোথায়। এ সবের ভেতর আর মন নেই ওর।

বহুকাল ধরে যে মনকে সংসারে বসিয়েছিল, সেই মনকে তোলবার চেষ্টা শুরু হোল ওর। মনকে ভোলা বড় কঠিন। তবু অভ্যেসে কি না হয়! ভাল যখন লাগে না। তখন অভ্যেসটাও জোর করে করতে হয় না। আপনা-আপনিই মন উঠে আসছে ওর।

কমলের চেয়েও এখন কথা কম বলে মৃগনয়নী। মনে মনে কথা বলে অন্য কোথাও।

কমলই বরং কথা বলছে একটু বেশী,—ভেবো না মা।

মৃগনয়নী ভাসা-ভাসা হাসে। তাকায় বিছানা পাততে পাততে। বিছানায়

গা এলিয়ে দিয়ে বলে কমল,—কিছু ভেবো না। দুটো বাড়ীতে ছেলে পড়াবার কাজ পেয়েছি। তাতে পঞ্চাশ টাকা পাব। মানে খুব বড লোকের বাড়ীর কাজ।

মৃগনয়নী তেমনি ভাসা-ভাসা তাকায়।

—পঞ্চাশ টাকায় চলবে না মা?

অমল শুয়ে পড়ে বলে,—তা আর চলবে না? বাবা ত' পয়তাল্লিশ টাকা পেত।

মৃগনয়নী শুধু হাসে ছেলেদের কথা শুনে। অমলের কথা কমলের ভাল লাগে না। ও তাই আবার মাকে জিজ্ঞেস করে,—চলবে না মা?

—খুব চলবে।—বলে মৃগনয়নী।

কমল আশ্বস্ত হয়।

মৃগনয়নী নিজে মাদুর পেতে নেয় একখানা। একটা ছোট বালিস নেয়। আস্তে আস্তে বসে মাদুরের উপর।

একটু এপাশ ওপাশ করে ঘুমিয়ে পড়ে কমল আর অমল। মৃগনয়নী বসেই থাকে। চুপ করে বসে থাকে। ভাবে। বনবিহারীর কথাটা মনে হয়, ঘুম কি আর আছে? মৃগনয়নীরও ঘুম নেই আর। দুশ্চিন্তায় নয়। অন্য চিন্তায়। এক চিন্তায়।

সংসারের আসল রূপটাকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে। নির্জন রাত্রিতে মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে বারান্দায়। আকাশের দিকে তাকায়। আকাশটা কত গাঢ় সুনীল। কত স্থির, কত শান্ত। মেঘ জমে। ঝড় হয়। বিদ্যুৎ চমকায়। তাতে আকাশের কি এলো গেলো! ও কত বড। কত মহান। দূর থেকে ত' কত রঙ আকাশের। নানা রঙে রঙীন হয়। কখনও ভোরের সূর্যের রঙে। কখনও চাঁদের ছায়া-ছায়া আলোয়। হোক না রঙ। নিজের কোন রঙ নেই। সংসারের রঙ গায়ে লাগবে কেন? রঙ হবে, রঙ যাবে। ওদের নিয়মে ওরা ফুটবে, মুছবে। মৃগনয়নীর মনে রঙ ধরবে না। এত সব রঙে যে রঙায়, তাকে ভাবলে আর রঙ বসে না মনে।

মৃগনয়নীর এক চিন্তা। একেরই চিন্তা। তারই ধ্যান।

কোন এক রাত্রে কমল হঠাৎ জেগে গেলে মাকে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে আসে।

—মা।

মৃগনয়নীর কানে যায় না কথা।

—ওমা, মা!

মৃগনয়নী নড়ে বসে। ফিরে তাকায়।

বলে,—কিরে ?

—ঘুম আসছে না তোমার ?

ও কথার উত্তর না দিয়ে মৃগনয়নী বলে,—তুই ঘুমো।

—তুমি কি একেবারে ঘুমোও নি ?

মৃগনয়নী আবার বলে,—তুই শুয়ে পড না ?

কমল আরও কাছে আসে,—অত কি ভাবো। তুমি আগে শুয়ে পড়ো। নইলে আমিও বসে থাকবো। শোব না।

—বড় বিরক্ত করিস খোকা।

—কি অত ভাবো ?

এই কথাই বেশ কিছুদিন আগে মৃগনয়নী জিজ্ঞেস করেছিল কমলকে। আজ কমল জিজ্ঞেস করছে মৃগনয়নীকে।

—কি আবার ভাববো।—হাসে অল্প একটু মৃগনয়নী।

—ভাবতে পারবে না। শুয়ে পড়ো। আমি বাতাস করি।

মৃগনয়নী হেসে ফেলে,—তোর আর বাতাস করতে হবে না। আচ্ছা আমি শুচ্ছি। তুই শো।

মৃগনয়নী কাত হয় এবার খালি মেজেতে। আজ আর মাদুরটা পাতাও হয়নি। মাঝে মাঝেই এমন হয়। আঁচলটা পেতে ভোরের দিকে শুয়ে পড়ে কোন কোনদিন। কোনদিন বা অমলের বিছানার পাশে।

—আমি তোমার কাছে শোব।

কমলও মেজেতে শুড়ে পড়ে মায়ের পাশে।

মৃগনয়নী বলে,—তুই বিছানায় গিয়ে শো।

—তুমি তবে বিছানা পেতে নাও।

অগত্যা মৃগনয়নীকে মাদুরটা পেতে নিতে হয়।

কমল মাঝে মাঝেই এমনি করে। মৃগনয়নীর খাবার সময় কাছে এসে বসে। মায়ের ভাতের দিকে তাকিয়ে বলে,—আচ্ছা শুধু আলু সেদ্ধ দিয়ে মানুষ খেতে পারে ?

মৃগনয়নী ভাত মেখে নেয়।

—আরও ভাত নাও।

—না। আর না।

—এই খেয়ে ত দুবেলা থাকবে।

—তা হোক।

—তবে দুটি আলু ভেজে দিই।

বলে কমল আলু কুটতে যায়।

মৃগনয়নী বলে,—বিরক্ত করিসনি খোকা। তুই বড় জ্বালাস।

—কি আর খাটুনি। দুটো আলু কুটে ঘুঁটে জ্বালিয়ে ভেজে দোব।

—না। কাল না হয় করে নোব।

—ঠিক করে নেবে ত।

—নেব। তোদেরও দোব। আমিও নোব।

কমল বসে বসে মায়ের খাওয়া দেখে।

হঠাৎ বলে,—আচ্ছা মা, কমলির মায়ের ঘরে গয়লা আসে না?

—আসে।

--গয়লার কাছ থেকে এক পো করে দুধ নিও।

—কার জন্যে?

—আমি খাব।—বলে হাসে কমল।

মৃগনয়নী খুব বিরক্ত হয়,—বেশ তুই খাবি। আমি কিন্তু এক ফোঁটাও খাব না।

—সে দেখা যাবে।—কমল তেমনি হাসে।

বনবিহারীকে এক ফোঁটা দুধও খাওয়াতে পারেনি। এ কথা মৃগনয়নী ভোলে কি করে। ও দুধ খাবে কোন্ মুখে। গলা দিয়ে নামবে না।

তবু কমলের জোর। কমলের জিদ। সব সময় যেন মৃগনয়নীর ওপর চোখ রয়েছে। মৃগনয়নী যত সব কিছুর ওপর থেকে নজর সরাচ্ছে, কমল ততই নজর দিচ্ছে মৃগনয়নীর ওপর।

দুধ অবশ্য কিছুতেই খায় নি মৃগনয়নী। কমল জোর করেছে। ভয় দেখিয়েছে। তাহলে ভাত খাওয়া ছেড়ে দেবে কমল। তবু মৃগনয়নী খায় নি।

শেষ পর্যন্ত বলে কমলকে,—দেখ খোকা, ভুলতে আমি সবই চাই। কিন্তু সব কথা কি এত তাড়াতাড়ি ভোলা যায়? তাঁকে কতটুকু দুধ খাওয়াতে পেরেছি? রোগা মানুষ। বেরোবার সময় বার বার ফিরে তাকিয়েছে। মুখখানা শুকনো করে বলেছে, পা দুটো আর চলে না। অবশ অবশ লাগে। চুপ করে থাকা ছাড়া আর কি করেছি বল? মৃগনয়নীর চোখদুটো ভিজে ভিজে লাগে।

কমলের মুখটা ম্লান হয়ে যায়। আর একটা কথাও না বলে বেরিয়ে যায়।

দিনগুলো এমনি করেই কাটাচ্ছিল। একদিন সন্ধ্যায় কমল একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এলো বাড়ীতে। সামনে কমল, পেছনে মেয়েটি। ওরা যেন খুব সন্তর্পণে ঢুকল বাড়ীতে।

মৃগনয়নী ঘরের দোর ভেজিয়ে বসেছিল ঠাকুরের পটের সামনে। পটের দিকে তাকিয়ে ছিল অনেকক্ষণ। তারপর চোখ বুঁজল।

বাইরে জুতো খুলে মেয়েটি কমলের পেছন পেছন ঘরে ঢুকল। কমল দেখল মাকে এখন ডাকা যাবে না।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললে,—বস।

মেয়েটি বসল হাঁটু মুড়ে শাড়ী সামলে নিয়ে। কমল বসল জানলার তাকের ওপর কোলের ওপর হাত রেখে। অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

খানিক পরে এক বড় নিশ্বাস ফেলে মৃগনয়নী তাকাল। মেয়েটির দিকে চোখ পেতে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। মাজা মাজা রঙ। আঁটসাট দেহটি। মুখখানি গোল। চোখদুটি একটু ছোট কিন্তু সুতীক্ষ্ণ দীপ্তিময়ী। হাসল মেয়েটি। গালে ছোট ছোট দুটি টোল পড়ে হাসলে। ঘূর্ণির মত। নাকটি একটু চাপা আর কমলা-কোয়ার মত ফুলো-ফুলো দুটি ঠোট। মৃগনয়নীর বেশ লাগছে দেখতে।

উঠে দাঁড়ায় মৃগনয়নী।

কাছে এসে মেয়েটি প্রণাম করে। মৃগনয়নী কমলের দিক তাকায়।

কমল মুখের ঘাম মুছে বলে,—একটু বাইরে এসো মা। একটা কথা আছে।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কমল বলে,—তুমি একটু বস।

মেয়েটি হেসে আবার বসে পড়ে। কোলের ওপর একটা চামড়ার ছোট ব্যাগ নজরে পড়ে মৃগনয়নীর। ও মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একটু হাসে।

—এটি কে খোকা?

—তুমি বাইরে এসো।

মেয়েটি হঠাৎ বলে,—এখানেই বলো না কমল।

কমল একবার তাকায় মেয়েটির দিকে, আবার মায়ের দিকে।

—কিই বা কথা,—মেয়েটি বলে,—আমি এ বাড়ীতে দিনকতক থাকব মাসিমা।

মৃগনয়নী অবাক হয়ে তাকায়।

কমল বুঝিয়ে বলে,—তুমি ত জান—সবই। এ মেয়েটিও আমাদের দলের। ওর

পেছনে পুলিশের ফেউ লেগেছে। ওদের বাড়ীতে সার্চ হয়ে গেছে। এখন ওকে ধরতে পারলেই জেলে পুরবে। ওকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। তাই অন্ততঃ কিছুদিন আমাদের বাড়ীতে লুকিয়ে থাকতে চায়।

মৃগনয়নী বোঝে।

—বেশ ত। ওর বাপ মা?

—তাঁরা সব জানেন।

—ওদের বাড়ী কোথায়?

—ও সব কথা এখন থাক মা। ওর নামটাও পালটে দিতে হবে। ওকে কাবেরী বলে ডেকো। পরে সব বলব।

মেয়েটি হেসে মৃগনয়নীর কাছে এসে কমলের দিকে তাকিয়ে বলে,—পরে কেন কমল। আমি মাসিমার কাছে বসে বসে সব বলব। তুমি তোমার কাজে যাও। শোন। আমাদের বাড়ী গিয়ে আমার কাপড়-চোপড়গুলো একটা ট্যাক্সি করে নিয়ে এসো।

কমল একটু হাসে,—আমার যাওয়া কি ঠিক হবে! আচ্ছা আমি গিয়ে অজয়কে পাঠাচ্ছি। ওকে টিকটিকিগুলো চিনতে পারবে না।

কমল বেরিয়ে যাবার আগে মাকে বলে,—অমল এলে ওকে বাজারে পাঠিয়ে একটু মাছ আনিও মা।

বলে কাবেরীর দিকে তাকিয়ে বলে,—ও আবার মাছ ছাড়া খেতে পারে না।

কাবেরী ধমকে ওঠে,—যাও, বাজে বোক না। না মাসিমা এবেলা আর মাছের দরকার নেই। অমনি একটু তরকারি ভাত রাঁধলেই হবে।

মৃগনয়নী তাকিয়ে থাকে কাবেরীর দিকে। কি সুন্দর মেয়ে! কেমন পরিষ্কার কথাবার্তা। কমলকে কথায় কথায় ধমকাচ্ছে। এটা কিন্তু ভারী ভাল লাগছে মৃগনয়নীর।

—এসো মা। আমরা নীচে রান্নাঘরে গিয়ে কথা বলি।

কাবেরীকে সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরে এসে ওকে একখানা পিঁড়ি পেতে দেয়।

—বোস।

কাবেরী বসে।

—মেয়েরাও কি আজকাল এ কাজ করছে?

—আর করবে না কেন মাসিমা। দেশ কি শুধু ছেলেদের? মেয়েদের নয়?

মৃগনয়নী ওর দীপ্ত চোখের ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে হাসে,—তা বটে। তোমাদের দেশ কোথায় ?

—কেষ্টনগর। এখন কলকাতাতেই থাকি আমরা। আমরা দু বোন। এক ভাই।

—ছোট বোনের বয়স কত ?

—ওর এখন কুড়ি হবে। গেল বছর বিয়ে হয়েছে। ভাইটি খুব ছোট।

—তুমি বিয়ে— ?

কাবেরীর মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে যায়। হাসবার চেষ্টা করে বলে,—আমি এই কাজই করি। পড়ছিও। এবার আই-এ দোব।

—খোকার সঙ্গে পড় বুঝি ?

—না। মেয়েদের কলেজে।

—বাবা কি করেন ?

—বাবা গভর্ণমেণ্টে কাজ করেন। চাকরি ভালই করেন। অফিসার। কলকাতাতে বাড়ী করেছেন। আর বছর দুই পরে রিটায়ার করবেন। আমাকে নিয়ে বাবার হয়েছে জ্বালা।

—কেন ?—

কাবেরী খুব খানিকটে হেসে নেয়,—আমার জন্যে তার চাকরি যায় যায়।

—আহা, যদি চাকরি যায় !

—যায় ত যাবে।

মৃগনয়নী উনুনে আগুন দিয়ে বাইরে এসে বসে। কাবেরীও বাইরে আসে।

—খোকার সঙ্গে তোমার আলাপ হোল কি করে ?

—ওই দলেই। ওখানে ওকে সবাই খুব মানে। আমি বাদে—।

বলেই আবার খিল খিল করে হেসে ওঠে কাবেরী। বলে,—আমার সঙ্গে কমল পেরে ওঠে না। মুখ গোমড়া করে থাকলে দু ধমকে হাসিয়ে দিই। ওকে কিন্তু আর সবাই খুব ভয় করে। খুব গম্ভীর কিনা ? এত কম কথা বলে কেন মাসিমা ?

মৃগনয়নী হেসে ফেলে,—ছোটবেলা থেকেই ওইরকম।

—আমার বাবাও ওর সঙ্গে কথা বলতে একটু ইয়ে করে।

—তোমাদের বাড়ী বুঝি ও যায় ?

—হ্যাঁ। অনেক দিন থেকে। বাবা ওকে একদম পছন্দ করেন না। মুখে কিছু

বলেন না। মা খুব ভালবাসেন। একটু ভাল রান্না হলেই মা আমায় বলবেন—কমলকে আজ ডেকে নিয়ে আসিস। আচ্ছা, আমি ওকে কোথায় খুঁজি বলুন ত মাসিমা। ওযে কোথায় কখন ঘোরাফেরা করে দলের কেউও ত জানে না। ঘুরে ঘুরে ওকে বার করতে হয়। হয়ত দেখি এক বস্তি থেকে আমাদের বাড়ীর দিকেই আসছে। পাকড়াও হয়ে যায়। বলে, কাজ আছে এখন যেতে পারব না। মা ভাববে বাড়ীতে। তবু ওকে ছাড়া চলবে না। আমার মায়ের মন খারাপ হয়ে যাবে। অগত্যা ওকে আসতে হয়।

মৃগনয়নীর বেশ লাগছে কথাগুলো। বলে,—তবে ও ছেলে পড়ায় কখন?

—ছেলে পড়ায় নাকি?—যেন আকাশ থেকে পড়ে কাবেরী।

মৃগনয়নী হেসে বলে,—দুটো ছেলে পড়ায়। তা নইলে আর সংসার চলে কি করে?

—তাই নাকি! দেখেছেন, আমাকেও বলেনি। কেউ জানে না কখন ছেলে পড়ায়। জানে আমায় বললে—! —বলতে গিয়ে চুপ করে যায় কাবেরী।

—তোমায় বললে কি?

—কি আর! আমায় বললে আমি কি ছেলে পড়াতে দিতুম? বলুন ত ওই শরীর। কলেজে পড়ে। পার্টির কাজ করে। আবার ছেলে পড়ান? এত নিজে ইচ্ছে করে মরা! কদিন আর বাঁচবে?

—কিন্তু সংসার কি করে চলবে মা?

—চলবে। ও আমায় পড়াক না!—কাবেরী যেন ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে,—বাবা ত আমায় মাসে দুশ টাকা করে দেন। সেটা ওর কোন কাজে লাগলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হোত! কি মাসিমা?

মৃগনয়নী ওর সরল মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—না মাসিমা। আপনি বারণ করে দেবেন। এমন করে নিজে মরে লাভ আছে?

মৃগনয়নীর বুকটা ভরে ওঠে কাবেরীর অন্তরের মাপ দেখতে পেয়ে।

—দাঁড়াও আসুক। কোন কথা কাউকে বলবে না! কি ছেলেরে বাবা! কি ছেলে পেটে ধরেছিলেন মাসিমা আমাদেরও জ্বালিয়ে মারলো!

মৃগনয়নী কথা না বলে রান্নাঘরের ভেতরে গিয়ে ভাত চড়িয়ে দেয়।

অমলও এখনও এলো না। ওদের জন্যে একটু মাছ আনাতে পারলে ভাল হোত

কাকে দিয়ে যে আনাবে ? অমল আজকাল ফিরতে বড রাত করে। কেউ কিছু বলেও না। মৃগনয়নী নীরব। কমলও। অমল এ সুযোগে দিনের পর দিন কি যে হচ্ছে। মুখখানা রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। চেহারাটা পাকিয়ে গেছে। দেখলেই মনে হয়, অনেক অত্যাচার করছে ও দিনেরাতে। সন্দেহ হয় মৃগনয়নীর মাঝে মাঝে অমল বোধহয় নেশা করেও আসে।

মৃগনয়নী বলে আর কি করবে। মাকে গ্রাহ্যই করে না অমল। যাকে ভয় করত, সে নেই। অমলের এখন ভয় ভীতি কিছুই নেই। কমল ত ওর সঙ্গে প্রায় কথাই বলে না। অমলও বেচে যায়। নিজের খুশিতে দিনরাত কাটাচ্ছে। এখনও অমল এলো না। ও নিশ্চয়ই অনেক রাত্রে ফিরবে। অগত্যা মৃগনয়নী তরকারীর ঝুড়ি নিয়ে বসে তরকারি কুটতে।

রাত হয়ে আসছে ক্রমে। কমলির মা একবার আসে। প্রায় রোজই আসে। কাবেরীর দিকে চোখ পড়তে বলে,—ইটি কে গো ?

—এটি আমার বোন-ঝি। কাবেরী। একটু হেসে বলে মৃগনয়নী।

—তোমার জর দেখবার কাঠিটা একেবারে দেবে দিদি। ডাক্তার এয়েছে। কমলির জর দেখবে।

মৃগনয়নী উঠে ওপর থেকে থার্মোমিটারটা এনে কমলির মায়ের হাতে দেয়।

ফিক ফিক করে হাসে কাবেরী।

—হাসছো কেন ?

—জর দেখবার কাঠি !—বলে হেসে গডিয়ে পড়ে কাবেরী।

এর ভেতর কমল বাড়ী ঢোকে। কাবেরীকে লুটিয়ে পড়ে হাসতে দেখে বলে,—কি হোল !

একটু যেন বিরক্তও হয়।

কাবেরী বলে, দেখো কমল, চোখ পাকিয়ে তাকিও না। হাসতে দেখলে কমল এমন বিচ্ছিরী তাকায়। জানেন মাসিমা। নিজে ত দিন রাত্তির গাল ফুলিয়েই আছে। জর দেখবার কাঠি।—বলে আবার খিল খিল করে হেসে ওঠে কাবেরী।

কমল মায়ের কাছে গিয়ে বলে,—অমল এসেছিল মা ? বাজারে পাঠিয়েছিলে ?

—না। অমল এখনও আসেনি ত ?

—এখনও আসেনি ?

—না। মাঝে মাঝেই আজকাল রাত করে বাবা।

—হুঁ।—গম্ভীর হয়ে যায় আরও। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে,—তাহলে আমি যাই।

কাবেরী বলে,—মাছ আনলে কিন্তু ফেলা যাবে! আমি খাব না।

মৃগনয়নী বলে,—থাক। আজ না হয় থাক। কাল আনিস।

কমল কাবেরীর দিকে তাকিয়ে বলে,—তোমার শাড়ীর স্যুটকেশ অজয় কাল ভোরে নিয়ে আসবে। সন্ধ্যেবেলা না যাওয়াই ভাল। ওদের কড়া নজর তোমাদের বাড়ীর দিকে।

—বা, বা, আজ আমি কি পরব?

—আমার একখানা কাপড় পরো! মাকে বল।

বলে কমল ওপরে উঠে যায়।

কাবেরী উঠে পড়ে।—দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা! বলে পেছনে পেছনে ওপর চলে যায়।

মৃগনয়নী তরকারি কুটতে কুটতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। মনটা ওর বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠছে। ভেতরের প্রসন্নতাও যেন আরও স্থিত হয়েছে। নীরবে তরকারি কুটে শেষ করে ওপরে ওঠে মৃগনয়নী। মেয়েটিকে একখানা শাড়ী বার করে দিতে হবে। তার নিজের খান তিনেক শাড়ী এখনও রয়েছে বাক্সে। তাই থেকেই বার করে দেবে। আস্তে আস্তে ওপরে উঠে জানলার সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়।

মেয়েটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর। একি! এমন মুখ ত ওর দেখেনি মৃগনয়নী।

কাবেরী গম্ভীর স্বরে বলছে কমলকে—সমীর কি আজ রাত্রে বহরমপুর যাবে?

কমলের ভীত গলা শোনা যায়।—ও বলছিলো—

মেয়েটির বিরক্ত সুগম্ভীর গলা,—ও বললে ত হবে না। আমি যা বলব তাই হবে। চিঠিটা নিয়ে বহরমপুর আজ ওকে যেতেই হবে।

আদেশ। কঠোর আদেশ। কমল মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

—যাও। সমীরকে বলে এসো। আজ সে না গেলে ওখানে কাল বিকেলে সব ধরা পড়ে যাবে। সমীরকে আমার কথা শুনতে হবে। না শুনলে তার কি হবে তাকে ভাবতে বোল।

মৃগনয়নী কেঁপে ওঠে। একি কণ্ঠস্বর মেয়েটির! এক মুহূর্ত আগে কি এই মেয়েই এত হেসেছে, এত কথা বলেছে! কেমন কেমন লাগে মৃগনয়নীর।

—যাও এখুনী।

হঠাৎ মৃগনয়নীর দিকে মেয়েটির চোখ পড়ে জানলা দিয়ে।

মুহূর্তে মুখে হাসি এনে বলে মেয়েটি,—আচ্ছা কমল, তুমি নাকি ছেলে পড়াও? মাসিমা বললে! বাব্বা! কি ছেলে, আমাকে কিছু বলো নি?

কমলকে একটু যেন ইশারাও করে। কমল বাইরে বেরিয়ে আসে।

মেয়েটি হাসতে হসেতে বেরিয়ে আসে—বাব্বা! বলেছি বলে আবার রাগ! কি ছেলে আপনার মাসিমা ওর সঙ্গে আমি পেরে উঠিনে।

কমল বেরিয়ে যায়।

মৃগনয়নী নীরবে এসে বাক্স থেকে একখানা শাড়ী বার করে কাবেরীকে দেয়।

—কাপড় বদলে নীচে এসো।—বলে নীচে নেমে আসে মৃগনয়নী।

কি বিচিত্র সংসার! অবাক হয়ে মনে মনে হাসে ও, মেয়েটির চাতুরীটুকুও ওর যে খুব খারাপ লাগে তা নয়। মৃগনয়নীর কাছে মেয়েটি আরও দীপ্তিময়ী হয়ে ওঠে। ওর অসাধারণ চাতুর্য মৃগনয়নীকে মুগ্ধ করে। তবু এই মুগ্ধতা, এই ভাল লাগা, মেয়েটির সবই ওর কাছে আলগা আলগা। মনে ওর বসে না এসব। মনটা ছুঁয়ে যেতে পারে মাত্র। বিঁধে যায় না। এমনি একটা অবস্থা ভেতরে ভেতরে করে নিয়েছে মৃগনয়নী। ও যেখানে স্থির, ওর যেখানে আনন্দ সেটার জন্ম বাইরে নয়, এটা স্পষ্টই ধরা পড়ে গেছে ওর কাছে। তাই যেখানে এর জন্ম সেখানেই ও তাকিয়ে থাকে বেশী। অনেকক্ষণ। প্রায় সর্বক্ষণ।

এর ভেতরে অমল বাড়ী ঢোকে। মৃগনয়নী তরকারি তুলে দেয় উনুনে।

তাকায় অমলের দিকে।—এত রাত হোল কেনরে?

—এমনি!—বলে শিস দিতে দিতে অমল রান্নাঘরের সামনে আসে।

বলে,—আমায় গোটা দশেক টাকা দিতে পারো মা। বড্ড দরকার।

—টাকা! টাকা কি করবি?

—কাজ আছে।

—কি কাজ শুনি?

সিঁড়ির সামনে থেকে কাবেরীর গলা শোনা যায়,—কাজ আর কি মাসিমা। বায়স্কোপ টায়স্কোপ যাবে। শোন। আমি তোমায় দুটো টাকা দোব। বায়স্কোপ দেখে এসো কেমন?

অমল হাঁ করে তাকিয়ে থাকে কাবেরীর দিকে। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে,—ইনি কে মা?

—তোমার দিদি হয়।

অমল তাকায় কাবেরীর দিকে। লাল পেড়ে সাদা শাড়ীটা পরে অপরূপ দেখাচ্ছে কাবেরীকে।

ওর তাকানীটা খুব ভাল নয় বুঝতে পারে কাবেরী। বলে,—ইদিকে শোন।

অমল কাছে আসে।

ওর হাতটা ধরে বলে।—চল, ওপরে গিয়ে আমরা গল্প করি।

অমলকে টানতে টানতে ওপরে নিয়ে যায়।

মৃগনয়নী রাঁধতে থাকে আর ভাবে। অসংলগ্ন ভাবনা আলগা ভাবনা। মনটা ওর স্থিত হয়ে যায় অন্য জায়গায়। অন্য কোনখানে।

সাতাশ

পরদিন সন্ধ্যার পর মেয়েটি বেরিয়েছিল। বেরোবার সময় মুখে কি সব মাখালে কাজল পড়লে। খুব মোটা করে। ঘোমটা দিল খানিকটা। বেরোল। কোথা বেরোল কে জানে। জানতে চায়ও না মৃগনয়নী।

কমল বসে ছিল আজ বাড়ীতে। মৃগনয়নী ডালের বড়া ভাজছিল। কমল এসে বসল,—মা একটা ডালের বড়া দাও খাই।

মৃগনয়নী হেসে একখানা ডিসে করে দুখানা বড়া তুলে দিলে ওর হাতে।

কমল বড়া কামড়াতে কামড়াতে বললে,—মেয়েটিকে কেমন মনে হচ্ছে মা?

—ভাল।

—ওর আসল নাম জান?

—না ত?

—মণিমালা সরকার।

—ওর মা বুঝি তোকে খুব ভালবাসে?

—হ্যাঁ। তা বাসে। কেন বলছিল বুঝি?

—হ্যাঁ। বলছিল তুই-ই নাকি ওদের দলের কর্তা?

কমলের মুখটা রাঙা হয়ে ওঠে, বলে,—বলছিল বুঝি। বাজে কথা। সত্যি কথাটা বলেনি। সত্যি কথা আমাদের প্রায় বলতেই নেই।

মৃগনয়নী গম্ভীর মুখে বলে,—যেখানে সত্যি নেই, সেখানে দল ত টেঁকে না বাবা।

কথাটা বোধহয় নিষ্ঠুর সত্য।

কমলও মুখটা গম্ভীর করে বসে থাকে। মুখখানা ম্লান হয়ে যায়।

বলে,—কথাটা বোধহয় ঠিকই বলেছ। আমারও যেন আর এত লুকোচুরি, এত মিথ্যে ভাল লাগে না।

—তবে না গেলেই পারিস।

একটু সময় চুপ করে থেকে বলে কমল —ফেরবার ত আর উপায় নেই মা।

মৃগনয়নীর হাত বন্ধ হয়ে যায়। বড়াগুলো আর নাড়তে পারে না। পুড়ে ওঠে।

কমলই বলে,—ওগুলো পুড়ে গেল। নামাও।

কড়াটা অবশ হাতে নামায় মৃগনয়নী।

কমল আস্তে আস্তে বলে,—কি জান। ওই মণিমালাই সব। ওর কথায় দলের সবাইকে চলতে হয়। ও আছে আর একটি ভদ্রলোক আছে। সে এক দাদা। একে আমরা মণিদি বলে ডাকি। এই দিদি দাদাকে মানতেই যেন দম ফুরিয়ে যায় মা। কি যে শক্তি এই মণিদির তুমি জান না। সাপুড়ের মত বশ করে। সাপের মত ছোবল মারে। সে বিষ নামাবার মত রোজা আর খুঁজে পাবে না।

—এমন করে দেশের কি ভাল হবে বাবা।

—তাই ত আজকাল আমাদের কয়েকজনকে ভাবিয়ে তুলেছে।

—তবে স্পষ্ট বললেই ত পারিস।

—বললাম ত মণিদিকে জান না। ও অত হাসে, কিন্তু কাঁদতে পারে তার চেয়ে বেশী। দেখতে কেমন নরম, ভেতরটা পাথর।

মৃগনয়নী চুপ করে কি ভাবে, তারপর বলে,—বিয়ে করেনি কেন?

—বিয়ে করেছিল।

—করেছিল?

—করেছিল। তবে শাঁখা সিঁদুর নেই যে?

—শাঁখা ভেঙেছে। সিঁদুর মুছেছে।

—কে?

—ওর মা।

—কেন?

—ওর বিয়ে হয়েছিল এক জমিদার বাড়ীর ছেলের সঙ্গে। তখন মণি-দি খুব ছোট। শ্বশুরবাড়ী থেকে প্রথমবার যখন ফিরে এল সঙ্গে যে ঝি গিয়েছিল সে বললে, ওর সতীন আছে ওখানে একটি। শুনে ওর মা খেপে গেল। বাপও।

—তাঁরা জানত না ?

—না। লুকিয়ে বিয়ে করেছিল। তারপর দিন দশেক পরে যখন ওর স্বামী এলো, তার সামনে মেয়ের শাখা ভাঙলে, সিঁদুর মুছাল। বললে আমার মেয়ের বিয়ে হয়নি। আর ওর স্বামীকে দুদিন বাড়ীর থামের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। মেরেছিল।

—কে ?

—ওর বাবা। মস্ত গবর্ণমেণ্টের চাকুরে ত। কে আর কি বলবে ?

—ছি, ছি, এত তেজ !

—ওদের ভয়ানক তেজ। ওইটেই জন্যেই ত আজ মণি-দির এত প্রতিপত্তি দলে।

—এত তেজ ভাল নয় বাবা। দেখিস ভাল হবে না। হতে পারে না।

কমল হাসে,—আজকে আর তোমার কথা কে মানছে বলো। এই তেজকেই ত পুজো করছে সবাই। সবাই বলে, ওর স্বামীকে মেরে ভাল করেছে, শাখা ভেঙে ভাল করেছে।

—সবাই কে ?

—এই ধরো সবাই! আমাদের বন্ধু বান্ধব, দলের আর সবাই। মণি-দিব প্রশংসায় গলে পড়ে।

হাসে মৃগনয়নী।—ছেলেমানুষ কিনা! শুধু ভাঙাটাই ভাল বলে। তোর কি মনে হয় ?

—আমিও খুব ভক্তি করতাম,—কিন্তু—।

কিন্তু কি ?

—কিন্তু তোমার সঙ্গে যখনই তুলনা করেছি, মণিদি যেন অনেক ছোট হয়ে গেছে। অথচ তুমি ত জোরে একটা কথা বলতেও পার না। ও সহ্য যা করেছে তার চেয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে বেশী। আর তুমি—? মুখ বুঁজে কি করে সহ্য কর মা ? কমলের গলাটা কাঁপছে।

মৃগনয়নী ভেতরের তারগুলো বহুদিন পর ঝংকার তোলে,—আমার কথা ছেড়ে দে।

কমল ত এত কথা কখনও বলে না। আজ ও মায়ের কাছে সব উজার করে দিচ্ছে।

—আমার মন বলছে আর বেশীদিন নয় মা! ওদের এই মিথ্যে দল ভাঙবে। এমনিতেই ভাঙন ধরে গেছে। ভেতরে ভেতরে গুমট হাওয়া চলছে। খবর সব পোঁছে যাচ্ছে পুলিশের কাছে। মণি-দি ত দিন তিনেক আগেই ধরা পড়ে যেত। বরাতে বেঁচে গেছে। আর বেশীদিন লুকিয়ে থাকা চলবে না।

অমলেব গলা শোনা যায়।

—কাবেরীদি কোথায় মা?

—বাড়ী নেই। কেন?

--না, বেড়াতে বেরোতুম। বলছিল কিনা, আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরুবে। একা একা বেরুতে পারে না।

কমল হাসে।

অমল বলে,—হাসছ যে! আমার কি ডাঁট জান এ লাইনে। আপটু সিমলে যে কোন মিঞাকে বিট দিয়ে দিতে পারি।

—তোর কথাগুলো এমন বিচ্ছিরি হয়েছে কেনরে?—জিজ্ঞেস করে কমল।

অমল বলে,—বিচ্ছিরি কোথায়! পাড়ায় ত সবাই বলে এই কথা। বেমক্কা কথা ত কিছু বলিনি?

—যা ওপরে যা। বাজে বকিসনি।

অমল ওপরে চলে যায়।

—অমলটা একেবারে গোল্লায় গেছে মা।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে। কমলও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে যায়।

একটু বেশী রাত্রে ফেরে কাবেরী। মুখটা গম্ভীর। চেষ্টা করে হেসে মৃগনয়নীর সঙ্গে দু একটা কথা বলতে চায়। কিন্তু মৃগনয়নী যেন অটল। কথাগুলো সব মেপে বেরোয় ওর মুখ দিয়ে।

খাওয়া সেরে কমল শুয়ে পড়ে।

অমল কাবেরীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে।

—দাদাকে যেন বোল না।—একটা বিড়ি ধরায় অমল।

কাবেরী খুব হাসে,—খুব বিড়ি খাও বুঝি?

—কি খাই না! এ শম্মাকে কোন নেশা বিট দিতে পারবে না।

—সত্যি !—

—হাসলে কিন্তু…।

—কি ?

—তোমাকে ভারী সুন্দর দেখায় কাবেরী-দি !

কাবেরী খিল খিল করে হাসতে থাকে। এমন মজার কথা যেন ও জীবনে শোনেনি।

মৃগনয়নী খেয়ে ওপরে আসে। মৃগনয়নী পাশে এসে কাবেরী শুয়ে পড়ে। অমল শুয়ে পরে।

মৃগনযনী বসে থাকে অনেকক্ষণ। একটু পরে কাবেরী মাদুরটা নিয়ে বারান্দায় শুতে যায়। কি গরম ! দম বন্ধ হযে যাচ্ছে। একটুও হাওযা নেই।

রাত ক্রমে বাড়ে। মৃগনযনী আঁচলখানা পেতে কাত হয়ে শোয়।

অমলের আর আজ ঘুম হয় না। বার বার ঘাড উঠিয়ে বারান্দার দিকে তাকায়।

রাত আরও বাডে। অমল পা টিপে টিপে ওঠে। তাকায কমলের দিকে। কমল খুব ঘুমোচ্ছে। মা-ও যেন ঘুম-ঘুম। একটু গলার শব্দ করে। কেউ জাগে না।

ও ওঠে। উঠে বারান্দায় যায় পা টপে টিপে। কাবেরী শুয়ে আছে। পিঠের আঁচল নেই। ধবধবে সাদা পিঠ। অমলের চোখদুটো জ্বলতে থাকে। ওর পায়ের ওপর একখানা হাত রাখে। নরম সুডোল পাদুটি।

আস্তে আস্তে শাড়ীর প্রান্ত হাঁটুর ওপরে উঠতে থাকে। অকস্মাৎ অমল অনুভব করে ওর হাতের কব্জিটা কাবেরীদির নরম মুঠোয়। কাবেরীদির মুঠোটা ক্রমে শক্ত হতে থাকে। আরও শক্ত। ওরে বাবা। এত শক্ত ! অমলের কব্জি থেকে সমস্ত হাতটা মুচকে যাচ্ছে। উঃ ! অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে অমলের।

ওরে বাবা ! হাতটা একেবারে মুচড়ে দিলে ! কি কঠিন লোহার মত মুঠো কাবেরীদির !

আস্তে আস্তে কাবেরীর মুঠো আলগা হয়। তেমনি ঘুমোতে থাকে কাবেরী।

অমলের হাতখানা বোধহয় ভেঙেই গেছে। যন্ত্রণায় ওর মাথা ঝিমঝিম করে। চুপ করে আস্তে আস্তে ঘরে এসে শুয়ে পড়ে অমল।

শুলে কি হবে। ঘুম হয় না। যন্ত্রণা ক্রমেই বাডতে থাকে। কব্জিটাও ফুলে ওঠে।

পরদিন সকালে উঠে দেখে হাতটা বেশ ফুলে গেছে। কাউকে কিছু না বলে ও জামাটা প'রে আস্তে আস্তে নীচে নামে। দেখে কাবেরীদি দাঁত মাজছে।

—ওমা তোমার হাতে কি হল অমল? হাতখানা যে ফুলে গেছে। মুচকে মুচকে হাসছে কাবেরীদি।

অমলের কানদুটো লাল হযে গরম লাগে। মুখটা নীচু হয়ে যায়। মনে মনে আগুন হয়ে ওঠে। আচ্ছা এ শয়তাও ছাড়বে না। মেযেমানুষের কাছে বিট খেযে যাবে অমল? পাড়ার মেযেগুলো তো ওকে যমের মত ভয় করে।

মৃগনয়নী উনুনের ছাই বেছে বাইরে আসে। ওমা! একি! হাতে কি হোল?

—মচকে গেছে। কোনমতে বলেই রাস্তায় বেরিয়ে যায় অমল।

পিছনে কাবেরীর খিল খিল হাসিটা কানে বাজে।

মৃগনয়নীকে বলছে কাবেরী,—কি সব ছেলে মাসিমা আপনার!

অমল বাইরে বেরিয়েও ভাবে দেখে নেবে সে। সহজে ছাড়বে না।

সহজে অমল ছাড়েনি! কযেকটা দিন কাটল। অমল কারো সঙ্গে কথা বলল না। বাড়ীতে এলো সকালে। বাড়ীতেই রইল বেশীর ভাগ সময়।

কাবেরী কথা বলতে গেল,—আমাকে খুব সুন্দর দেখতে, না অমল? কাবেরী তেমনি মুচ্‌কি হাসে।

—তোমার হাতটা সেরেছে?

—হুঁ। বলে অমল উঠে যায় ওখান থেকে।

কাবেরী তবু ওর পেছনে লাগতে ছাড়ে না। বিছানা করবার সময় অমলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—আমায় অমলের পাশে শুতে দিন মাসিমা। আপনার পাশে আমার গরম লাগে।

মৃগনয়নী হাসে। অমল আর কমলের বিছানাই পাশাপাশি করে।

অমলের মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে। আরও কয়েকটা রাত কাটতে দাও। দেখে নেবে অমল। বহুদিনের কামনা মিটবে এবার। দেখে নেবে অমল। ফতুর করে দিয়ে যাবে।

পরের দিনও কাটে। তারপর দিন ভোর থেকে অমলকে আর দেখা যায় না। সকালে সবাই যথারীতি উঠে নীচে নামে।

মৃগনয়নী বলতে থাকে,—অমলটা কোথায় গেল। কখন উঠেছে? সকাল থেকেই দেখছি না।

কাবেরী তেমনি দাঁত মাজতে মাজতে বলে,—ও কদিন ধরে এমন পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন বলুনত মাসিমা। আমার সামনে ত আসতেই চায় না। বলে হেসে ওঠে কাবেরী।

মৃগনয়নী উত্তর দেয় না। কাজ করতে থাকে নীরবে!

কমল উঠেছে অনেকক্ষণ। পড়তে বসেছে।

কাবেরী ওপরে যায় কাপড় ছাড়তে। মৃগনয়নী চুপ করে কাজ করে।

হঠাৎ ওপরে একটা গোলমাল শুনতে পায়। কমলের উত্তেজিত গলা। কাবেরীর গলাও শোনা যায়। মৃগনয়নী কি একটা আশঙ্কায় চমকে উঠে। ওপরে উঠে যায় তাড়াতাড়ি। কি হোল। ওরা চেঁচাচ্ছে কেন? কমলের গলাটা স্পষ্ট কানে আসে।

—এযে ভাবতেও পারিনি। রাস্কেলটা সর্বনাশ করে গেল!

মৃগনয়নী ঘরের ভেতরে আসে।

—কি হয়েছে?

দেখে ভিজে কাপড়েই জানলার তাকের ওপর বসে আছে কাবেরী। হাতে একটুকরো চিঠি। মুখখানা আষাঢের মেঘের মত থমথমে।

কমল বলে,—কি আর হবে মা! অমলটা যে এমন সর্বনাশ করবে!

—কি করেছে?

মেজের ওপর কাবেরীর স্যুটকেশটা খোলা।

সাড়ে পাঁচশ টাকা আর গয়না ছিল। সব নিয়ে পালিয়েছে। একটা চিঠি লিখে গেছে।

—কার টাকা? ওর?

—হ্যাঁ। চিঠিতে লিখেছে 'শোধ নিলাম। মাকে বলবেন যেন কাঁদে না। আর ফিরব না।'

অমল আর ফিরবে না। চুরি করে পালিয়েছে। এ সব কি শুনছে মৃগনয়নী। মৃগনয়নী চোখের সামনে পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে যায়।

অমল চোর! অমল চুরি করেছে! আর কেন বেঁচে আছে মৃগনয়নী!

বলে ওঠে মৃগনয়নী,—ওকে পুলিসে দে খোকা। ওকে জেলে দে।

সে উপায় নেই। পুলিসে খবর দিলে নিজেদের বিপদ ডেকে আনতে হবে।

বলতে বলতে কমল দেখে মৃগনয়নী মেজের ওপর গড়িয়ে পড়ে গেছে।

—মা !—কাছে গিয়ে দেখে জ্ঞান নেই।

এক গেলাস জল নিয়ে আসে কমল। মায়ের চোখে মুখে দেয়।

কাবেরী একবারও ওঠে না। নড়ে না। তেমনি চুপ করে বসে থাকে কঠিন হয়ে।

চোখে মুখে জল দেবার পর জ্ঞান ফিরে আসে মৃগনয়নার। কমলের দিকে তাকায় মৃগনয়নী। অমল চোর। চুরি করে পালিয়েছে। আর ফিরবে না।

আটাশ

বুকের ভেতরটা পুড়ে গেছে মৃগনয়নীর। পোড়বার সময় সে কি জ্বালা! পুড়েছ ত খাঁটি হতে হবে, নইলে আর উপায় কি বল না? ভেবে অবাক হচ্ছিলাম, সহ্যেরও মানুষের সীমা আছে। কিন্তু মৃগনয়নার সহ্যের সীমা দেখি না।

কি আর করব বলো বাবা। এগুলো একএকটা পরীক্ষে বই ত নয়!—বলে হাসত মৃগনয়নী।

এরপর মৃগনয়নী আবার উঠল। আবার কাজ করল। শরীরটা শুধু শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। পোড়া কাঠের মত কালো।

আর এলো না অমল। পুরো বিশটা দিন কেটে গেল। অমল এলো না। ভাত বাড়বার সময় দুখানা থালায় ভাত বেড়ে ভুল করে। বিছানা করবার সময় দুটো বালিস দেয় ভুল করে। পোড়া অভ্যেসই যত অনর্থ বাধায়।

একটা নিশ্বাসও বড় করে ফেলে না মৃগনয়নী। চুপ করে কাজ করে যায়। ভাবে মনে মনে। এত বছর ধরে বুকের রক্ত দিয়ে কি ছাই সংসার গড়ে তুলেছিল মৃগনয়নী।

সে মৃগনয়নী আর বেঁচে নেই। ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে ওর বাইরের সত্তা। নবজন্ম হচ্ছে ওর। অন্তরে নতুন করে জীবন পাচ্ছে। সেখানে আর ক্ষয়ে যাবার ভয় নেই, মুছে যাবার আশঙ্কা নেই। অমল যদি এমনি চলে যেত এতটা ভেঙে পড়ত না ও। অমল যে চুরি করে গেল! কি করে মেয়েটার কাছে মুখ দেখাবে ও?

—তুমি আমার ছোট না হলে পায়ে ধরতাম!

কাবেরী হাসে। পরমুহূর্তেই মুখখানা গম্ভীর করে বলে,—কি ছেলেই পেটে ধরেছিলেন মাসিমা!

—ঠিকই বলেছ মা। মাঝে মাঝে বসে বসে ভাবি, কেন এত ভোগ। ছোট-বেলায় যদি মরে যেতাম। কিন্তু তাহলে—।

তাহলে আজ যেখানে পৌঁছোচ্ছে ও, সেখানে পৌঁছতে আরও কত জন্ম কাটত। ভালই হয়েছে। যা হয়েছে, ভালই হয়েছে।

কাবেরী ম্লান মুখে বলে,—আপনাকে যতই দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি মাসিমা।

—কেন ?

—না। এমনি।

কাবেরী যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কে জানে। অনেকগুলো বছর আগে তার বাবা যে লোকটাকে বেঁধে মেরে বার করে দিয়েছিল। মুখ বুঁজে একটা কথা না বলে চলে গিয়েছিল লোকটা। বেশ মনে পড়ে চোখে তার জল ছিল। কিন্তু জ্বালা ছিল না। অমন ঠাণ্ডা নরম দৃষ্টি বহুকাল দেখেনি কাবেরী।

আজ মৃগনয়নীর চোখদুটা কি সেই চোখদুটাই মনে করিয়ে দিচ্ছে ?

মনে আছে কাবেরীর লোকটা একখানা চিঠিও লিখেছিল তারপর, বিশ্বাস কর, তোমাকে বিয়ে করে যদি অন্যায় করে থাকি, সে অন্যায় ইচ্ছে করে করিনি। সে কাহিনী যদি শুনতে চাও একদিন এসো। আমার ত যাবার উপায় নেই! যদিও অপরাধ ইচ্ছাকৃত নয়। তবু বার বার তোমার কাছে মাপ চাইছি। একবার এসো। সব শুনে যেও। একটিবার। ইতি—তোমার হতভাগ্য স্বামী।

চিঠিখানা পড়ে ওর বাবা দাঁতে দাঁত সিগারটা ধরিয়ে শুধু বলেছিলেন,—শুয়ারকা বাচ্চা!

মা টানাটানা চোখদুটোয় এক রাশ বিষ এনে উচ্চারণ করলেন,—ঝাঁটা মারো! ওর এখন মাত্র ষোল বছর বয়েস। বাবা মায়ের কথাটাই কানে গেল। চিঠির অক্ষরগুলো অন্তর স্পর্শ করল না। চিঠিটা ছিঁড়ে উনুনে ফেলে দিল। এ পর্বের এখানেই শেষ।

তবু এতবছর ধরে কাবেরীর বার বার মনে হয়, যদি সেদিন চিঠির উত্তরটা দিত! যদি একবার যেত সেখানে। কি তার কাহিনী, সেটাও না হয় শোনা যেত। কাহিনীটাও অব্যক্ত রয়ে গেল আজীবন।

মৃগনয়নীর চোখদুটো বার বার ওকে চোখজোড়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। না। দুর্বলতাকে ও প্রশ্রয় দেবে। মণিমালার কঠোর বোঝাটা বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখে। মুখখানাকে অস্বাভাবিক গম্ভীর করে যায় ওপরে।

দিনের পর দিন কাটে। বোবা দিনগুলো কারোই অসহ্য লাগে না। ভালই লাগে। প্রথম দিককার উচ্ছলতাকে সংযত করে নিয়েছে কাবেরী। ও বুঝেছে মৃগনয়নী ঠিক সে জাতের মেয়ে নয়, যাদের হেসে কথা বলে আয়ত্তে আনা যায়। বরং দিনের পর দিন মৃগনয়নীর ওপর ওর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

কমল সেদিন মৃগনয়নীর দিকে তাকিয়ে বলে,—শরীরটা যে একেবারেই গেল মা!

হাসে মৃগনয়নী,—যাওয়াই ভাল।

সত্যিই ওর জোলো তাল শাঁসের মত চোখদুটোর দিকে তাকালে আজকাল ভয়ই করে। মনে হয় মৃতদেহের দুটো চোখ দেখছে।

—আচ্ছা! এক কাজ করো না মা!

—কি?

—জ্যাঠা মশায়ের বাড়ী গিয়ে থাক না?

—না। কাউকে আর জ্বালাতে চাই নে।—

—কিন্তু আমি ত যে কোনো দিন ধরা পড়তে পারি। তখন তোমার কি হবে?

—যা হয় হবে।

—বারে বা!

মৃগনয়নী আবার হাসে,—চিরটা কাল ত তুই আমার ভাবনা ভাবিসনি। আজও না হয় নাই ভাবলি। যে ভাববার, ঠিক ভাববে।

কমল তবু বলে,—আমার মনে হয় তোমার কোন অসুখ হয়েছে। ডাক্তারের কাছে যাবে? চলো না কাল সকালে যাই।

—না, রে না। বিরক্ত করিস নি আমায়।

কমল আর কথা বলে না। সন্ধ্যের পর খাওয়া সেরে ও আর কাবেরী বেরিয়ে যায়। ফেরে অনেক রাতে।

মৃগনয়নী একা একাই জেগে বসে থাকে। ভালই লাগে।

পরদিন ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আসে কমল।

মৃগনয়নী খুব বিরক্ত হয়।

—তা হোক। আপনি একটু দেখুন মায়ের এমন হচ্ছে কেন?

সেই ডাক্তার। যার বউ বীণা। এখন বেশ বুড়ো হয়ে পড়েছেন। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেন মৃগনয়নীকে।

—আপনার কি মাথা ঘোরে?

মাথা নাড়ে মৃগনয়নী,—হ্যাঁ। ঘোরে।

—শরীর খুব দুর্বল লাগে?

—হ্যাঁ।

—বুক ধড়ফড করে।

—মাঝে মাঝে।

আর কোন কথা বলে না ডাক্তার। আবার পরীক্ষা করে বাইরে আসে।

কমলকে রাস্তায় যেতে যেতে বলে—লো ব্লাড প্রেসার। এত লো যে যে-কোন সময় হার্ট এ্যাটাক হতে পারে। এভাবে থাকা ঠিক নয়। ভাল খাওয়া দরকার দুধ, ঘি, মাখন, প্রচুর ছানা। ওষুধ অবিশ্যি আমি দিচ্ছি। এসো আমার সঙ্গে।

কমল যায়, ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে আসে।

—ওষুধটা খেও মা। দুপুরে খাবার পর। রাত্তিরে খাবার পর। দুবেলা।

মৃগনয়না বিরক্ত হয়ে তাকায়। ওষুধের শিশি মায়ের সামনে রেখে বাইরে চলে যায় কমল। দুধ ত মা খাবে না। ঘি আনতে হবে আর রোজ সন্ধ্যায় বা রাত্রে যখন পারে কিছুটা ছানা আনবে। না খেলে ত বাঁচবে না। ডাক্তার ত বলেই গেল।

আরও টাকার দরকার। আর একটা ছেলে পড়াবার চেষ্টা করলে হয়। কিন্তু সময় হাতে কখন? নিজের পড়ার ক্ষতি ত হচ্ছেই। তার ওপর পার্টির কাজ।

মায়ের এখন সে ছাড়া আর কেউ নেই। কে আর দেখবে মাকে। ভাবতে ভাবতে রাস্তায় চলে।

আজ আবার সন্ধ্যার পর বেরোতে হবে। বিশেষ জরুরী কাজ। মণিমালার সঙ্গে বেরোবে। ফিরতে রাত হবে অনেক। নিজেকে যেন ক্লান্ত মনে হয় কমলের। সাহেব মেরে আর পিস্তল বোমার ভয় দেখিয়ে যে কি হবে। তার চেয়ে যেন গান্ধীজীর কথা, গান্ধীজীর পথই ওর মনকে আকর্ষণ করছে বেশী। উপায় নেই। এখন আর উপায় নেই। যতদিন না এ দল আপনা-আপনি ভেঙে পড়ছে, ততদিন কিছুই করবার উপায় নেই আর। ফেরবার পথে বাজার সেরে একটু কি নিয়ে আসে কমল একটা বড় ভাঁড়ে করে।

—এ কি, ঘি কার?

—তোমার। একটু করে ঘি রোজ খাবে।

মৃগনয়নী হাসে। যেন অবাক হয়ে বলে,—আমি ঘি খাব?

—হ্যাঁ। এটা যে তোমার ওষুধ।

মৃগনয়নী শুধুই হাসে। আর কথা বাড়ায় না।

সেদিন অনেক রাত্রে এসে শুয়েছিল ওরা। পরিশ্রম হয়েছিল খুব। শুয়ে পড়ে ওদের আর জ্ঞান ছিল না। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

মৃগনয়নী রাত্রে ঠায় বসেই ছিল। ঘুম আসে না। ঘুমোতে চায়ও না।

শেষরাত্রে ও যেন শুনতে পেল বাড়ীর চারপাশে অনেক লোকের ফিসফিস কথা। কে এল? হয়ত ওর মনের ভুল। না। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে অনেকগুলো ভারী জুতোর আওয়াজ আর গলার ফিসফিস শব্দ। যাকগে। যে আসে আসুক। চুপ করে বসে থাকে মৃগনয়নী। এই বারে একটু কাত হয়ে শোবে। নইলে কমল আবার সকালে উঠেই বলবে, কাল ভররাত নিশ্চয়ই ঘুমোওনি। কেন? কি হয়েছিল?

ছেলেটা যেন ওর দিকে সব সময় নজর রেখেছে।

কড়া নাড়ার শব্দ কাণে আসে। কে কড়া নাড়ছে এত ভোরে? আবার কড়া নাড়ছে।

কাবেরী আর কমল ঘুমে বিভোর। ওদের কাণে কোন শব্দ যায় না।

মৃগনয়নী উঠে জানলা দিয়ে উকি দিয়ে দেখে গলিটা লালে লাল। শুধু লাল পাগড়ীর ভিড। এত পুলিশ!

—ও খোকা। পুলিশ এসেছে। খোকা! ও খোকা!

ধড়মড় করে উঠে পড়ে কমল!

—পুলিশ!

জোরে একটা ধাক্কা মারে কাবেরীকে।

—পুলিশ!

কাবেরী উঠেই চোখ কচলে বলে,—তোমাদের ছাদ আছে? অন্য ছাদে টপকে যাওয়া যাবে?

—তা বোধহয় যাবে। চলো ছাদে।

কমল আর কাবেরী দু জনে প্রায় ছুটে বেরোয় বারান্দায়। ততক্ষণে দোর খুলে দিয়েছে কমলির মা। উঠোন থেকে শব্দ কাণে আসে,—দাঁড়ান, এক পা নড়বেন না আর।

পিস্তলের মুখটা উঁচিয়ে ধরেছে একটি সাব-ইনস্পেক্টর। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে।

—পিস্তলটা বার করো কমল।—কাবেরী বলে।

কমল স্থির হয়ে গেছে, বলে,—নেই। কাল ওটা পাচার করে এসেছি।

—শুধু হাতে ধরা দেব?

—উপায় কি।

ওপরে এসে গেছে একজন ইনস্পেক্টর আর একজন সাব-ইনস্পেক্টর। পুলিশ কয়েকজন ওপরে আসছে।

এসেই কমলের পকেট, কাবেরীর হাত শাড়ীর আঁচল সার্চ করে নেয়।

—সার্চ করব বাড়ী।

—করুন।—কমল বলে।

ওদের সামনে চারটে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের বিছানাপত্র বাক্স ওলট-পালট করে তছনছ করে দেয়।

তখন ভোরের আলো দেখা দিয়েছে পূব আকাশে। জানলা দিয়ে আলো আসছে। মৃগনয়নী পাষাণের মত দাঁড়িয়ে আছে।

—আপনি কে?

মৃগনয়নী কেঁদে ওঠে।

—আমার মা।—বলে কমল।

সার্চ শেষ করে ইনস্পেক্টর ওদের কাছে আসে।

—আপনাদের একটু যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

—চলুন।—বলে কাবেরী।

কমল একটু ইতস্তত করে,—মা।

মৃগনয়নী তাকায়। পাথরের চোখ, এক ফোঁটা জলও নেই।

—মা!—গলাটা কেন কাঁপছে কমলের। ওকি কিছু বলবে? কি বলবে? আর কি বলবার আছে? এর পরেও কি আর কথা থাকতে পারে?

—মা যাই।—কমল এসে মৃগনয়নীর পায়ের পাতার ওপর মাথাটা রাখে।

কি বলবে মৃগনয়নী? আশীর্বাদ করবে? কথা বলবে? কাঁদবে?

—শিগ্‌গির উঠুন।—ধমক দেয় ইনস্পেক্টর।

কমল ওঠে। পুলিশের সঙ্গে আস্তে আস্তে নীচে নামে। পা আর চলে না। পা দুটো এত ভারী। আর মাথাটা? বড্ড ভারী লাগছে। পেছন পেছন পুলিশের দল বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে।

উনত্রিশ

তারপর? কলম আর আমার নড়ছে না। লিখতে পারছি নে আর। এর পরে কি লিখব। মৃগনয়নীর কথা আরও কি কিছু থাকতে পারে?

ওর নিজের কথাগুলো শুধু কানে বাজছে,—খোকাকে ওরা নিয়ে যাবার পর বাইরের চৈতন্য যেন সব লোপ পেয়ে গেল বাবা। কি জন্যে যে কি হোল কিছু যেন বুঝলাম না। এত পরীক্ষেও করে! হাসত মৃগনয়নী।

একেও পরীক্ষা বলেন?

আর কি বলব বাবা! ঠিক ঠিক চোখ মেলে যদি দেখ তবে হাসিই পাবে? অনেক সময় মনে হয়—। মৃগনয়নী যেন কোথায় ডুবে যায় বলতে বলতে।

কি? কি মনে হয়?

অনেক দূর থেকে যেন বলে মৃগনয়নী। মনে হয় এত বছরের জীবনটা যেন একটা বড় স্বপ্ন। তাই ত ঘুম ভেঙে হাসিই পায় ভাবলে মিছিমিছি কত ভয় পেয়েছিলাম। কত কেঁদেছিলাম।

ঠিক বুঝলে না বোধহয়? এত চালাকি দিয়ে বোঝবার জিনিস নয়?

চুপ করে থাকি কিছুক্ষণ। কত কি ভাবি।

যাক, আমার ভাবনার কথা। যা বলছিলাম। কমলকে পুলিসে নিয়ে যাবার পর অচৈতন্য হয়েই পড়েছিল মৃগনয়নী। যদিনা কমলের মা না আসত। তবে হয়ত এইখানেই আমার কাহিনী শেষ করতে হোত।

কমলির মা পুলিশ বেরিয়ে যাবার পর ছুটতে ছুটতে ওপরে এল। এসে চক্ষুস্থির। চেঁচামেচি করে লোক জড় করে গরম দুধ খাইয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে হোল মৃগনয়নীর।

—ওমা ভিরমি আর খাবেনি? কি কপাল করেই জন্মেছিল বাপু।

ভবানীর মা বললে,—তবে কথা কি, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। বাড়ীতে পুলিশ ঢুকল।

কমলির মা বলে,—একি ছ্যাচড়ামি করে পুলিশ ঢুকেছে। এরা স্বদেশী ছেলে। সোনার টুকরো ছেলে সব। পুলিশ মুখপোড়ারা এদেরই ধরচে আজকাল।

ভবানীর মা বলে,—মেয়েটিকেও ত' নিয়ে গেল।

—তা আর নেবেনি, ওত ওদেরই দলের।

ভবানীর মা চলে যায়। কমলির মা মৃগনয়নীর পাশে বসে। হাওয়া করে।

—থাক দিদি। আর বাতাস করতে হবে না—ক্ষীণস্বরে বলে মৃগনয়নী।

কিছুক্ষণ পর কমলির মা চলে যায়। জানিয়ে যায়, আজ মৃগনয়নীর ভাতে ভা্ত সে করে দেবে।

মৃগনয়নী শুয়েই থাকে। ধীরে ধীরে নিজের অবস্থাটা বোঝবার চেষ্টা করে বোঝবার আর আছেই বা কি! সামনে শুধু অন্ধকার। অন্ধকাব? না, অন্ধকার কেন হবে?

বহুদিন পর রামতারণকে স্পষ্ট দেখতে পায় মৃগনয়নী। জ্যোতির জোয়ারে ভেসে এল যেন। মুখে প্রশান্ত হাসিটুকু। ঠাণ্ডা শীতল দৃষ্টি চোখে। কি অভয়! আর শান্তি! অনেকক্ষণ। অনেক সময় এক ভাবেই থাকতে হয় মৃগনয়নীকে। ওই এক চিন্তায় ধুয়ে ওঠে যেন ও। মনে প্রলেপ নয়। ধুয়ে যায়। মুছে যায়। একটুও কষ্ট লাগে না আর। একটু চিন্তাও কি হতে নেই?

না। সব যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে চোখের ওপর। একটার পর একটা সুতোয় বাঁধা দিনের পর দিন। মুহূর্তের পর মুহূর্ত। অবধারিত কতকগুলো জীবনের পর জীবন। অশান্ত কাল আকাশটা কত বড়! আর ও নিজে? ও নিজে যে অনেক বড়। সেখানে আজ আর কালের কথা তরঙ্গের মত মিলিয়ে গেছে। যেন অন্তহীন সাগরে। কে আর ভাবে। একটুখানি কথা। সে মন আর খুঁজে পাচ্ছে না ও।

কমলির মা এসে না ডাকলে ও হয়ত বহুক্ষণ ওই ভাবেই পড়ে থাকত।

—তোমার ভাত আনব?

মৃগনয়নী তাকায় কমলিব মায়ের দিকে। এই প্রথম সেই সুন্দর মধুর হাসি আসে ঠোঁটে।

—থাক। আমি যাচ্ছি।

—তুমি উঠোনি।

মৃগনয়নীকে আরও একবার হাসতেই হয়,—ভয় নেই, উঠতে পারব।

উঠে গামছাখানা নিয়ে কলঘরে যায়। মাথায় জল ঢালে। শরীরটাও ঠাণ্ডা হয়।

ওপরে এসে কাপড় ছেড়ে কমলির মাকে বলে,—চলো।

যেন কিছুই হয়নি।

কমলির মা একটু ভয় পেয়ে যায়,—এযে দিব্যি হাসচে, কথা বলচে, মাথা ঠিক আছে ত? না, ঠিকই ত কথা বলছে সব। কে জানে বাপু! কিছু বোঝবার উপায় নেই।

ঘরে এসে ওকে ভাত বেড়ে দেয়। একবার বলবার চেষ্টা করে,—কি আর করবে বল, সবই অদেষ্ট!

—না। করব কি? এ হয়ত ভালই হয়েছে। নইলে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার আনন্দটুকু হয়ত জীবনেও পেতুম না।

—আনন্দ! ভাল হয়েছে! মাথা খারাপ হয়নি ত!

কমলির মা বিমর্ষ হয়ে পড়ে। একে আর কি সান্ত্বনা দেবে ছাই! ভেবেছিল দুটো মিষ্টি বাক্যি, মহাভারতের কথা বলে বোঝাবে ওকে। বেশ ভাল লাগত তবে। কিন্তু এ যে নিজেই বলছে আনন্দ লাগছে!

বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়ে কমলির মা। মাগীর তেজ আছে! স্বামীপুত সব খেয়েও বলে আনন্দ! বলেহারী! যতটা ভাত খবার খেয়ে ওঠে মৃগনয়নী।

কমলির মা আর একবার বলবার চেষ্টা করে,—তোমার ভাশুরের ওখানে খবর পাঠাব?

—থাক। ওদের আর বিরক্ত করতে চাইনে।

আর কথা নয়। কমলির মা আশা ছেড়ে দেয়। মৃগনয়নীও নীরবে চলে আসে ঘরে।

চুপ করে এসে বসে জানলার ধারে। মনের ওপর আলোর তরঙ্গ আর থামে না। আলোর বন্যা যেন। ভেসে যায় মৃগনয়নী। ভরে যায়। এক দুয়ার বন্ধ হয়ে অন্য দুয়ার খুলে গেছে। স্তব্ধ হয়ে গেছে মৃগনয়নী। স্থির হয়ে গেছে। বাইরের অনুভূতিগুলো মরার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের কতকগুলো দৃষ্টি খুলে গেছে। এমনি করে ত' বহুকালই কাটতে পারে। এ আনন্দ বিচ্ছিন্ন নয়। এর জন্ম নেই। এখানে পৌঁছে যাওয়া আর নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া।

সংসারের হিসেবী সময়ের মাপে মৃগনয়নী বুঝি বা অকেজো হয়েই পড়ল। দিন যায়। রাত যায়। মৃগনয়নী প্রতিদিনের কাজ যেটুকু না করলে নয় সেটুকু করে বেশীর ভাগ সময় ডুবে থাকে কোন এক অতলে।

চাল ডাল আর বাজারের খোঁজটা কমলির মা-ই নেয়। একটু বেশী বেলায় কমলির মা কাছাকাছি একটা বাজারে নিজেই যায়—গঙ্গা স্নান করে ফেরার সময়।

—বরং গঙ্গাস্নান করলে পার ?

মৃগনয়নী বলে,—কি হবে ?

—বা। একি কথা! দেহ মন শুদ্ধ হবে।

কমলির মা অন্য কথা পাড়ে,—টাকা ফুরিয়ে গেলে কি করবে-বলো ত ?

—ভাবিনি কিছু।

—না খেয়ে মরবে ? তার চেয়ে বরং ভাশুরের ওখানে—।

এ কথার উত্তর দেয় না মৃগনয়নী। কমলির মা ওর বাজারের পয়সা নিয়ে গঙ্গার দিকে চলে যায়।

এমনি করে আর কদিন কাটবে ? কাটেও না। মাসখানেকের ভেতরেই কমলির মায়ের দিন টেনে টেনে চালায়।

চোখে পড়ে মৃগনয়নীর চাল ডাল কিছুই নেই। কমলির মায়ের হয়েছে জ্বালা।

মৃগনয়নী তাকায় ওর দিকে,—কি করব বলো ত' ?

—এখানে ওখানে যাও। গিয়ে টাকা মেগে আন !

চুপ করেই থাকে মৃগনয়নী।

—দেখি, একটা কিছু করব।—মুখে বলে মৃগনয়নী।

নিজের জন্যে ভাবতে আর কিছুতেই ইচ্ছে হয় না। ও ভাবনার শেষ করে দিতে চায়। অনেক ভাবনা ভেবেও তার পরিণাম দেখেছে ও। আর ভাবনা নয়। তোমার ইচ্ছার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছি। আর ভাবিও না আমায়। আর ভাবিও না।

সারাটা রাত শুধু একটি প্রার্থনাই করে মৃগনয়নী,—আর ভাবিও না আমায়। ভাবনাই সংসার। ভাবনা আর চাই না। আমাকে শান্ত করো। আমায় আলোয় ভরা সংসারে সব খুইয়ে এই সম্পদটুকু দিলে, তাও কি কেড়ে নিতে চাও ?

মৃগনয়নী ডুবে যায়। ভরে যায় আবার। তোমার করুণার শেষ নেই। আজীবন যা কিছু গেছে সে তোমার করুণা, যা পেলাম সেও তোমারই করুণা। করুণাময়! এবার নিজেকে তোমার বেদীতে বসিয়ে দাও। আর নামিও না। জলের ধারা নামে চোখে। ধুয়ে যায় সব কালো, সব—মালিন্য।

যা নিলে তার চেয়ে দিলে অনেক বেশী। এত আলো দিলে, এমন করে পূর্ণ করে দিলে। যা গেছে, সেটা যে কত তুচ্ছ ভেবে অবাক লাগে। গেলই বা কোথায়। যা গেল তা অমৃতের রূপ নিয়ে ফিরে এল। কিছুই ত খোয়া গেল না। আনন্দে

কেঁপে কেঁপে ওঠে মৃগনয়নী। গভীর রাত্রে রোমাঞ্চিত হয়। চোখের জলের যেন আর শেষ নেই।

দুটো দিন কাটে। কমলির মা আর তার এদিকে আসে না। কি-ই বা করবে এসে, এলেই ত ঠেকে পড়বে। দিতে হবে নিদেন দুটিখানি চাল। কাঁহাতক আর পারা যায়। আচ্ছা ঝামেলার মেয়েমানুষ যা হোক, চোখ উল্‌টে বসেই আছে।

তবু নিজে খাবার সময় আজ আর না গিয়ে পারল না কমলির মা। দেখে ভাত খায়নি মৃগনয়নী। মরে যাবে নাকি?

একথালা ভাত বেড়ে নিয়ে কমলির মা এগোতে যাবে—এর ভেতর ডাক শোনে, চিঠি। মৃগনয়নীর নামে চিঠি। চিঠি কি আর পড়তে জানে ছাই।

বাছা চিঠিখানা খুলে তুমি পড়ে দাও। কি লিখেছে? পুলিশ থেকে? ওকেও পাকড়াও করবে নাকি?

এ্যা? টাকা। ও তিরিশ টাকা করে পাবে। মাসোহারা? পুলিশ থেকে? বলো কি?

খোলা চিঠিখানা নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে ওপরে চলে আসে কমলির মা।

—ওগো ও দিদি! দিদি কোথা গো।

আঁচল পেতে মেজের ওপর পড়েছিল মৃগনয়নী।

—ওগো চিঠি এয়েছে!

মৃগনয়নী তাকায়। চোখদুটো ওর রাঙা।

—পুলিশ থেকে তিরিশ টাকা করে মাসোহারা দেবে তোমায়।

মৃগনয়নী তাকিয়েই থাকে।

—কথা বলছ না কেন? কি হোল? টাকা আনতে কাকে পাঠাবে বলো? ভগবান রক্ষে করেছে। জয় বাবা বোম কালী! কপালে হাত ঠেকায় কমলির মা।

মৃগনয়নী চোখদুটো নামিয়ে নেয় নীরবে। গায়ে হাত দেয় কমলির মা,—ওমা, একি! এত জ্বর!

মৃগনয়নীর গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। একটু কথা বলতে যেতেই কাশি আসে মৃগনয়নীর। বুকের ভেতরটা যেন ব্যথা-বেদনায় মোচড়াতে থাকে।

—ওমা একি ছিষ্টিছাড়া মানুষ! আমাকে একবার ডাকোনি? এখুনি যাই।

কমলির মা চিঠিটা হাতে নিয়েই চলে যায় ডাক্তারের বৌ বীণার কাছে।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তারবাবু আসেন কমলির মায়ের সঙ্গে।

বেলা তখন গড়িয়ে এসেছে। মৃগনয়নীর সর্বাঙ্গে আগুন, ভেতরে শান্ত আনন্দে: জোয়ার। অনেক পেলাম আনন্দময়! আর কিছুই চাই না। চাওয়ার পালা শে: হোল এ জন্মের মত। এ জন্মের স্বপ্ন ভেঙে গেছে। আর নয়। আর চাই ন মৃগনয়নীর রাঙা চোখের কস দুটো বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তপ্ত অশ্রু।

ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে বলেন,—এখুনি হাসপাতালে পাঠাতে হবে। নইলে দুদিনও টিঁকবে না।

কমলির মায়ের মুখ শুকিয়ে যায়। দিদি আর বাঁচবে না!

কমলির মা হাতের উল্টা পিঠে চোখদুটো মুছে নেয়।

ডাক্তার সব বোঝেন, আমিই সব ব্যবস্থা করছি। ফোন করে দিচ্ছি। গা: এসে পড়বে এখুনি।

চলে যান ডাক্তারবাবু। কমলির মা দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। শুধু :: হাতে সেই চিঠিখানা।

মৃগনয়নীর ভেতরে কি ঠাণ্ডা। কি শান্ত শীতল ভাব সমুদ্র! আনন্দের জোয়ারে ভেসে বেড়াচ্ছে মৃগনয়নী। বাইরের আলো যদি নেভে নিভুক। ভেতরের :লে নিভিও না। বিশ্বদেব! তুমি আলোয় ভরে দাও আমায়। আর কিছু চাইনে।

তিরিশ

তারপর? তারপর কি হোল?

হাসপাতালে মৃগনয়নী দিন পঁচিশ বেঁচে ছিল। এইখানেই মৃগনয়নীর সঙ্গে আম আলাপ।

ওর কাহিনী শুনলাম। কয়েকটা দিন ও বেশ ভালই ছিল।

কত হাসল বলতে বলতে,—কত আশাই করেছিলাম। ওইটেই মনকে বাঁধব ছিল কিনা! এতগুলো বছর যেন মস্ত একটা স্বপ্ন! স্বপ্নে যা গেল সেকি আর যা: বাবা! তার চেয়ে কত বেশী যে পেয়েছি তোমাকে বোঝাতে পারব না।

আলোয় ভরা চোখদুটো মেলে হাসল কতবার।

তারপরদিনই মারা গেল মৃগনয়নী।

ভাবছি তাই বসে বসে কেনই বা মৃগনয়নীর কাহিনী শোনাতে বসলা:

বলেছিলাম ত এ কোন মহারাণীর কাহিনী নয়। ভিখারিণীর কাহিনী। এক অতি সাধারণ মেয়ে মৃগনয়নী। তার কথা শোনবার কিই বা দরকার ছিল।

হয়ত কিছুটা ছিল। জল কি বুঝতে হলে এক বিন্দু জল দেখলেই বোঝা যায়, সমুদ্র মাপবার দরকার হয় না। তেমনি বিশ্বজীবন প্রবাহের বিশালতাকে মাপতে চাওয়ার মত বোকামি আর নেই। একটি মাত্র জীবনেই অনন্ত জীবন প্রবাহের সত্যকে দেখতে পাওয়া যায়। অনন্ত কাল ধরে রূপ থেকে রূপান্তরে আসা-যাওয়ার বিরাম নেই, তবু একটা জায়গায় জীবন অনন্ত একটা সুরে বাঁধা।

মৃগনয়নীর দেহটা যখন পুড়ছিল চিতায়, সেখানে আমি ছিলাম। জানিনে কমল জেলে বসে চোখের জল ফেলবে কিনা। কালো বৌ খবর পাবে কিনা। নতুন বৌয়ের মনটা এক মুহূর্তের জন্যেও ভিজে উঠবে কিনা। কে জানে? সে কথা থাক।

মৃগনয়নীর চিতার আগুন যেমন করে আকাশের দিকে উঠল, চিতার ধোঁয়া আকাশে গিয়ে মিশে গেল, তেমনি করে ওর জীবন কি করে ছড়িয়ে গেল বিশ্বজীবন চেতনায়?

সে কথা যদি বলা হযে থাকে, তবে এখানেই ইতি।

—